লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন

সূচীপত্র

নিবেদন

এই বইতে সংকলিত প্রবন্ধগুলি গত পনেরো বছর ধরে লেখা। তার মধ্যে 'জীবনানন্দের চার-অধ্যায়' এই প্রথম ছাপা হল। বাকি সবই পূর্ব প্রকাশিত। যাঁদের আগ্রহে ও আমন্ত্রণে এই সব রচনা লিখে ওঠা সম্ভব হয়েছিল, আজ এই সুযোগে তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই—অরুণ ভট্টাচার্য, হিতেন্দ্রনাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মাল্য আচার্য, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, আতাউর রহমান এবং রমাপদ চৌধুরী।

পুরনো লেখা পদে-পদেই অস্বস্তির কারণ হয়, আর যা নিজের কাছে অস্বস্তিকর তাকে হুবহু পাঠকের হাতে তুলে দিতে বিবেকে বাধে। অনেক সময় ভাষার ভঙ্গিমা অপছন্দ ঠেকেছে, কোথাও তথ্যের বা যুক্তির ভুল নিজেরই চোখে পড়েছে বা অন্যে দেখিয়ে দিয়েছেন, কোথাও দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মত পালটে গেছে। তাই বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে সংক্রান্ত প্রবন্ধদুটো বাদে পূর্ব-প্রকাশিত সব প্রবন্ধই কম বেশি পরিমার্জিত করতে হল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামও ঈষৎ বদলে গেল। তবু সব দোষ যে শোধরানো গেল তা নয়, কিছু পুনরুক্তিদোষ রয়েই গেল। দোষ যাই থাক, আমার ধারণা, এই বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলো থেকে আধুনিক বাংলা কবিতার বিচিত্রজটিল সমগ্রতা বুঝে নেওয়া খানিকটা সম্ভব হবে।

লেখার সময়, একমত হই বা না হই, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে যে সব সমালোচক আধুনিক কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের রচনা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়েছি। সাহায্য পেয়েছি অবশ্য কবিদের নিজেদের আলোচনা থেকেই বেশি। আর বিষয়ের অনুরোধে বিদেশের আধুনিক কবিতা-সমালোচনার খবরও রাখতে হয়েছে। স্বদেশী কবি ও সমালোচকদের কাছে আমার দেনা বিস্তর। কিন্তু বিচার সিদ্ধান্ত আমারই, তার দায়িত্বও আমার।

ধন্যবাদ জানাই, অনুজস্থানীয় গল্পকার দেবেশ রায়কে, অনেক ধন্যবাদ অরুণা প্রকাশনীর সহৃদয় বন্ধুদের। দুজনের কাছে আমার ঋণ সবচেয়ে বেশি—একজন পরমাত্মীয়, অন্যজন বন্ধুত্তম। কিন্তু তাঁদের কাছে আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতাস্বীকার, আমার পক্ষে, অকৃতজ্ঞতার নামান্তর।

অশ্রুকুমার সিকদার

কবিতায় কূটত্ব

এমন একটা রটনা প্রচলিত আছে যে আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য, এমন কি অবোধ্য। এবং এই রটনা একদিকে যেমন কবিতার সম্ভাব্য পাঠককে নিরুৎসাহ করেছে, তেমনি অন্যদিকে নির্বোধ রসিকতার খোরাক জুগিয়েছে। কিন্তু যখন দেখা যায়, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সব কবিতাকে অবোধ্য বা দুর্বোধ্য বলতেন সে সব কবিতা এখন আমাদের কাছে খুবই সহজবোধ্য, তখন মনে হয়, প্রত্যেক যুগে ফিরে ফিরে আসা এই অভিযোগের জন্যে কবিতাচর্চায় আন্তরিকতার ও বিনয়ের অভাবই প্রধানত দায়ী। অবশ্য কবির নিজের মনের অস্পষ্টতার জন্য কাব্যবিষয়ে মনঃসন্নিবেশের অভাবে কবিতায় অনেক সময় যে অবান্তর কূটত্ব সৃষ্টি হয় একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। সেই সব ব্যর্থ কবিতা আমাদের শিরঃপীড়ার বিষয় নয়। কিন্তু বিপরীত-পক্ষে অনেক কবিতা, যাকে মহৎ বা অন্তত পক্ষে খাঁটি কবিতা বলে চিনে নিতে কষ্ট হয় না, সেই সব কবিতার দুর্বোধ্যতা ও কূটত্বের অন্তরাল থেকে এমন এক জ্যোতি পাই যা আমাদের অভিজ্ঞতার দিগন্তকে প্রসারিত করে—তখন বোঝা যায়, কূটত্ব সত্ত্বেও কবির নিজস্ব ভাষা শিখে নেওয়ায় পাঠকের সনিষ্ঠ চর্চা কতোটা দরকার।

এই প্রবন্ধে কবিতায় কূটত্বের সমস্যাকে আমি তিন দিক থেকে আলোচনা করতে চাই। প্রথমত, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে যে যুক্তির শৃঙ্খলা ব্যবহার করে আমরা কোনো কিছু 'বুঝি',

কবিতার বা যে-কোনো শিল্পের ক্ষেত্রে বোঝার সেই কষ্টিপাথর বৃথা; কাব্যেরও একটা মানে আছে, কিন্তু সেই মানে প্রবন্ধের যুক্তির অর্থময়তা থেকে আলাদা। দ্বিতীয়ত, কবিতার যে কূটত্ব সে কি শুধু বহুতর বিশেষীকৃত বিদ্যার বিশ্বে কবির আত্মরক্ষার বর্মহিসাবে স্বেচ্ছাকৃত, নাকি সে কবিতার জন্মমুহূর্ত থেকেই সহজাত। তৃতীয়ত এবং শেষ পর্যন্ত, আপাত অস্বচ্ছতা আর তথাকথিত কূটত্বই সম্ভবত সেই উপকরণ যা কবিতার চরণ ও শব্দকে বহুতাৎপর্যের অনুরণনে বাজিয়ে তোলে—তাই কূটত্ব বাদ দিয়ে হয়তো কোনো কবিতাই সম্ভব নয়। যদিও তিনটে স্বতন্ত্র সূত্র হিসাবে আমি আলোচনাটা উপস্থিত করলাম তবুও এ সম্বন্ধে আমি সচেতন যে, সমস্ত আলোচনাই প্রকৃতপক্ষে একটিমাত্র আলোচনা।

প্রত্যেকটি যুগ তার কবি বা কবিসমূহের মধ্যে স্বর খুঁজে পায়। সেই যুগের পরিবেশে লালিত মানুষ সেই কবিদের ভাষায় এমনই অভ্যস্ত হয়ে যায় যে তারা প্রবীণ বয়সে যুবক কবিদের লেখা কবিতার মনোভাব ও ভাষাভঙ্গির সঙ্গে কিছুতেই যোগপ্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কলিংউড যাকে চৈতন্যের ভ্রষ্টাচার বলেছেন, সেই ঘটনা যখন ঘটে এবং চিরকালই ঘটে, তখন চৈতন্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য তরুণেরা খোঁজেন নতুন প্রকাশ পদ্ধতি এবং ভ্রষ্টচেতন প্রবীণদের কাছে তাঁদের সেই সন্ধান দুর্বোধ্য ঠেকে। এবং দেখা যায় নিকটপ্রজন্মের মধ্যেই যেন চিন্তাচেতনার এই পার্থক্য দুরতিক্রম্য হয়ে ওঠে। দাশরথি রায় আর ঈশ্বর গুপ্তে অভ্যস্ত পাঠক মধুসূদনকে নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছিল। উনিশ শতকের সুপ্রতিষ্ঠিত স্থির জীবনের আদর্শে যে কাব্যপাঠক লালিত তার পক্ষে ভঙ্গুর এবং অবিশ্বাসী বিশ শতকের পরিমণ্ডলকে আয়ত্ত করা কঠিন হবে এ তো স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের প্রাণদায়ী প্রভা যারা পান করেছে তাদের কাছে জীবনানন্দের ম্রিয়মাণ হৈমন্তিক জগৎ যে অপরিচিত ও অগম্য মনে হবে, এও অস্বাভাবিক নয়।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যান্ত্রিক উৎপাদন, সামাজিক যূথবদ্ধতার ফলে ক্রমেই ঘটেছে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিনাশ, মানুষ হয়ে পড়েছে অসম্পৃক্ত, বিচ্ছিন্ন, ফলত একা। তাই দস্তয়েফস্কি ও বোদলেয়ার থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্যের জগতে এত নিঃসঙ্গ বিকৃত মানুষের শেষহীন মিছিল। এই মুমূর্ষু আর মূর্ছাপন্ন পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু রেনেসাঁর উত্তরাধিকার—যুক্তির প্রতিপত্তি, মানবতাবাদের সমর্থন, সৌজন্য ও সামাজিক দায়িত্ববোধ একে একে সমস্তই অস্বীকার করলো। আর গণতন্ত্রের যুগের অসহনীয় সমতা, যাকে কিয়েৰ্কেগার্ড বলেছেন সাম্যের অত্যাচার, তা অনুভূতিপ্রবণ স্বভাব-অভিজাত শিল্পীসম্প্রদায়কে বিদ্রোহী-সমাজবিচ্ছিন্ন করে তুললো। এই অস্বীকারের যুগের আরম্ভে অযৌক্তিকের অভ্যর্থনায় সকলের আগে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বোদলেয়ার। তাই তাঁর কবিতায় পূর্বযুগের গঠনসৌকর্য, ভাষাবিন্যাসের শৃঙ্খলা বর্তমান থাকলেও সেই বহিরাবরণের অন্তরালে সমস্ত বিপর্যস্ত বিক্ষিপ্ত এবং বিষাক্ত হয়ে গেছে। তাই, যদি কোনো পাঠক সমকালীন পৃথিবীর নানা শক্তির আকর্ষণ-বিকর্ষণ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকেন তবে কবির রচনা, যার মধ্যে যুগচৈতন্যের সূক্ষ্মতম তারতম্য পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়ে, সেই পাঠকের কাছে অনেকটা অবোধ্য থেকে যাবে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আবার কলিংউডের ভাষায়, আমরা নতুন আবেগপুঞ্জ অর্জন করছি, আর অর্জন করছি সেই নবাবেগকে প্রকাশের নতুন নতুন উপায়। যাঁরা পুরোনো আবেগে অভ্যস্ত হয়ে যান তাঁরা এই নতুন আবেগ অর্জনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন এবং ফলে, নতুন প্রকাশভঙ্গিমাও তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে যায়।

যুগচৈতন্যকে অন্তরঙ্গ করতে না পারলে সেই যুগের কবিতা বোঝা যেমন কঠিন হয়, তেমনি কবির জীবন ও জীবনাদর্শ না জানলেও সেই অজ্ঞতা কবিতার আস্বাদে বাধা হতে পারে। না হলেই হয়তো ভালো হত, কবিতা যদি হতে পারতো স্রষ্টার জীবন ও পরিবেশ

থেকে স্বাধীন এক পরিশুদ্ধ প্রকাশ। যেমন আমির খানের গান ও হেনরি মূরের ভাস্কর্য উপভোগের জন্য তাঁদের জীবন না জানলেও চলে। একমাত্র গীতিকবিতাই সেই আদর্শের অনেকটা কাছে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারে না, কারণ কবিতার মাধ্যম ভাষা—যে ভাষা কবিতাশিল্পে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি কাজে লাগে প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে। তাই জীবনের ছোঁয়াচ কবিতার ভাষা এড়াতে পারে না; ভাবকে রূপ দেবার জন্য কবি পরিচিত পরিবেশকে, ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করতে বাধ্য হন। 'ডিভাইন কমেডি' পড়ার সময় ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস ও ধর্মমত সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে তা অনেকটাই আমাদের উপলব্ধির বাইরে থেকে যাবে। শেকসপীয়রকে তন্ময়ভাবে জানতে গেলে সেই যুগের ভাবনার সঙ্গে পরিচয় একটা আবশ্যিক সর্ত। রবীন্দ্রনাথের অনেক আত্মজৈবনিক ও বহির্জৈবনিক তথ্যের সঙ্গে পরিচয় দরকার হয়, তাঁর অনেক কবিতা ভালোভাবে বোঝার জন্য। ইয়েটসের কবিতা বুঝতে গেলে তাঁর পরিচিত জন, প্রিয়জন, প্রেমিকা মড গনের কথা না জানলে চলে না। অবশ্য অসুবিধা হয় যখন মাঝে মাঝে কবিতায় নিতান্ত প্রাইভেট রসিকতাও কবিরা ব্যবহার করেন। এক শিলিং দামের জয়সের Pomes Penyeach-এ বারোটা নয়, তেরোটা কবিতা ছিল—শেষেরটার নাম 'Tilly'। একমাত্র ডাবলিনবাসী জানে যে, ডাবলিনের দুধওয়ালারা যে আধকাপ দুধ ফাউ দেয় তার নাম টিলি। বন্ধু প্যাড্রিয়াক কোলাম এটা না জানালে ব্যাপারটা দুর্বোধ্য হত। এ ধরনের খেয়ালি দুর্বোধ্যতা, পাঠকের সঙ্গে এমন চালাকি, সচরাচর মাইনর কবিতাতেই হয়। এ সব বিবেচনায় ধর্তব্য নয়।

মানুষের সমস্ত সৃষ্টি এবং উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে আমাদের না মেনে উপায় নেই, মানুষ যে-অংশে যুক্তিবাদী তার থেকে মানুষের দর্শনবিজ্ঞান আবিষ্কৃত ও অনুশীলিত হয়েছে এবং যে-অংশে

তার আদিম অযৌক্তিকতা আজো জীবিত প্রাণবন্ত তার থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছে তার বিচিত্র শিল্পকর্ম—তার চিত্রাবলী, তার কবিতা। বিজ্ঞানদর্শনে যুক্তির ধাপ উত্তীর্ণ হতে হতে আমরা সত্যের দিকে এগোই, আর শিল্পে স্বজ্ঞার আকস্মিক দিব্যবিভায় সমস্ত জগৎ আলো হয়ে ওঠে এবং সেই অযৌক্তিক স্বজ্ঞার আবিষ্কার শিল্পের মধ্যে চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেয়ে শাশ্বতকাল জ্যোতি দেয়। মানুষের এই দুই স্বতন্ত্র আত্মবিকাশের জন্মক্ষেত্র যেহেতু আলাদা, তাই তাদের বোধের উপলব্ধির পথও পৃথক। বৈজ্ঞানিক যে সত্যকে যুক্তি দিয়ে, অঙ্কপাত দিয়ে আবিষ্কার করেছেন তাকে বুঝতে গেলে বিজ্ঞানের ছাত্রকে সেই যুক্তি অঙ্কপাতের পথ অনুসরণ করতে হবে, এবং কবি-চিত্রী সৃষ্টিক্ষম স্বজ্ঞার আগ্নেয় প্রজ্বলনে এক মুহূর্তে যে দ্যুতিময় সত্যকে অর্জন করেছেন, কাব্যপাঠক ও চিত্রদর্শককেও সেই সত্য লাভ করতে গেলে সেই যুক্তির অতীত স্বজ্ঞার পথ অনুধাবন না করে গতি নেই। এক জাতের কষ্টিপাথর দিয়ে যদি অন্য শ্রেণীকে বিচার করতে যাই তবে ব্যর্থতার সম্ভাবনাই সমূহ। এ কথার মানে এই নয় যে, কবিতায় যুক্তি যত্নের অবকাশ নেই। আসল কথা, যুক্তির ও ঐতিহ্যের ব্যবহার যত্ন ও শ্রমের দ্বারা চরিতার্থতায় আরোহণ, এ সব পরে আসে। প্রথমে আসে, যুক্তির অতীত স্বজ্ঞায় কবিতার যথার্থ আবির্ভাব।

অবশ্য বিশেষ করে কবিতার বেলাতেই যে এমন ভুল বোঝাবুঝি হয় তার কারণ স্পষ্ট। কেন না, ভাষার যে সব শব্দ ব্যবহার করে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে যুক্তিবিস্তার করা হয় ভাষার সেই সব শব্দ দিয়েই কবিতা তৈরি। সুতরাং প্রাথমিক উপকরণ যখন দুই ক্ষেত্রে একই তখন যুক্তিবিন্যাসে অভ্যস্ত পাঠক কবিতার মধ্যেও পরিচিত শব্দগুলো দেখে পূর্ব-অভ্যাসবশে কবিতাতেও যুক্তির শৃঙ্খলা প্রত্যাশা করেন। অথচ শব্দগুলো যদিও একই, তাদের ব্যবহারে সেতুহীন দূরত্ব। শব্দ যখন দর্শন বা বিজ্ঞানে বস্তুনিরপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় তখন সে যুক্তির প্রতীক discursive symbol, কিন্তু কবিতায় সেই

শব্দকেই presentational symbol বা রূপের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যখন যুক্তির প্রতীক হিসাবে ভাষায় শব্দকে ব্যবহার করি তখন শব্দ অর্থময় মাত্র, কিন্তু যখন রূপের প্রতীক হিসাবে শব্দ ভাষায় প্রয়োগ করা হয় তখন তার মধ্যে অর্থের সঙ্গে সঙ্গীতের তরঙ্গ ও চিত্রের প্রভা দেখা দেয়। অর্থসঙ্গীতচিত্রের সমন্বয়ে সেই ভাষায় এসে যায় এক অতিরিক্ত মাত্রা—কবিতার মাত্রা। তাই 'এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে'—এই চরণে অর্থ ও ছন্দ বজায় থাকলেও আমরা সাগরের জায়গায় সিন্ধু বসাতে পারি না। কারণ কবিতায় ভাষাকে ব্যবহার করি 'to express the singular' (মারিত্যাঁ), 'to render the impossible credible' (ভিকো)। তাই সাধারণ সত্যকে আবিষ্কার ও প্রতিপন্ন করার জন্য ভাষার যে যুক্তিবাদী ব্যবহার তাতে অভ্যস্ত হয়ে, কবিতার যেখানে একক ও অনন্যসাধারণ সত্যের সন্ধানে আমরা অগ্রসর হই, সেখানে যদি কোনো যুক্তিসঙ্গত সারমর্ম খুঁজে বের করতে চাই তবে সেই চেষ্টার ব্যর্থতার জন্য কবি দায়ী নন, দায়ী কবিতার চরিত্রসম্বন্ধে অজ্ঞ পাঠক। মনে রাখতে হবে, যুক্তিবিন্যাসের সমস্ত সরলীকরণ ও সাধারণীকরণকে কবিতা ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং অন্তর্ভেদী উপলব্ধির গভীরতায় তার বিশ্ববীক্ষণ সমাপ্ত করে।

ভাষা প্রধানত সামাজিক বিনিময়ের বাহন ও যুক্তির প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও সে যে কবিতায় সঙ্গীততরঙ্গ জাগাতে পারে এবং ইন্দ্রিয়ের রূপের প্লাবন ডাকাতে পারে তার কারণ প্রতিটি শব্দেরই ধ্বনি আছে এবং প্রত্যেকটা শব্দই তাদের শৈশবে উপমা ছিল। কিন্তু দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রচলিত ভাষায় ধুলো জমতে থাকে, তার উজ্জ্বলতা ক্রমেই মলিন হয়ে আসে। অথচ সেই সাংসারিক প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য যে ভাষা, তা ব্যতিরেকে অন্য কোনো ভাষা নেই যাকে কবিতার উপকরণ হিসাবে কবি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু বহু হাতে স্পৃষ্ট এই ভাষা এতই মলিন এবং দ্যুতিহীন যে, জীবন মৃত্যু প্রেম সম্বন্ধে

মানুষের চরম চেতনার প্রভাস্বর প্রকাশ সেই ভারবাহী পশুর মতো ক্লান্তভাষায় সম্ভব নয়। তখন এই বিপাক থেকে মুক্তির পথ হিসাবে কবি ব্যবহৃত-প্রচলিত ভাষাকেই ভেঙে দুমড়ে অপ্রত্যাশিত আকার দিয়ে এমন ভাবে প্রয়োগ করেন যে মৃত চৈতন্য জ্যান্ত হয়, পুরোনো ভাষাই হঠাৎ নতুন হয়ে ওঠে। আর ভাষা যে মুহূর্তে নূতনত্ব পায়, সেই মুহূর্তে পরিচিত পৃথিবীকেও নতুন মনে হয়। ভাষার প্রচলিত ব্যবস্থাশৃঙ্খলাকে ভেঙে যেই বলা হয়—'চারিদিকে অবিরল নিমিত্তের ভাগীর মতন/এই সব আকাশ নক্ষত্র নীড় জল' (জীবনানন্দ), 'চুম্বনের চঞ্চল পুরাণ' (বুদ্ধদেব বসু), 'তোমার গ্রীবার নৌকোখানি তোমার চোখের গঞ্জশহরগুলি বঙ্গসংস্কৃতির মতো বেদনাভরা আঙ্গিকে আঁকানো' (অলোকরঞ্জন), অথবা 'পাছার বিপুল দোলানিতে কেঁপে উঠলো নাদব্রহ্ম' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়), তখন শুধু যে পুরোনো ভাষা নতুন দ্যোতনায় আলোকিত হয়ে ওঠে তাই নয়, সঙ্গে-সঙ্গে চোখের অভ্যাসের পর্দা অকস্মাৎ অপসৃত হয়। এমনভাবে গোষ্ঠীর ভাষাকে বারবার অবসন্ন জড়তার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা খাঁটি কবিমাত্রেরই দায়। যাঁরা অভ্যাসের জাবর কাটেন তাঁরা কবি নন। দিনানুদিন ব্যবহারে ক্লেদক্লান্ত শব্দসমূহকে একটা অপ্রত্যাশিত বিন্যাসের মধ্য দিয়ে জড়ত্ব ঘুচিয়ে কবি তাদের মধ্যে দীপ্তি ও গতি সঞ্চার করেন এবং একটা কালাতীত ভঙ্গিমায় সেই বিন্যস্ত শব্দসমূহ অমরত্ব পায়। পাথর যেমন ভাস্করের হাতে পড়ে চিরন্তন ভঙ্গিমায় বেঁচে থাকে।

শিশু ও বর্বরের মতো কবির চোখেও সহস্রবার দেখা পৃথিবী তার নতুনত্বের যৌবনরহস্য হারায় না। আমাদের সভ্যতার পরিণত বৃদ্ধ দৃষ্টিতে যে মিল ধরা পড়ে না, বর্বর বা শিশুর মতো কবি সেই উপমা খুঁজে পান বিস্তীর্ণ বিশ্বের সমস্ত বিষয়ে। আর এই উপমা-উৎপ্রেক্ষাই কবিতার প্রধান উপকরণ। শিশু এবং বর্বর তার ক্রমান্বয় প্রসারিত নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে, স্মৃতিতে জমিয়ে রাখার প্রয়োজনে, নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে;

কবিও তাঁর নতুন অভিজ্ঞতাকে প্রকাশের জন্যে, ভিকোর ভাষায়, সেই 'pristine beggary of words'-এ ফিরে যান। নবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে, জগৎ দেখার নিজস্ব দৃষ্টিকে সাকার করে তোলার প্রয়োজনে তাঁকে খুঁজতে হয় সেই অপ্রতিরোধ্য এবং অপরিহার্য উপমা, ব্যবহারে-ব্যবহারে যা বিবর্ণ নয়। একদা যাঁরা 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' বা 'উটের গ্রীবার মতো কোনো নিস্তব্ধতা'র কথা পড়ে মর্মান্তিক বিরক্ত হতেন তাঁদের কেউ কেউ আজ বোঝেন, কবির কোনো বদখেয়ালে নয়, স্বকীয় বিশ্ববীক্ষাকে প্রকাশের অপ্রতিরোধ্য প্রয়োজনে ঐ সব উপমা ব্যবহার করতে হয়েছিল কবিকে। আসলে ভাষা যত তাড়াতাড়ি আত্মসাৎ করতে পারে, মানুষের অভিজ্ঞতার দিগন্ত তার চেয়ে আরো তাড়াতাড়ি প্রসারিত হয়। সেই পরিবর্তমান অভিজ্ঞতাকে ধারণ করার জন্য কবিকে পুরোনো শব্দ নতুন অর্থে ব্যবহার করতে হয়, নতুন উপমা আনতে হয়, বাক্যবিন্যাসের প্রথাগত অভ্যাস ভেঙে তাকে নতুন নিয়মে সাজাতে হয়। এই চেষ্টায় জীবনানন্দ লিখেছেন 'বেহেড আত্মার মত সূর্যাস্ত', এই চেষ্টায় তরুণতররা লিখছেন 'যে গেছে সে চলে গেছে ; দেশলাইয়ে বিস্ফোরণ হয়ে/বারুদ ফুরায় যেন' (বিনয় মজুমদার), 'নতুন টাকার মতন সরল নিরাবরণ দুখানি শরীর' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)। স্পর্শকাতর কবির কাছে অভিজ্ঞতার পরিবর্তন যতো তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে, সাধারণ পাঠকের কাছে তা পড়ে না। তাই নতুনভাবে নির্মিত ভাষায় কবি যখন নতুন বিশ্বোপলব্ধি প্রকাশ করেন তা পাঠকসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। সেই জন্যে কাব্যের ইতিহাসে কতোবার দেখেছি, কবিরা আজ যে নতুন বোধ কবিতায় প্রকাশ করেন তা পাঠকের কাছে আজ অবোধ্য ঠেকলেও বিশ বছর পরে আস্তে আস্তে পাঠকের অনুভূতির দিগন্ত বাড়লে, আজকের কবির কবিতা তার কাছে বোধ্য হয়ে ওঠে।

বর্তমানকালে যান্ত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অসাধারণ উন্নতি হলেও বিস্ময়করভাবে আধুনিক সভ্যতার অন্যতম সমস্যা হচ্ছে মানুষে মানুষে যোগাযোগ বজায় রাখার সমস্যা। বিপুলায়তন নগর-নগরীতে অতিকায় ইমারতের কক্ষে কক্ষে যারা বাস করে, বিরাট কারখানা বা বিরাট আপিসে কর্মচারী বা শ্রমিক হিসাবে কাজ করে, যাদের অবসরবিনোদন এবং প্রমোদও অতিকায় যান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীন হয়ে পড়েছে—সেই সব মানুষের মধ্যে আজ আর সামাজিক সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে একশো বছর আগেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিণততম পুষ্প সাহিত্যবিজ্ঞানদর্শন সাধারণ শিক্ষিত মানুষের সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে চলে যায় নি। কিন্তু এখন বিভিন্ন বিদ্যার সংকীর্ণ বিশেষীকরণ এমন চরম পর্যায়ে পেঁৗছেছে যে সাধারণ মানুষ সেই সব বিষয়ের সঙ্গে আর যোগ রেখে উঠতে পারে না। বিজ্ঞানের এক শাখার ছাত্রও এমন কি অন্য শাখায় নিজেকে নিরক্ষর মনে করে। সংস্কৃতির উদার ক্ষেত্র থেকেও এইভাবে মানুষ নির্বাসিত হচ্ছে।

আধুনিক সভ্যতার এই পারস্পরিক সম্পর্কহীনতা সমাজের সবচেয়ে অনুভূতিপ্রবণ মানুষ কবিকে যে প্রভাবিত করবে এ খুবই স্বাভাবিক। সর্বব্যাপী বিচ্ছিন্নতার যুগে কবি বৃহত্তর জনসম্প্রদায় থেকে যোগসূত্রহীন হয়ে পড়েছেন এবং যে বিশেষ সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তিনি চলাফেরা করেন সেই মুষ্টিমেয়ের ভাষায় কবিতা লিখতে বাধ্য হয়েছেন। যদি জনজীবনের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর যোগ তাঁর থাকতো তবে সেই বিপুল সংখ্যক পাঠকসম্প্রদায়ের প্রয়োজন তাঁর কবিতাকে তাঁর অজ্ঞাতসারে অনেক পরিমাণে সহজবোধ্য করে তুলতো। কিন্তু সেই স্বাস্থ্যপ্রদ যোগ থেকে কবি বঞ্চিত হয়েছেন বলে, কবিতার ভাষা জনসাধারণের সরল ভাষা থাকলো না, কবি যাদের মধ্যে বাস করেন সেই উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের তির্যক ভাষাই কবিতার উপজীব্য হয়ে উঠলো। ইদানীং বেতারে রেকর্ডে বা সভায় কবিকণ্ঠে কবিতা পড়ার

ব্যবস্থা হয়েছে বটে হারানো যোগ ফেরানোর আশায়, কিন্তু আজো যাঁরা আগে থেকেই কবিতার অনুরাগী মাত্র তাঁরাই কবিতাপাঠের শ্রোতা। এমন কি যে সমাজতন্ত্র এই অবস্থার অবসান ঘটাতে চায়, সেই সমাজতান্ত্রিক দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভোজ্‌নেসেন্‌স্কির কবিতায় সেই তির্যকতার সমস্ত লক্ষণই চোখে পড়ে। এ সব ঘটনা নিয়ে যতোই আক্ষেপ করা যাক, এর দায়িত্ব ততোটা কবির নয়, যতোটা অবস্থার।

যখন সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে বিশেষীকরণের প্রবণতা মারাত্মক হয়ে উঠেছে তখন অভিমানের বশে কবিরাও দেখাতে চেয়েছেন অন্য শাস্ত্রের মতো কবিতাও দীর্ঘ চর্চার অপেক্ষা রাখে। 'যে-পাঠক দীর্ঘ সময় আন্তরিকতার সঙ্গে কবিতার অনুশীলন করেছে একমাত্র তারই কাছে কবিতা তার সমস্ত রহস্যের দ্রৌপদীর শাড়ি উন্মোচন করে। উদ্ধৃতি-উল্লেখের সাহায্যে, অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করে, বাক্য-বিন্যাস ও শব্দবিন্যাস প্রণালীকে ভেঙে, ভাষাকে প্রয়োজনবোধে যুক্তি ও ব্যাকরণের শাসন থেকে মুক্তি দিয়ে কবিরা কাব্যকলাকে একটা বিশেষ বিদ্যার মতো কূটবিষয়ে রূপান্তরিত করতে চলেছেন। এবং তাঁদের এই চেষ্টার অনেকটাই আত্মমর্যাদা বজার রাখার জন্যে।

তাই দেশিবিদেশি পুরাণ ইতিহাস ইত্যাদির উল্লেখ—মাতরিশ্বা, উর্বশী, আর্টেমিস, কণাদ, জেসন, যযাতি, কাসাণ্ড্রা, শেষনাগ, পুরূরবা, ট্রেসেমান, ব্রিয়ঁা, আত্তিলা, আইসাইয়া, আহুর মজদা আধুনিক কবিতার সর্বাঙ্গে ছড়ানো রয়েছে। একদিকে এই সব উল্লেখের উদ্দেশ্য, সাধারণ কাব্যবোধহীন অলস অজ্ঞ পাঠকের স্থূল হস্তাবলেপ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস, উল্লেখের পরিখা কবিতার চতুর্ধারে নির্মাণ করে। অন্যদিকে এই সমস্ত উল্লেখের মধ্য দিয়ে জাতি ও সভ্যতার দীর্ঘকালব্যাপী ঐতিহ্য কবিতার মধ্যে এক মুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে স্পর্শ করা যায়। পুরাণ বা মীথের ব্যবহার একই কারণে—এখনকার কাল যে চিরকালেরই অংশ তা চকিতে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে। তাই পুরাণ-

ইতিহাসের ব্যবহার শুধু নেতিবাচক কারণে নয়, তার ইতিবাচক উদ্দেশ্যও আছে।

অনেক সময় পূর্বসূরীর সম্পূর্ণ কবিতার চরণ বা বাক্‌বন্ধ, বিকৃত বা অবিকৃতভাবে পরবর্তী কবিরা ব্যবহার করে থাকেন—কখনো বিদ্রূপ করার জন্যে, কখনো সমর্থন করার জন্যে, কখনো দেখানোর জন্যে যে এক অনুভূতি চিরকাল কী ভাবে স্পন্দন জাগিয়েছে। 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও উদ্দাম উধাও/ট্রেন এলো বলে হাওড়ায়' (বিষ্ণু দে), 'নামল সন্ধ্যা, সূর্যদেব, এখানে নামল সন্ধ্যা' (বিষ্ণু দে), 'কত গোধূলি-মদির অন্ধকার কত মধুরাতি রভসে গোঙায়নু' (সমর সেন), অথবা 'বোমাত্মক এরোপ্লেন গান গায় দক্ষিণ সমীরে মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়) —কবি আশা করেন তাঁর পাঠক এই সব ব্যবহার ধরতে পারবে। হাওড়ার ব্রিজে ধাবমান জনস্রোত দেখে বিষ্ণু দে লেখেন—

জানি নি আগে, ভাবি নি কখনো
এত লোক জীবনের বলি,
জানি নি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক
এত লোককে গোপন সঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানি নি মানি নি আগে··

তখন তার মধ্যে এলিয়টের 'দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের' প্রতিধ্বনি,

A crowd flowed over London Bridge, so many
I had not thought life had undone so many.

এবং তার মধ্যে আবার দান্তের নরকের তৃতীয় সর্গের ছবি (ডরোথি মেয়ার্সের তর্জমা),

and there the folk forlorn
Rushed after it, in such an endless train,
It never would have entered my head
There were so many men whom death had slain.

শুনতে বা দেখতে না পেলে কাব্য পড়ার অনেকটা উপভোগ থেকে পাঠক বঞ্চিত হবেন। যিনি তাই যত বেশি বহুপাঠী তিনি আধুনিক কবিতার ততো ভালো পাঠক। কখনো আবার একটি মাত্র শব্দের ব্যবহারে সমস্ত পরিমণ্ডল রূপ লাভ করে—'অধীর মদির ঘ্রাণ বিকশিত লাইলাক বাসে'—এই 'লাইলাক' শব্দ মাত্রের প্রয়োগে সুধীন্দ্রনাথের নায়িকার বিদেশী জগৎ মূর্ত হয়েছে। কখনো একটিমাত্র শব্দের মধ্য দিয়ে ভাষা ও সংস্কৃতির সমস্ত ইতিহাস স্পন্দিত হতে থাকে এবং পাঠকের মনে স্পন্দন জাগায়। 'সহে না দুর্বহ এই নিঃসঙ্গ মাথুর' (বিষ্ণু দে), 'বার বার রাত্রি দিয়ে দিন যদি মুছি/হে পূষণ! কবে হবো শুচি' (প্রেমেন্দ্র মিত্র)—এই চরণ দুটিতে 'মাথুর' এবং 'পূষণ' সেই রকম শব্দ।

এই কথাগুলো বলতে হলো, কারণ সুধীন্দ্রনাথ ও প্রথম যুগের বিষ্ণু দে দুর্বোধ্য কবি বলে পরিচিত। কিন্তু এঁদের কবিতার কূটত্ব, যে পাঠকের শব্দভাণ্ডার বেশি, যাঁর হাতের কাছে ভালো অভিধান আছে তিনিই নিরাকরণ করতে পারেন। এই প্রচারজনিত আতঙ্ক থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারলে বরং দেখবো এঁরা অত্যন্ত স্পষ্ট সুবোধ্য কবি। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা তো জ্যামিতিক প্রতিপাদ্যের মতো স্তবকের পর স্তবক সাজিয়ে সিদ্ধান্তের দিকে পাঠককে পরিচালিত করে। তাঁর যে কোনো কবিতা আলোচনা করলে দেখা যাবে কবিতার স্তবকের সঙ্গে স্তবকের যোগ করে যে শব্দগুলো—তথাচ, ফলত, তবুও, যদিচ—এদের সন্ধান সচরাচর প্রমাণনির্ভর প্রবন্ধেই মেলে! বিষ্ণু দে তুলনায় জটিল, কারণ তাঁর দীর্ঘ কবিতা সঙ্গীতের প্যাটার্নে বিন্যস্ত। কিন্তু কবিতার যথার্থ কূটত্ব যে অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না তার বড় প্রমাণ জীবনানন্দ। তাঁর 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার কয়টা শব্দ অচেনা? তবু সেই বিপন্ন বিস্ময়ের জগতের বাসিন্দা হতে সময় নেয়। 'সোনার তরী'-র শব্দগুলো সরল, এমন কি প্রায় যুক্তাক্ষরবর্জিত, তবু তা নিয়ে ব্যাখ্যার শেষ নেই।

কবিতায় কুটত্বের আর একটা কারণ তির্যকভাষণ, সংক্ষিপ্তভাষণ। যে কথা সোজাসুজি বললে মনে সাড়া জাগায় না, তির্যকভাবে বললে সেই অনভ্যস্ত ধরন মনোযোগ আকর্ষণ করে। কবিতার স্বভাবই এই, কবিতা পরোক্ষতানির্ভর শিল্প। সংক্ষিপ্তভাষণের ফলে কবি মধ্যবর্তী তথ্য ও সম্পর্কগুলো খসিয়ে ফেলেন, এই আশায় যে পাঠকের কল্পনা ও কাব্যচর্চায় বিশুদ্ধ মনীষা সেই শূন্যতাকে পূরণ করে নেবে। কবিতার দুটো স্তবকের মধ্যে যে শূন্যতা তার তো একটা তাৎপর্য আছে। নিঃশব্দের সেই তাৎপর্যকে কবিরা স্তবকের মধ্যেও সামিল করতে চাইছেন। কেউ সেটা দৃশ্যমান করতে চাইছেন মুদ্রিত বইতে শব্দগুলোকে যথোচিত ফাঁকে ফাঁকে বসিয়ে। কেউ তা না করে, শুধু সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্য দিয়েই সেই নিঃশব্দের ভূমিকাকে মূল্য দিতে চেয়েছেন। একালের কবিরা যা সচেতনভাবে করেছেন, পুরোনো আমলের খাঁটি কবিতায় তার অনেক নিদর্শন আছে। ধরা যাক শেকসপীয়রের সনেটের একটা বিখ্যাত লাইন 'Bare ruined choirs, where late the sweet birds sang'—ধ্বংসস্তূপে পরিণত মঠের কাঠের তৈরি কয়ারে একদিন সারিবদ্ধ গান গাইত সুরূপ বালকেরা, তাদের সঙ্গে গাছের ডালে বসে থাকা শীতে পলাতক সুকণ্ঠ পাখিদের তুলনা করা হয়েছে। মঠের জানালার কাচে বর্ণবিন্যাসে ফুললতাপাতা আঁকা, তাই সেই সঙ্গে বনভূমির তুলনা। পুরোনো পরিত্যক্ত মঠের ধূসর দেওয়াল হয়েছে শীতের বিবর্ণ আকাশ। শুধু তাই নয়, এম্পসন দেখিয়েছেন, এই লাইনের মধ্যে ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটও দুর্লভ নয়। প্রটেস্টান্টগণ কর্তৃক মঠ ভেঙে ফেলার ঐতিহাসিক ঘটনাও সম্ভবত শীতের শূন্যবনে পলাতক পাখিদের বিবরণে ছায়াপাত করেছে।

আর এক ধরনের কূটত্ব জন্ম নেয় প্রতীক ব্যবহারের ফলে। প্রতীকী আন্দোলনের আগেও অবশ্য কবিতায় প্রতীক পাই আমরা। লুক্রেশিয়াসের কবিতায় মার্স মৃত্যুর, ভিনাস নবজন্মের প্রতীক।

দান্তে খ্রীস্টানধর্মের সর্বজনপরিচিত প্রতীকসমবায়কেই কাব্যে ব্যবহার করেছিলেন। বোদলেয়ারের আমল থেকে এই ব্যাপারে একটা হাওয়াবদল ঘটলো। কবিরা ব্যক্তিগত প্রতীক ব্যবহার শুরু করলেন। বোদলেয়ার যেমন ভাষার ক্ষেত্রে বহিরঙ্গে প্রাচীন বিন্যাস বজায় রেখেই অন্তর্মুখী দৃষ্টির তীব্র জ্বালায় পূর্বের স্থিতাবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন, তেমনি প্রতীক প্রয়োগের ব্যাপারেও তিনি খ্রীস্টধর্মের প্রতীকসমূহ গ্রহণ করেছেন বটে কিন্তু তাদের ব্যবহার অন্য স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ে। ঐতিহ্যের সঙ্গে সেই অভিপ্রায়ের কোনো যোগ নেই। মালার্মের উজ্জ্বল নীলাকাশ, ইয়েটসের গোলাপ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রতীকের উদাহরণ। এই সব প্রতীকের তাৎপর্য বোঝার জন্য পাঠককে কল্পনার উপর নির্ভর করতে হয়, কেননা এদের পূর্বপরিচয় ঐতিহ্যে মেলে না, আর কবিরাও এদের চরিত্র সম্বন্ধে কোনো ব্যাখ্যা কাব্যের বাইরে রেখে যান নি।

ইয়েটস জীবনের প্রতীক হিসাবে পুষ্পিত চেস্টনাট গাছ এবং সঙ্গীতের তালেলয়ে আন্দোলিত নর্তকীর ললিত দেহকে ব্যবহার করেছেন। নির্লিপ্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ধ্যানের প্রতীক স্ফিংক্স্ ও বুদ্ধের মাঝখানে নর্তকী নৃত্যের উন্মাদনা তোলে—এবং সেও নিজের নৃত্যের মধ্যে আত্মলীন ও আত্মস্থ। চিন্তার শীতল নির্বিকারের মধ্যে শিল্পের রক্তিম উল্লাস—এবং তাদের একান্ত সহযোগেই জীবনের পরিপূর্ণতা, যে পরিপূর্ণতা বিস্ময়ে-হতাশায় আমাদের যুগপৎ আপ্লুত করে। বিষয়-সর্বস্ব কবিতার বিরুদ্ধে আধুনিককালে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, সেই প্রতিক্রিয়ার ফলে কবিরা বিষয়কে প্রতীকের সাহায্যে রূপে পরিণত করেছেন, বিমূর্তকে অবয়বত্ব দিচ্ছেন। অথচ কাব্যোপলব্ধি করতে গেলে প্রতীকবস্তুর বর্ণবিন্যাস ও রেখাবিন্যাসই যথেষ্ট নয়, তার মাধ্যমে কবি যে ধারণাকে ধারণ করতে চান তার একটা আন্দাজ পাঠকের মনে থাকা দরকার। কিন্তু পাঠক যদি ধৈর্য ধরেন, কবিতাবিশেষ থেকে যদি প্রতীকের অভিপ্রায় আয়ত্তে না আসে,

তাহলে যে কবিতাগুচ্ছে ঐ প্রতীকের পুনঃপুনঃ উপস্থিতি সেই কবিতা-গুলি মিলিয়ে পড়লে ধারণা জন্মাবেই।

আধুনিকদের গুরুদেব বোদলেয়ার নানা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এক গূঢ় ঐক্য-সূত্র আবিষ্কার করেন এবং এক ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য দিয়ে অন্য ইন্দ্রিয়ের জগৎকে বর্ণনা করেন। সুইডেনবোর্গের মতকে আশ্রয় করে বোদলেয়ার তাঁর 'Correspondances'-এর তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন। তাঁর এবং প্রতীকবাদীদের মতে, যে কবি মহত্তম আত্মিক সচেতনতা অর্জন করেছেন, একমাত্র তিনিই ইমেজ প্রতীক উপমার সাহায্যে বহিঃ-পৃথিবীর বর্ণনার ভিতর দিয়ে তাঁদের ধ্যানের গোচর বিশ্বের বিষয়াবলীকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারেন। শিল্পমাত্রেই যেহেতু সেই ধ্যানের গোচর, বহিঃপৃথিবীর প্রতীকের মাধ্যমে প্রাপণীয় আত্মাকে অনুসন্ধান করে, সেই কারণে সমস্ত শিল্পের মধ্যে, কাব্য চিত্র বা সঙ্গীতের মধ্যে ঐক্য বর্তমান। এবং এই ঐক্য যদি লক্ষ্যের দিক থেকে সত্য হয় তবে এক শিল্পের মাধ্যম যে ইন্দ্রিয়, যেমন ছবির ক্ষেত্রে চোখ, তার সঙ্গে অন্য শিল্পের উপায় অন্য ইন্দ্রিয়ের, যেমন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কানের, মিল থাকাও সঙ্গত ও প্রত্যাশিত। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে অভিপ্রায়গত ও মাধ্যমগত এই ঐক্য প্রতীকী কাব্য-আন্দোলনের ভিত্তি। এই আন্দোলনের সমর্থনকারী শিল্পীরা সঙ্গীত চিত্র ও কাব্যের মাধ্যমে বস্তুজগতের অন্তরালে অবস্থিত সত্তাকে, পর্দার কম্পনের আড়ালে গর্ভগৃহে বাসকারী সত্তাকে আবিষ্কারের বাসনায় উৎসুক।

এই ঔৎসুক্যের সঙ্গে এসেছে মার্কিনী পো, জার্মান লেখক হফ্‌মান এবং সুরকার হ্বাগনারের প্রভাব। হফ্‌মান বলেছেন তিনি যখন সঙ্গীত শুনতেন তখন বর্ণগন্ধের অনুষঙ্গ তাঁর মনে জাগতো, তিনি অনুভব করতেন অসীমে এক পরম সামঞ্জস্যে তারা পরস্পরের সঙ্গে লীন হয়ে গেছে। Correspondances-এর এই তত্ত্বকেই বোদলেয়ার ঐ নামের বিখ্যাত সনেটে কাব্যরূপ দিয়েছেন—বুদ্ধদেব

বসুর অনুবাদে 'কোনো-কোনো গন্ধ যেন অর্গানের নিস্বনে কোমল,/ প্রেইরির সবুজে মাখা, শিশুর পরশে সুখময়…'। বর্ণগন্ধস্বাদ ও শব্দস্পর্শময় পৃথিবী যেন ইন্দ্রিয়সমূহের অলৌকিক বিশৃঙ্খলায় একাকার ও অভেদ হয়ে গেছে। এঁদের নেতৃত্বে বিশ্বের যে ছবি খুলে গেলো তারই উত্তরাধিকার হিসাবে পরের সময়ের কবিতায় পড়লাম, সুইনবার্ণের 'Thy voice is an odour that fades in a flame' অথবা শ্রীমতী সিটওয়েলের 'The light is braying like an ass'। সুধীন্দ্রনাথ লিখলেন 'লক্ষ লক্ষ অদৃশ্য কিঙ্কিণী/অধীর আগ্রহ-ভরে বিতরিল দিকে দিগন্তরে/স্বর্ণপ্রভ কবোষ্ণ ঝঙ্কার'। অন্য কবিদের রচনায় পাই, 'পর্দায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,' (জীবনানন্দ), অথবা 'এখন শুধু স্পর্শের লাল ফুলের উন্মীলন' (বুদ্ধদেব বসু)।

এখান থেকেই দ্বিতীয় সূত্রটি জন্ম নেয়—কাব্যে সঙ্গীতগুণের প্রাধান্যের জন্যে অনেক সময় যুক্তির বা ব্যাকরণের ব্যবস্থিত শৃঙ্খলাকে বর্জন করতে হয়। সমস্ত শিল্পেরই সঙ্গীতমুখী প্রবণতা আছে, পেটারের এই প্রখ্যাত উক্তির মধ্যে এই মতের সংহত প্রকাশ। এ সব কথার মানে এই নয় যে পুরোনো আমলের কাব্যে সঙ্গীতগুণ প্রশ্রয় পায় নি, এ কথার মানে বোদলেয়ার-পেটারের নেতৃত্বেই প্রথম এদিকে সচেতন নজর পড়লো। চিত্র ও ভাস্কর্য যেমন সঙ্গীতধর্মের প্রভাবে বর্ণিত বস্তু ও অনুভূতিকে বস্তু ও অর্থনিরপেক্ষ করে তোলে, তেমনি কাব্যেও সঙ্গীতগুণের সচেতন যোজনা তাকে অনেক পরিমাণে অর্থনিরপেক্ষ করে তোলে; ভাষার ব্যাকরণশাসিত ব্যবহারে যে শব্দ যেখানে বসতো না, যে অর্থে ব্যবহৃত হতো না, সেই শব্দ সেই অন্যায় জায়গায় বসে, অন্যায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং কাব্যের ঝঙ্কার যখন কান পেতে শোনার কথা অর্থের দুর্ভাবনা থেকে মনকে কিছুদূর মুক্ত রেখে, তখন যদি কোনো পাঠক পদে-পদে যুক্তিসঙ্গত অর্থ খুঁজে বেড়ান, তবে সে বিড়ম্বনার জন্যে কবিকে দায়ী করা যায় কিনা সন্দেহ।

কাব্যের শব্দসজ্জার মধ্যে কাব্যের সঙ্গীত জাগ্রত হয়—আরো স্পষ্ট ভাবে বললে, শব্দ যখন অর্থদ্যোতনার সহযোগে ধ্বনিদ্যোতনা করে তখন সেই ধ্বনির বিশিষ্ট বিন্যাসেই কবিতার সঙ্গীত জন্ম নেয়। শব্দের স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি, দীর্ঘ ও হ্রস্ব স্বর, যুক্ত ও অযুক্ত ব্যঞ্জন যে নানা বিচিত্ররূপে সাজানো যেতে পারে তারই সবচেয়ে সঙ্গত ও আবেগদ্যোতক বিন্যাসই কাব্যের সঙ্গীত। মনে রাখা দরকার এই সঙ্গীত কাব্য থেকে আলাদা কিছু নয়। ছন্দের মধ্যে এই সঙ্গীত গতি আর স্থিতি পায়। কবিতায় চিত্রগুণের জন্য যেমন উপমা, তেমনি কবিতার এই সঙ্গীত আশ্রয় পায় বেশির ভাগ অন্তর্লীন অনুপ্রাসে। এই অনুপ্রাস-আশ্রিত শব্দসঙ্গীতের প্রয়োজনেই 'এ যে অজাগর গরজে সাগর' লিখতে হয়, সিন্ধু লিখলে চলে না। কোথায়ও লাইন অনুপ্রাসে মুখর —'অন্তহীন ওষ্ঠহীন অন্ধকারে/অণ্ডহীন কঠিন ঠাণ্ডায়' (বুদ্ধদেব বসু), 'চন্দ্রকলার চন্দনটিকা জ্বলে' (সুধীন্দ্রনাথ), কোথায়ও সলজ্জ এবং মৃদু—'যদি পারো তবে আনো, আনো আরো জয়ের সম্ভার' (বিনয় মজুমদার)।

কিন্তু শুধু কলাকৌশলের পরীক্ষার দিকে নজর রেখে, এমন কি কাব্যকে শ্রবণসুখকর করার উদ্দেশ্যে কাব্যসঙ্গীতকে আশ্রয় করা হয় না। সঙ্গীতই কবিতার চরম লক্ষ্য মালার্মের এই উক্তিতে গভীর ইঙ্গিত আছে, সেই ইঙ্গিতের মহত্তর প্রেরণায় কবিরা দুই শিল্পের মধ্যে যোগাযোগের পথ খুলে দিতে উৎসাহ পান। কবিতার মৌলিক যে আবেগ, যা শব্দের অর্থের দ্বারা শুধু আয়ত্তে আসে না, শব্দের ধ্বনির দ্বারা সেই অনুভব-প্রসূ আবেগকে ধারণের জন্যেই কবিদের শব্দসঙ্গীতের সাধনা। মানুষের অনুভূতির যে জগৎ ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব তার চরমতম দিগন্ত পর্যন্ত শব্দের ধ্বনিসম্পর্কের মাধ্যমে, শব্দের শ্রুতির মাধ্যমে প্রকাশ করাই বিশুদ্ধ কবিতার কাজ। 'অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মত মিশে থাকে' (জীবনানন্দ) —এই চরণের অভিপ্রায় শুধু অনুপ্রাসপর্যায়ে শ্রবণসুখকর ধ্বনিতরঙ্গ

বাজানো নয়, এই কাব্যসঙ্গীতের উদ্দেশ্য বিশ্বের অনিবার্য অন্ধকার জেনে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণের শান্তি ও বিষাদের আবেগপ্রভ অনুভূতি প্রকাশ—যে অনুভূতি কবির মনে জাগ্রত হয়ে এমন ভাষা খুঁজে পেয়েছে যার মধ্যে অর্থ ও সঙ্গীতের মহিমান্বিত একাকার।

স্বরলিপি যেমন সঙ্গীত নয় তেমনি শব্দবিন্যাস বা বাক্যবন্ধও কবিতা নয়। সঙ্গীতে যাঁর চর্চা নেই, স্বরলিপি পাঠ যিনি অভ্যাস করেন নি—তাঁর কাছে স্বরলিপি অর্থহীন আঁকিবুঁকিমাত্র, তাঁর কাছে স্বরলিপি মহৎ সুরলীলার আভাস দিতে অক্ষম। কবিতার শব্দ-বিন্যাসও স্বরলিপির মতোই তাদের পরস্পর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, অর্থশক্তি ও ধ্বনিশক্তির মধ্য দিয়ে এক আবেগ ও উপলব্ধিকে দ্যোতিত করে। এই দ্যোতনাই কবিতা; অর্থবান ধ্বনিমান শব্দ ও বাক্য তার মাধ্যম মাত্র। শব্দ ও বাক্যকে চরম মনে না করে, মাধ্যম হিসাবে স্বীকার করে, যে কল্পনাশক্তিসম্পন্ন কাব্যচর্চায় মার্জিতচিত্ত পাঠক কবিতা পাঠ করবেন, তাঁর পক্ষে আবেগ ও উপলব্ধির সেই অন্তরঙ্গ আবিষ্কার সম্ভব হবে যার নাম কবিতা। নইলে কবিতা কূট ও মূল্যহীন খেয়ালমাত্র মনে হবে।

শব্দের অর্থ ও সঙ্গীতের মতো, আরো একটা ধর্ম তার আছে, যাকে কাজচালানো গোছে বলতে পারি চিত্রধর্ম। সব শব্দে জন্মকালে এক একটা প্রদীপ্ত চিত্রলতা ছিল এবং এখনো কবির হাতে তারা সেই জন্মস্বত্ব ফিরে পায়। কবি তাঁর আবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে 'objective equivalent' হিসাবে এই চিত্রগুণকে আশ্রয় করেন। উপমার মধ্য দিয়ে এই চিত্রলক্ষণ কবিতায় সাধারণত প্রকাশ পায়। কিন্তু আধুনিককালের কবিতায় ইমেজের মধ্য দিয়ে এই চিত্রধর্মের প্রকাশ আরো উজ্জ্বলতা ও বিশুদ্ধি পেয়েছে। মনে রাখা দরকার উপমামাত্রের মধ্যেই ইমেজ বর্তমান,

কিন্তু প্রতিটি ইমেজই উপমা নয়। ইমেজে উপমার মতো সাদৃশ্যগুণ সেতুবন্ধের কাজ করে না। কখনো ইমেজ একাই থাকে। যদি একই কালে দুই স্বতন্ত্র বস্তুর চিত্র এসেও যায় তবে তাদের মধ্যে কোনো তুলনা করতে চান না কবি, বড় জোর একের আলোয় অন্যকে নতুন করে চিনতে চান। তিনটি উদাহরণ নিই। প্রথমটি মার্কিন কবি মারিয়ান মূরের 'The lion's ferocious chrysanthemum head', অন্য দুটো বাংলা 'কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে' (রবীন্দ্রনাথ), 'উজ্জ্বল ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন এপ্রিলের বসন্ত আজ' (সমর সেন)। সিংহের পিঙ্গল ফোলানো কেশর-ওয়ালা মাথার সঙ্গে ক্রিসানথেমামের বর্ণাঢ্য পাপড়ির তুলনা পাই বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি পাই তাদের পরস্পর অভাবিত সন্নিকর্ষের মধ্য দিয়ে এক নতুন দৃষ্টি—যে দৃষ্টির আলোয় সিংহের কেশরসুদ্ধ মাথা এবং ক্রিসানথেমাম ফুলকে নতুন করে দেখি। দ্বিতীয় নিদর্শনে কোনো তুলনা নেই, এটি বিশুদ্ধ ইমেজ। তৃতীয়টিতে ইমেজ উপমাকে আশ্রয় করে জাজ্বল্যমান।

কবিচিত্তের চেতন ও অচেতন শক্তিসমূহ এক অলোকসম্ভব মুহূর্তে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সংহত আকার লাভ করে, য়ুং-এর ভাষায়, 'momentarily constellated' হয়, এবং সেই আলোড়নে যখন সমস্ত অবান্তর দূরীকৃত হয় তখনই ইমেজ জন্ম নেয়। কবিচিত্তের এই অচেতন শক্তিসমবায় যা চেতনশক্তির সহযোগে ইমেজের জন্ম দেয়, তারা কোন সুদূর জগৎ থেকে আসে, কবির ব্যক্তিগত শৈশব না জাতির প্রাগৈতিহাসিক শৈশব থেকে, সেই তথ্য জানার ফলে কবিতার উপভোগ প্রগাঢ়তর হয় না, কিন্তু সেই তথ্যের জ্ঞান ইমেজের উত্তরাধিকারের বিরাটত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দিতে পারে এবং কেন যে কোনো কোনো নাছোড়বান্দা ইমেজ আমাদের অব্যাহতি দেয় না তার কারণ বুঝতে পারি। সভ্যতার শৈশবে যে ব্যাখ্যাতীত প্রয়োজনে মানুষ টোটেম-প্রাণীকে পূজা

করতো, পশুপাখি সম্বন্ধে কুসংস্কারপূর্ণ ধারণা পোষণ করতো, তার দাবিতেই কি শেকসপীয়রের নাটকে, ইয়েটস ও জীবনানন্দের কবিতায় তাদের প্রকট উপস্থিতি? আসল কথা, অতিক্রান্ত কাল ও অব্যবহিত কাল, দূর ও নিকট জগতের সর্বত্র থেকে, মানবভাগ্যের সঙ্গে জড়িত সমস্ত বিষয় আহরণ করে তারই ভিতর থেকে একটি ইমেজ জন্ম নেয়।

কবির ব্যক্তিগত চেতনা থেকে বা জাতীয় মগ্নচেতনা থেকে ইমেজ না হয় জন্মালো। কিন্তু তাতে পাঠকের দুর্বিপাক ঘোচে না। তার জানা চাই ইমেজ কোন তাৎপর্যের কিরণ বা অনুরণন ছড়াচ্ছে, কীই বা তার অভিপ্রায়? সেই তাৎপর্যের ইশারা বিনা ইমেজের ব্যবহার নিরর্থক প্রতীয়মান হওয়া অস্বাভাবিক নয়। পুরোনো আমলের কবিতায় এই বিপদ থেকে নিষ্কৃতির উপায় ছিল। ইমেজ উপমা হিসাবেই দেখা দিত, আর সাদৃশ্যগুণ বলে দিত তার অভিপ্রায় কী। কিছু আগেও ইমেজ যখন স্বতন্ত্র মর্যাদায় জায়গা পেতো তখনও কবিতার সব কয়টি ইমেজ পরস্পর সম্পর্কে গ্রন্থিত হতো এবং এই গ্রন্থনের মধ্য দিয়ে একটা মীথ বা প্যাটার্ন গড়ে ওঠায়, একটা সংগঠন তৈরি হওয়ায় তাদের অর্থবোধও সহজ হতো। কিন্তু আধুনিক কালে কবিতার সমস্ত খাদ বর্জন করে কবিতাকে শুদ্ধ করার দিকে কবিরা এত ঝুঁকেছেন যে ইমেজসমূহের সংগঠনও অনেক সময় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে যে পাঠক কবিতায় কার সঙ্গে কার তুলনা দেওয়া হচ্ছে সহজে বুঝতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং ইমেজের পৃথক প্রাখর্য ও উজ্জ্বলতার চেয়ে সমস্ত কবিতায় একটি সংগঠিত ঐক্যের প্রত্যাশায় থাকতেন তাঁরা বিমূঢ় বোধ করেছেন। যেমন জীবনানন্দের 'বিড়াল' প'ড়ে।

কখনো-কখনো কবি স্বেচ্ছায় সম্পর্কের জটিলতা থেকে, ভাষার আইন থেকে, যুক্তির সঙ্গতি থেকে, সমস্ত সংগঠন থেকে মুক্ত, একটা উপলব্ধ অন্তর্দৃষ্টিকে একটা বিদ্যুতাক্রান্ত মুহূর্তের মধ্য দিয়ে প্রকাশ

করতে চান। তখন স্পষ্ট, অর্থ-ব্যতিরিক্ত এবং প্রশ্নাতীতরূপে ধ্যেয় অন্তর্দৃষ্টি ইমেজে সাকার হয়ে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা পায়। ইমেজের মধ্য দিয়ে তদ্গত বিরল মুহূর্তে বিস্ফোরণের মতো, হঠাৎ আঘাত পেয়ে চমকে ওঠার মতো নতুন পৃথিবী অন্তরপটে অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হয়। যাতে এই অন্তর্দৃষ্টির দিব্যবিভা কোনো বাধা কোনো খাদেই মলিন না হয় সেইজন্য তাকে স্থাপন করা হয় সমস্ত সম্পর্ক থেকে দূরে, বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যে। 'কেন না একদিন/স্বচ্ছ ব্যবধানে বেলা স্রস্ত হয়ে এলাবে যখন' (অমিয় চক্রবর্তী)—অমনি দুপুর হয়ে ওঠে এক আলস্যময়ী বিস্রস্তবাসা রমণী। 'নীলনীলিমা ললাট এমন আজলকাজল অন্ধকারে/ঘনবিনুনি শূন্যতা তাও বৃক্ষ ইব চতুর্ধারে!' (শঙ্খ ঘোষ)— অমনি নেমে আসে ছায়াছন্ন ঠাণ্ডা অন্ধকার। একখণ্ড বিশুদ্ধ পাথরই কখনও হয়ে ওঠে কবির ধ্যানের বিষয়—

> খণ্ড পাথর, শৌখিনতায় তুই কি চাস সজীব হয়ে উঠে দাঁড়াতে?
> অথবা তোর ভিতরে, অনেক ভিতরে, শিশুর রক্তাভ হাত
> যেমন কোমল সেই কেন্দ্রে
> অযুতবর্ষ সুপ্ত রয়েছে যে স্তব্ধতা, তাকেই অটুট রাখার
> নেশা ঢের বেশি বড়? (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে ইমেজের বিশুদ্ধি ব্যাপারটা কবিতার সংগঠনকে অস্বীকার করলেও বাস্তবক্ষেত্রে সেই সংগঠনকে এড়ানো যায় না। জীবনের অন্য পাঁচটা দিকের মতো শিল্পেও তত্ত্বকে বাস্তবের সঙ্গে না মানিয়ে উপায় নেই। যে ভালেরি কবিতাকে গণিতের বিশুদ্ধতায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন— 'a poem is in practice composed of fragments of pure poetry embedded in the substance of a discourse' (Pure Poetry)

একথা ঠিক, কবিতা থেকে 'discourse', প্রবন্ধসুলভ চিন্তামনীষার উপাদানকে বাদ দেওয়া যায় না। যতক্ষণ কবিতা শব্দ দিয়ে লেখা

আর শব্দ যতদিন অর্থময় ততদিন কবিতায় অর্থের সূত্রে চিন্তামনীষা যুক্তির উপাদান এসে যাবেই, যতোই তাদের বিরুদ্ধে কড়া পাহারা বসানো যাক। আসলে আধুনিক কবিতায় গদ্যময় যুক্তির বিরুদ্ধাচরণ, শুদ্ধতার সন্ধানে কূটত্ব এসেছে অতীতের প্রতিক্রিয়া হিসাবে। দীর্ঘকাল যে গদ্যময় ভাষণধর্মী কবিতা লেখা হচ্ছিল, ছন্দ খুলে নিলে যে-কবিতা পুরোপুরি গদ্য হয়ে যায়, তারই বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে। কবিরা দাবি করলেন গদ্যের মুণ্ডু ছিঁড়ে দেওয়া হোক। তাঁদের রাগ গিয়ে পড়লো শব্দের অর্থগুণের উপর, কেন না ঐ অর্থের চোরাপথ ধরে কবিতায় গদ্য ঢুকে পড়ে তার শুচিতা নাশ করে। তাঁরা চাইলেন শব্দের অর্থগুণকে যথাসম্ভব অগ্রাহ্য করে চিত্রগুণ ও সঙ্গীতগুণের উপর জোর দিতে—তার জন্য ভাষার স্থিতাবস্থা, ব্যাকরণের শাসন, যুক্তির বালাই তাঁরা একের পর এক ভাঙতে দ্বিধা করলেন না। মার্কিনী ম্যাকলীশ এই প্রবণতাকে এক ছত্রে প্রকাশ করলেন 'A poem should not mean/But be.' কবিতার অর্থবোধ হয় কিনা সেটা জরুরি নয়, জরুরি ব্যাপার রচনাটি কবিতা হয়েছে কিনা। কবি যে আবেগ শব্দ ও ইমেজসজ্জে বিন্যাস করেছেন, কাব্যসঙ্গীতের আনুকুল্যে পাঠকের মনেও অনুরূপ আবেগ জাগাতে পেরেছেন কিনা, কবিতার আলোচনায় সেইটেই আসল কথা। কবির মনে কবিতাটি যে ভাবাবেগ জন্ম দিয়েছে, সেই ভাবাবেগ, সেই তাৎপর্যবোধ পাঠকের মনে যদি সঞ্চারিত হয়ে থাকে, তবে কবিতার কোনো কোনো চরণ বা ইমেজ যতই তার কাছে অবোধ্য থাকুক, সম্পূর্ণতায় কবিতাটি তাঁর আত্মস্থ হয়েছে।

কিন্তু ম্যাকলীশের সূত্রাকার চরণের মধ্যে যে কথা বলা হয়েছে তা মানা যায় না কারণ being বা সত্তা থেকে আমরা meaning বা অর্থ বাদ দিয়ে পাই না। পাই না বলেই, চিন্তামনীষাকে যুক্তিকে কবিতার জগৎ থেকে বাদ দেওয়া যায় না। কবিতায় চিত্রের প্রবণতা আসতে পারে কিন্তু কবিতা চিত্র হয়ে উঠতে পারে না, কবিতায়

সঙ্গীতের প্রবণতা আসতে পারে কিন্তু কবিতা সঙ্গীত হয়ে উঠতে পারে না। কবিতার এই অনিবার্য সীমাবদ্ধতাতেই তার চারিত্র্য এবং এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার চেষ্টা তার সফল হয় ঐ গণ্ডীবদ্ধতা মেনে নিয়েই। দূরকালের কবিতার কথা ছেড়ে দিচ্ছি—আধুনিক কবিদের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতাই প্রমাণ করে শুদ্ধ কবিতা হওয়ার জন্য অর্থকে নির্বাসন আবশ্যিক সর্ত নয়, শব্দের অর্থগুণকে মেনে নিয়েও মহৎ কবিতা লেখা যায়।

তবু একথাটা থেকেই যায়, কবিতায় অর্থ থাকবেই, কিন্তু সেই অর্থ যুক্তির নয়। মারিতাঁর কথায় কাব্যবোধ লজিকাল অর্থকে আত্মসাৎ করবে—কবিতার অর্থকে কাব্যবোধ বলাই ভালো। 'The poetic sense alone gleams in the dark.' কবিতার বোধ যুক্তির সিঁড়ি ভেঙে আসে না, উপলব্ধির তাৎপর্য, তির্যক দ্যোতনার পথে আসে। ভুল জাতের অর্থ খুঁজতে গেলে কবিতাকে চরিত্রভ্রষ্ট করা হয়। তাই কবিতার পৃথক পৃথক অংশের অস্পষ্টতা, এমন কি কূটত্বকে যদি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করি, তবে আমাদের মনের মধ্যে শব্দ তার অর্থ সঙ্গীত আর চিত্র নিয়ে জাদুক্রিয়া শুরু করতে পারবে—এবং সেই ক্রিয়ার পরিণত ফল হিসাবে সম্পূর্ণ কবিতার তাৎপর্য আমাদের মনে জেগে উঠবে, কবির অভিজ্ঞতার আমরা অংশীদার হতে পারবো এবং হয়তো কোনো প্রগাঢ় বিশ্ববোধ আমাদের আয়ত্তগত হবে।

অতীতের ভাষণপন্থী কবিতার বিরুদ্ধে শুদ্ধতার সন্ধিৎসায় কী ভাবে আধুনিক কালের কবিতা কূট ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল ঐতিহাসিক নিয়মে, তা বলেছি। তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি কবিদের অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার, কবিতার একজাতীয় কূটত্ব আছে যা সাময়িক নয়, যা সর্বকালীন এবং খাঁটি কবিতা মাত্রেরই ধর্ম। রীড্ সাহেব ঠিক কথাই বলেছেন 'The poetry remains in the obscurity—is, in some way the obscurity itself' (Obscurity in Poetry)। কবিদের

সমস্ত তত্ত্ব সত্ত্বেও কবিতাকে যেমন অর্থের বন্ধন থেকে মুক্ত করা যায় না, তেমনি প্রগল্‌ভ বাকপটুতায় কবিতা তার সমস্ত অর্থকে উজাড় করে প্রকাশ করতে পারে না। শেকসপীয়র রবীন্দ্রনাথের মতো আপাতসরল কবির কবিতাতেও অর্থ পুরোপুরি স্পষ্ট নয় এবং স্পষ্ট নয় বলেই পরিচিত শব্দগুলির মধ্যে এক অপরিচিত দ্যোতনার কম্পন আন্দোলিত হয়ে তাদের গতি দেয় এবং কাব্য করে তোলে। কিছু অর্থ আয়ত্তের অতীত থেকে যায় বলেই তারা কবিতা। 'Ripeness is all', বা 'O dark dark dark, amid the blaze of noon' অথবা 'Things fall apart; the centre cannot hold'—এদের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ জানি, বাক্যাংশগুলির যুক্তিসঙ্গত সুশৃঙ্খল অর্থও করা যায়, তবু মনে হয় ঐ কয়টি শব্দের উপর যেন জীবনের মহত্তম উপলব্ধির গুরুতর ভার, যার সম্পূর্ণতা চিরকাল আয়ত্তের অতীত থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবন-অন্তিমের 'প্রথম দিনের সূর্য'. বা 'দুঃখের আঁধার রাত্রি' একেবারেই নিরলঙ্কার, অর্থবোধেরও কোনো অসুবিধা নেই আপাতত, তবু যেন মনে হয় তার সমস্ত তাৎপর্যের স্তর পুরোপুরি কোনোদিন জানা যাবে না। এই জন্যেই কবিতার সারমর্ম আর কবিতা এক বস্তু নয়। তাই শেষ পর্যন্ত, কোনো কবিতা খাঁটি না মেকি তা যাচাইয়ের মাপকাঠি এই কূট উপাদানের অস্তিত্বে।

> দূর হতে শুনি বারুণী নদীর তরল রব—
> মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব। (রবীন্দ্রনাথ)

বারুণী নদীর তরল রবের মধ্য দিয়ে মনের মধ্যে বিশ্বসংসার কথা কয়ে ওঠে, জীবনের প্রাপ্তি বা প্রেম মেলা অসম্ভব অসম্ভব—কিন্তু এই কথাই যে সন্দেহাতীতভাবে অর্থের সমস্ত স্তরকে প্রকাশ করলো তাও জোর দিয়ে বলা যায় না। যায় না বলেই ঐ কাব্যপঙক্তি তাদের আপাতসরল, আসলে অস্পষ্ট অর্থ নিয়ে আমাদের কানে ও মনে ক্রমান্বয়ে বাজাতে থাকে।

কবিতার আয়তন

দীর্ঘ কবিতার বিরুদ্ধে কবি ও সমালোচকেরা ইদানীং যা বলছেন সে কথা সংক্ষেপে অনেকদিন আগে হোরেস কাব্যতত্ত্ব বইতে বলেছেন, 'I grieve when Homer nods : but every song/Is liable to tedium if long.' অনেক পরে এডগার অ্যালেন পো জানিয়েছিলেন তাঁর মতে দীর্ঘ কবিতা বলে কোনো কিছু নেই। কবিতার যে মত্ততা তা খুব দীর্ঘ কবিতায় বজায় রাখা যায় না ; পো-র মতে প্যারাডাইস লস্ট অনেকগুলো ছোট কবিতার সমষ্টি। পো-র অনেক কথার মর্ম ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে না পারলেও তাঁর কাব্যাদর্শ যে অনেক পরিমাণে বোদলেয়ারকে প্রভাবিত করেছিল, একথা এখন কবিতার পাঠকমাত্রেই জানেন। সেই বোদলেয়ার-মালার্মের পর থেকে শুদ্ধতার সন্ধানে কবিতা ক্রমেই আকারে ছোট হয়ে আসছে---নীতি তত্ত্ব উপাখ্যানের খাদ বর্জন করতে করতে হয়ে উঠছে আকারে লঘু। গীতিকবিতাকেই গণ্য করা হচ্ছে কবিতার সারাৎসার বলে, দু-তিনটি স্বল্পায়তন স্তবকে এখন কবিতার সমাপ্তি স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইমেজিজমের গুরু হিউমের সমগ্র কাব্যসংগ্রহে আছে মোট পাঁচটি কবিতা, এবং সব কয়টি কবিতার মোট চরণসংখ্যা চল্লিশের বেশি নয়। এই প্রবণতা এখন এতদূর গড়িয়েছে যে পাশ্চাত্যের কোনো-কোনো কবি এক-দেড় লাইনকেই সম্পূর্ণ কবিতা বলে দাবি করতে শুরু করেছেন। যেমন গুসিপ্পে উনগারেত্তি। তাঁর একটি কবিতা পাচ্ছি— 'M' illumino/d' immenso'—অসীমের আলোয় আমি নিজেকে প্লাবিত করি। বিমূঢ় বিরুদ্ধবাদী বলবেন এটা কি কবিতা, না কাগজের টুকরোয় নিতান্ত এক বিস্ময়চিহ্ন! ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো সে সম্বন্ধে উনগারেত্তি নিজেও হয়তো নিশ্চিত ছিলেন না—তাই একজায়গায়

এই বাক্যটির নামকরণ করেছেন ‘সকাল’, অন্য জায়গায় ‘স্বর্গ ও সমুদ্র’। যে নেরুদা দীর্ঘ কবিতা রচনায় সিদ্ধি অর্জন করেছেন, উনগারেত্তির সঙ্গে তাঁর বিবাদের কারণ এখান থেকেই অনুমান করা যায়। আর পো যিনি দীর্ঘ কবিতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিলেন তিনিও সেই অস্বীকারের পরিণাম দেখলে হয়তো চমকে উঠতেন, কারণ তিনি আবার খুব ছোট কবিতার বিপক্ষে ছিলেন। অতি-সংক্ষেপ কবিতাকে সুভাষিতের পর্যায়ে পর্যবসিত করে। তাঁর মতে অতি-সংক্ষিপ্ত কবিতা কখনো-কখনো ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তিতে মুগ্ধ করলেও, স্থায়ী বা গভীর পরিণাম জন্মাতে পারে না। এই প্রবণতা যদি চলতে থাকে তাহলে একদিন নিরঞ্জন মৌনকেই হয়তো কবিতা বলতে হবে।

বাংলা কবিতায় ইদানীং এই প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠেছে। কয়েকটি প্রমাণ দিই। শান্তি লাহিড়ী সম্পাদিত ‘বাংলা কবিতা’ সংকলনটি পঞ্চাশের ও ষাটের দশকের কাব্যচর্চার প্রতিনিধিস্থানীয় বলা চলে। এই সংকলনের দীর্ঘতম কবিতার চরণসংখ্যা আটচল্লিশ। অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত ‘বারো বছরের বাংলা কবিতা’-র দীর্ঘতম কবিতাগুলির চরণসংখ্যা ত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয়। ‘কবিতা পরিচয়’ নামে আধুনিক কবিতার বিশ্লেষণসংবলিত পত্রিকাটিতে বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচিত কবিতাগুলি ব্যতিক্রমহীনভাবে হ্রস্বকায়। পত্রিকাটির অপরিসর হয়তো একটা কারণ, কিন্তু মনে হয় একমাত্র কারণ নয়—ছোট কবিতাই শুদ্ধ কবিতা এই মনোভাবও কি পিছনে সক্রিয় নেই?

> জল কি তোমার জন্য ব্যথা পায়? তবে কেন, তবে কেন
> জলে কেন যাবে তুমি নিবিড়ের সজলতা ছেড়ে?
> জল কি তোমার বুকে ব্যথা দেয়? তবে কেন, তবে কেন
> কেন ছেড়ে যেতে চাও দিনের রাতের জলভার? (শঙ্খ ঘোষ)

কুড়িটি শব্দে একটি সম্পূর্ণ কবিতা। লক্ষ্য করার যে এই পুনরুক্তি-পরায়ণ কবিতাটি যেমন জিজ্ঞাসায় শুরু, তেমনি জিজ্ঞাসায় শেষ।

স্বীকার করি সীমাবদ্ধতায় চরণ চারটি চমৎকার, কিন্তু সীমাবদ্ধ অবশ্যই। এবং সব কবিতাই যদি ক্রমে-ক্রমে এই ধরনের হয়ে ওঠে? রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় অতিকথায় কাব্যের বাঁধুনি এলিয়ে পড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু যদি 'স্ফুলিঙ্গ' লিখতেন তাহলে রবীন্দ্রনাথ কি রবীন্দ্রনাথ হতেন? পাউণ্ডের সমগ্র ক্যাণ্টোজ আমি পড়িনি, তাই বলতে পারি না তার মধ্যে পূর্বাপর স্থাপত্যের মতো বা সঙ্গীতের মতো কোনো পরিকল্পনাগত ঐক্য আছে কিনা—না সেগুলো নিতান্তই 'ছোট-ছোট গীতিকাব্যের মুক্তো'র একটি ছেঁড়া মালা। কিন্তু ক্যাণ্টোজ বাদ দিয়েও তাঁর অন্য দীর্ঘ কবিতা পড়লে বোঝা যায় তিনি যদি সারাজীবন হিউমের সাকরেদি করে 'In a Station of the Metro'-র মত 'The apparition of these faces in the crowd ;/Petal on a wet, black bough.'—দুই চরণে সম্পূর্ণ কবিতা লিখতেন তাহলে কবিহিসেবে তাঁর জায়গা হতো হিউমের পাশেই। এলিয়টের কথাই ধরা যাক, তিনি যদি দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড বা ফোর কোয়ার্টেটের মতো দীর্ঘ কবিতা না লিখতেন তাহলে তিনি ক্ষুদ্র কবিতার সিদ্ধিতে মহত্ত্বের শিখর জয় করতে পারতেন না। দীর্ঘ কবিতা লেখেন নি অথচ মেজর কবির প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন এমন নজির মেলে না—এমন কি ইয়েট্‌স্‌ও এই নিয়মের পুরো ব্যতিক্রম নন। তাহলে কি উনগারেত্তি-প্রমুখ কবিরা অপ্রধান কবি হয়েই তুষ্ট থাকতে চান? এ কি বিনয়, না আত্মবিশ্বাসের অভাব? আত্মপ্রত্যয়ের অভাব কি শুধু কবির নিজের শক্তি সম্বন্ধে, না কবিতারই সম্বন্ধে? ব্যাপারটা হয়তো অযৌক্তিক, কিন্তু বৃহত্ত্বের সঙ্গে মহত্ত্বের কোথায়ও একটা অপ্রতিরোধ্য যোগ আছে, যার হাত আমরা এড়াতে পারি না।

ভালেরি বলেছিলেন, শুধু বুদ্ধি দিয়ে কবিতা লেখা যায় না। বুদ্ধির ব্যায়ামে ইদানীং বাংলায় অনেক কবিতা যে লেখা হচ্ছে, যাদের গ্রেভ্‌সের ভাষায় কোলাজ-কবিতা বলা-চলে, সেই চাতুরিগুলো যথার্থ কবিতা নয়। সে যাই হোক, ভালেরির কথার প্রতিধ্বনি শুনি

জীবনানন্দের উক্তিতে 'নিছক বুদ্ধির জোরে কবিতা লেখা সম্ভব নয়।' বুদ্ধি যথেষ্ট নয়, এই কথা বলেছেন তাঁরা, বুদ্ধিকে বর্জনের পরামর্শ কিন্তু দেন নি। চৈতন্যের ব্যবহার যেমন যথেষ্ট নয়, তেমনি আবার অচেতন-অবচেতনের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা চলে না। সম্প্রতি-কালে বাংলা কবিতা যে আয়তনে ছোট হয়ে আসছে, দীর্ঘ কবিতা লেখা হচ্ছে না, তার কারণ বুদ্ধিকে-চৈতন্যকে অবিশ্বাস, অবচেতনের কাছে আত্মসমর্পণ। এখন কবির শুধু অপেক্ষায় বসে থাকা যতক্ষণ কিছু ইমেজ বা সুর সেই অবচেতনের অস্বচ্ছ অতল থেকে উঠে না আসে। সেই আধিভৌতিক শক্তির নির্দেশে শ্রুতিলিখন লেখেন কবি। কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতক প্রম্‌টার মাঝখানে যেই অন্তর্হিত হয় অমনি অপ্রস্তুত কবির কবিতায় দাঁড়ি পড়ে যায়—অবচেতনের দম ফুরিয়ে গেলে কবি নামক কলের পুতুল হয়ে পড়েন নিশ্চল।

'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় একজন পঁচানব্বুই চরণ এগোনোর পর হতাশ হয়ে হার মেনে অসমাপ্ত কবিতার শেষে বন্ধনীর মধ্যে লিখে দিয়েছেন 'বাকি অংশ লেখা হয় নি।' কিন্তু ছাপা হয়েছে, কারণ সকলেই মনে-মনে জানে যে এখনকার কবিতার একটা বড় অংশ এমন অসমাপ্ত কবিতা, যদিও মুখ ফুটে কেউ সে কথা কবুল করে না। 'আহত ভ্রূবিলাস' বইতে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় 'চূর্ণ কবিতাগুচ্ছ' মুদ্রিত করেছেন—সমাপ্তির চেষ্টায় হার মেনে এই মুদ্রণ পরাজয়ের স্বীকৃতি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'উৎক্ষিপ্ত কররেখা' নামে এক থেকে একাধিক লাইনের কিছু বিচূর্ণ কবিতাকণাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ' বইতে এবং পাদটীকায় জানিয়েছেন 'নানা সময় নানা পদ্য শুরু করেছিলাম—এগোয় নি। লিখিত টুকরোগুলোর কয়েকটি তুলে দিয়ে নিস্তব্ধ অলিখিতের দিকে নির্দেশ করছি মাত্র।' এ কি নীরব কবিত্ব না পরাভূত কবিত্ব? এর পরে কি আমরা অপেক্ষা করে থাকবো সেই কাব্যকৌতুকের জন্যে, যখন কবি বাঁধানো সাদা পৃষ্ঠা পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে 'নিস্তব্ধ অলিখিতের দিকে নির্দেশ' করবেন?

বিদেশে এই অপেক্ষার অবসান ঘটেছে। মার্কিন ঔপন্যাসিক উইলিয়ম সারোয়ানের পুত্র আরাম সারোয়ানের একটি কবিতার বই বেরিয়েছে। বইয়ের কবিতাগুলো ছোট হতে হতে শেষে 'm' অক্ষরটাই হয়েছিল কবিতা। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, তারপরের পৃষ্ঠায় আছে শুধু পৃষ্ঠাসংখ্যা, পরের পৃষ্ঠাগুলো সাদা, একেবারে সাদা! কবিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চুকে গেছে, এর পর শ্রীমানের এই ঘোষণায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

এই জাতীয় অবচেতনে-নির্ভরশীল কবিতার মধ্য দিয়ে ইমেজ-সঙ্গীতের সামঞ্জস্যে কখনো-কখনো একটা ভাবমণ্ডল সৃষ্টি হয় বটে, কৃষ্ণহীরের দ্যুতির মতো একটা অস্পষ্ট অর্থের আভা মেলে বটে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই তা অসম্বদ্ধতায় দুষ্প্রবেশ্য হয়ে ওঠে! অথচ কবিতা যতোক্ষণ শব্দে লেখা এবং শব্দ যতোদিন অর্থময়, ততোক্ষণ অর্থের ছোঁয়া কবিতা এড়াবে কী করে? প্রত্যেক শিল্পই মাধ্যমের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে তবে সেই সীমাকে অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু চৈতন্যে অবিশ্বাসী এই কবিতা যেহেতু অর্থেও পুরোপুরি বিশ্বাসী নয়, সেজন্য সে যুক্তি-তর্ক বক্তব্য-তত্ত্বকে সন্দেহের চোখে দেখে। দীর্ঘ কবিতা, যেখানে কল্পনার সহযোগে যুক্তিতর্কের কাব্যময় পরম্পরায় সঙ্গত পরিণাম অর্জিত হয়, সেই ধরনের কবিতা স্বভাবতই এই পরিবেশে লিখিত হতে পারে না। উপকরণকে ছন্দোবদ্ধ করার অর্থও যেমন জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম, দীর্ঘ কবিতারচনার জন্যেও তেমনি দরকার হয় জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের নিরন্তর মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হতে পারার ক্ষমতা। চৈতন্যে অবিশ্বাসী, অবচেতনে বিশ্বাসী কবিসম্প্রদায় এখন সেই সংগ্রামে লিপ্ত হতে রাজী নন; দীর্ঘ পরিশ্রম ও ধৈর্যে পরাঙ্মুখ তিনি সেই সংগ্রাম এড়িয়ে যান। অথচ জড়-উপকরণের উপর চৈতন্যের জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার নামই তো শিল্প।

ভালেরি এ কথা জানতেন, তিনি জানতেন যতোক্ষণ কবির উপাদান শব্দ ততোক্ষণ কবিতা থেকে অর্থ শোধন করা সম্ভব নয়। শুদ্ধ

কবিতার প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি জানতেন কবিতায় শুদ্ধতা এক অনায়ত্ত আদর্শ—কবিতা থেকে যা-কিছু-কবিতা-নয় তাকে অপসারিত করার চেষ্টায় কবি নিরলস নিযুক্ত থাকেন বটে, কিন্তু সেই আদর্শ অর্জন করা যায় না কোনোদিন। ভালেরির 'La Cemetie`re marin' এবং 'E`bauch d'un Serpent' দীর্ঘ কবিতা দুটো এই কথার সত্য প্রমাণ করছে। অথচ এখন 'fragments-ই পূর্ণ কবিতার মর্যাদা পাচ্ছে, এবং 'substance of discourse'-এর প্রতি, মনীষার প্রতি সন্দেহবশত কোনো সত্যকার দীর্ঘ কবিতা লেখা হচ্ছে না। ক্বচিৎ দু-একটা দীর্ঘ কবিতা পাই বটে কিন্তু সেগুলোর বেশির ভাগই দীর্ঘ কবিতার মৌলিক সর্ত মেনে নেয় নি—মননের বা উপলব্ধির অস্তিত্ব, স্থাপত্যধর্মী বা সঙ্গীতধর্মী গঠন এবং চিন্তার প্রগতি; সেগুলির অনর্গল সংলগ্নতাহীন চিৎকারে ক্লান্ত হয়ে পাঠক বলে, দোহাই আপনি ক্ষুদ্র কবিতাই বরং লিখুন, সে তবু সহ্য হয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'অনন্তনক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে' মনে হয় একটা দীর্ঘ কবিতা, কিন্তু এটিও 'উৎক্ষিপ্ত কররেখা'র মতো কি বিচ্ছিন্নতার সমাহার নয়? ঐক্য কোথায়?—সম্বোধনের তুমিতে, না বিস্রস্ত অনর্গল পয়ারে। 'তিন তরঙ্গের' 'যোগাযোগ' অংশে শক্তি চট্টোপাধ্যায় যে চারটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন সেই জীবনানন্দ-প্রভাবিত কবিতাচতুষ্টয়ে ভাবের ঐক্য নেই—খানিকটা অস্ফুট তাৎপর্যের আভাস মেলে 'উটের মধুর আরব এসেছে কাছে' কবিতাটিতে। বাকি সব 'ক্ষিপ্ত বিকেন্দ্রীকরণ', 'উলোট-পালোট করে দিতে' চাওয়ার মত্ততায় অসম্বদ্ধ, অসংলগ্ন।

অথচ স্বদেশিবিদেশি কোনো কবিশ্রেষ্ঠ শুদ্ধতার সন্ধানে তত্ত্বকে, তর্কসোপান বা স্বজ্ঞার আলোয় অর্জিত উপলব্ধিকে কবিতার বিষয় করতে নারাজ হন নি। সেই সময় তাঁরা দীর্ঘ কবিতাকে বাহন হিসেবে মেনে নিয়েছেন অনিবার্যভাবে। রিলকের কথা ধরা যাক, তিনি তো অবচেতনকে কম মর্যাদা দেন নি। তিনি বলেছিলেন সব

অভিজ্ঞতাকে সযত্নে জমিয়ে রেখে পরম ধৈর্যে অপেক্ষা করতে হয়—কবে সেই অভিজ্ঞতাপুঞ্জের মধ্যে একটি শব্দময় হয়ে আলোড়ন জাগাবে, এবং নবজন্ম নেবে তার জন্যে। তাঁর ডুইনো এলিজির দশটি দীর্ঘ কবিতার উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। ইন্দ্রিয়ের জগতে সার্থকতার পর হৃদয়জগতে প্রবেশের জন্যে তিনি উন্মুখ হয়েছিলেন—অনুকূল অবসর এলো যখন তিনি ত্রিয়েস্তের নিকটবর্তী ডুইনো দুর্গে অবস্থান করছিলেন তখন। একদিন একটি বিরক্তিকর চিঠির জবাব মনে-মনে গুছিয়ে নেবার জন্যে তিনি সমুদ্রতীরে ঘুরছিলেন, এমন সময় গর্জমান ঝড়ের মধ্য থেকে কেউ যেন ডেকে বললো (বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে)—'কে, আমি চিৎকার করে উঠি যদি, তবে শ্রোতা শ্রেণীবদ্ধ ঐ/দেবদূত-পর্যায়ের মধ্য থেকে?' নোটবইয়ে তিনি চরণটি লিখে রাখলেন এবং এটিকেই প্রথম চরণ হিসাবে ব্যবহার করে সেদিন সন্ধ্যায় প্রথম এলিজিটি রচনা সমাপ্ত হলো। দুরূহ কাজ সহজে সম্পন্ন হয় নি, দরকার হয়েছিল আরো দশ বছরের অপেক্ষা—দশটি বছর ধরে মনন ও কল্পনার যুগপৎ সংহত প্রয়োগ। দুই সপ্তাহের মধ্যে এলো অজস্র কবিতা অনর্গল স্রোতের মতো—কিন্তু তার জন্যে মনে মনে কবিকে প্রস্তুত হতে হয়েছিল দশটি বছর। যদিও তিনি চিঠিপত্রে নিজের ভূমিকাকে অকিঞ্চিৎকর বলে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন চরণগুলি 'grace' বা প্রেরণায় লব্ধ। কিন্তু সন্দেহ নেই তত্ত্বোপলব্ধিকে অচ্ছুৎ করে রাখলে এই মহৎ এলিজিসমুচ্চয় রচিত হতো না। শুধু অবচেতনের নিরালোক থেকে উঠে আসা ইমেজের দাক্ষিণ্যে নির্ভর করলে হতো না।

যা কিছু স্টেটমেণ্টগন্ধী, ভাষণ বা বক্তব্যময়, তার প্রতি এক অদ্ভুত আতঙ্কে স্পর্শকাতর কবিরা এড়িয়ে চলেছেন যে কোনো বাক্যকে যা গদ্যে, যুক্তিপরম্পরানির্ভর গদ্যে ব্যবহৃত হতে পারে। অথচ আপাতদৃষ্টিতে যা আকাট গদ্যবাক্য তাও কবিতায় ঠিক গদ্যের মতো ব্যবহৃত হয় না, সেই কারণে গদ্যবাক্য জায়গা পেলেই কবিতা আর কবিতা

থাকবে না, এই ভয়ে আঁতকে ওঠার কোনো কারণ নেই। শিল্পে কল্পনা ও সত্যের সমস্যাটি ওয়ালাস স্টীভেনসের 'The Man with the Blue Guitar' নামক দীর্ঘ কবিতার বিষয়। তার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি—

> A man bent over his guitar,
> A shearsman of sorts. The day was green.
>
> They said, "You have a blue guitar,
> You do not play things as they are."
>
> The man replied, "Things as they are
> Are changed upon the blue guitar."
>
> And they said then, "But play, you must,
> A tune beyond us, yet ourselves,
>
> A tune upon the blue guitar
> Of thing exactly as they are."

বক্তব্য শুধু তাত্ত্বিক নয়, অনেকগুলো বাক্যও এখানে গদ্যে লেখা যেন, একেবারে দার্শনিক বিমূর্ত গদ্যে। কিন্তু শিল্পের প্রতীক নীল গীটারের সংশ্রবে সেই গদ্যও কবিতায় আক্রান্ত হলো।

স্টীভেনসের বৃহত্তম, সম্ভবত মহত্তম, কবিতা 'Notes Towards a Supreme Fiction' তার কেন্দ্রেও এই রকম তত্ত্বভাবনা বর্তমান—সত্য এক, পরিবর্তনের মধ্যে সত্য অনুভূত হয় এবং সত্য আনন্দ ও শান্তিদায়ী। কবিজীবনের প্রথম পর্যায়ে সংলগ্নতার সূত্রগুলো উহ্য রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন এলিয়ট—কিন্তু গদ্য বলে কিছু 'Four Quartets'-এ তিনি বর্জন করেন নি। বই খুলেই পড়ছি 'Time present and time past…' ইত্যাদি বিখ্যাত গদ্যবাক্যের পরম্পরা। এই বিমূর্ত বাক্যসমবায়ে কোথায়ও চিত্রকল্প নেই, এমন কিছু নেই যা কোনো সুলিখিত দার্শনিক গদ্যে থাকতে পারতো না। একমাত্র আছে শব্দসঙ্গীত, প্রগাঢ় উচ্চারণের উপলব্ধিমন্থর সঙ্গীত;

এই সঙ্গীত অনেক সময় মহৎ গদ্যেরও সম্পদ। এ গদ্য আছে বলে কবিতার প্রেমিকপাঠক Four Quartets-কে কি কবিতার রাজ্য থেকে নির্বাসিত করে দেবেন—না কাব্যের এলাকাকেই তিনি আরো প্রসারিত করে নেবেন যাতে এই গদ্যময় তত্ত্বময় রচনাংশও কবিতার সামগ্রিক অভিপ্রায় বিচারে কবিতারাজ্যেরই নাগরিকত্ব পায়? এলিয়টের এই দীর্ঘ কবিতা চারটি কি বিচ্ছিন্ন কিছু ইমেজের জন্যেই কোনোক্রমে সহনীয়? গদ্যকে নিষ্কাশিত করে অর্থাৎ চিন্তা তত্ত্ব বর্জন করে এই দীর্ঘ কবিতা কয়টি মহৎ হতে পারতো না, দীর্ঘও হতো না।

এই তর্ক অন্য প্রসঙ্গেও সম্প্রতি উঠেছিল। কৌতূহলী পাঠক পুরো বাদপ্রতিবাদ শঙ্খ ঘোষের 'নিঃশব্দের তর্জনী' বইতে পাবেন। 'কবিতা পরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' কবিতার বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে 'প্রথম দিনের সূর্যে'-র সঙ্গে প্রতিতুলনা করে শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন 'ক্রমে দেখা যায় দুটি রচনায় মিলও যেমন, ভিন্নতাও তার চেয়ে কম নয়। এবং এই ভিন্নতা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি অকবিতার অংশগুলি কেমন নির্মমভাবে সরিয়ে দিলে ক্রমে জন্ম নিতে পারে একটি শুদ্ধ কবিতা।' উত্তরে আবু সয়ীদ আইয়ুব জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'ভগ্নাংশমাত্র বেছে নিয়ে শুচিবায়ুগ্রস্ত বিধবার মতো বলা কি সাজে—বাকিটা সকৃড়ি, ওতে গদ্যের ছোঁয়া লেগেছে?' এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে তিনি এলিয়টের পূর্বোল্লিখিত কবিতার উদাহরণ দিয়েছিলেন। শঙ্খ ঘোষ এর উত্তরে শেষ পর্যন্ত জানালেন, 'গদ্য রূপে নয়, গদ্য পরিণামে' আসলে তাঁর আপত্তি। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই, তত্ত্ব বা চিন্তা বা তাদের বাহন গদ্যে কোনো আপত্তি নেই, কবিতায় ব্যবহারের সার্থকতাই একমাত্র নিরিখ। তাহলে দীর্ঘ কবিতা হলেই তাতে তাত্ত্বিকতা গদ্যময়তা তথা অকবিতার খাদ থাকে এই প্রশ্নে দীর্ঘ কবিতার বিরুদ্ধে আপত্তি করা যায় না—দেখতে হবে কবিতার সামগ্রিক অভিপ্রায়ের দিকে নজর রেখে সাফল্যের সঙ্গে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা। আর সাফল্যই যদি মানদণ্ড হয়, তাহলে শুধু বিমূর্ত গদ্য সম্বন্ধে কেন,

কবিতার যে কোনো উপাদান, ইমেজ ছন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধেও একই প্রশ্ন ওঠে। তাহলে কবিতায় গদ্যকে আলাদা করে আক্রমণ করার কোনো কারণ থাকে না।

'এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে', এবং 'সে এখনও বেঁচে আছে কিনা তা সুদ্ধ জানি না'—এই দুই স্মৃতিভারাতুর খেদোক্তির দিগন্তের মধ্যে 'বৃষ্টির বিবিক্ত দিনে' বিশ্বজাগতিক সভ্যতার সংকটকে সুধীন্দ্রনাথ দীর্ঘ 'সংবর্ত' কবিতায় ধারণ করেছেন। এই কবিতায় এমন তত্ত্ব ও সংবাদ আছে গদ্যে যার স্বাভাবিক স্থান; কিন্তু দীর্ঘ কবিতা যেহেতু জীবনোপলব্ধি প্রকাশের গুরুতর দায়িত্বে তত্ত্বময় গদ্যকে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, তাই 'সংবর্তে'র এই সব চরণ-গুলিকে বিশুদ্ধ কবিতায় স্থান পাওয়ার অনুপযোগী বলে মনে হয় না—

> ব্যোমযান, কামান, পদাতি
> যে-রাষ্ট্রের অঙ্গ নয়; ন্যায়, ক্ষমা, মিতালি, মনীষা
> যার মুখ্য অবলম্ব, জিজীবিষা
> সামান্য লক্ষণ···

অথবা 'যযাতি' নামক দীর্ঘ কবিতার এই চরণগুলি,

> আমি বিংশ শতাব্দীর
> সমানবয়সী; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে, বীর
> নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
> বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
> নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
> যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে···।

এই ধরনের স্টেটমেণ্টগন্ধী বাক্যের স্পর্শকলুষিত স্থাপত্যধর্মী দীর্ঘ কবিতা বাদ দিয়ে সুধীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিচার সম্ভব হয় না। সুধীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিতার গঠন যদি স্থাপত্যের মতো হয়, তাহলে বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ কবিতার গঠনবিন্যাস সাঙ্গীতিক। বিদ্রূপ ও

বিশ্বাসের পাশাপাশি বিন্যাসে 'আনন্দ, আনন্দ শুধু আনন্দ নিষ্যন্দন আকাশের' নিচে 'কুৎসিত জীবনের ক্লৈব্যগামী স্বার্থপর ব্যর্থতা'র হাহাকার বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ কবিতা 'জন্মাষ্টমী'-তে রূপায়িত; তার জন্যে কিন্তু কবিতার কবিত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।

সাম্প্রতিকদের কাব্যরচনা পদ্ধতির সঙ্গে আমি একজনের প্রণালীর খানিকটা মিল দেখতে পাই। শব্দ নিয়ে খেলায় মাতোয়ারা ছিলেন ডীলান টমাস। বলা নয়, বলার ধরন 'colour of saying' ছিল তাঁর কাছে মুখ্য। তাঁর প্রথম দিককার কবিতা দুর্বোধ্য কারণ তিনি এক 'watertight compartment of words' গড়তে ব্যস্ত ছিলেন। যদি কোনো একটা তাৎপর্য বা 'main moving column' এসে যায় ভালোই, নচেৎ নাই থাকলো। হেনরি ট্রীস-কে লেখা একটা বিখ্যাত এবং বহু-উদ্ধৃত চিঠিতে তিনি তাঁর কবিতালেখার প্রণালী ব্যাখ্যা করেছেন; আমি তর্জমা করে দিচ্ছি, 'আমি একটা ইমেজ তৈরি করি—তৈরি করি না বলে বরং বলা উচিত আমার মধ্যে তৈরি হতে দিই এবং তার উপরে আমার সমস্ত মেধা ও বিচারশক্তি প্রয়োগ করি—এইভাবে আর একটা ইমেজ জন্মাতে দিই, যেটি প্রথমটির প্রতিবাদ করে; এই দুইয়ের থেকে যে তৃতীয় ইমেজ জন্মায় তাকে চতুর্থ প্রতিবাদী ইমেজ জন্মাতে দিই এবং আমার পূর্বনিরূপিত আঙ্গিকের সীমার মধ্যে তাদের সব কয়টিকে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দিই।...প্রত্যেকটি ইমেজের মধ্যে থাকে তার বিনাশের বীজ, এবং যতোদূর বুঝি, আমার প্রতিভার প্রণালী হলো, যুগপৎ সৃষ্টিশীল ও বিনাশশীল যে কেন্দ্রীয় বীজ, তার থেকে উৎপন্ন ইমেজসমূহকে ক্রমাগত গড়ে তোলা এবং ভেঙে ফেলা।' এই প্রণালীতে লেখা ডীলান টমাসের প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলিকে চরিতকার ফীট্‌জগীবন 'implosion' নাম দিয়েছেন। সম্প্রতিকালের অনেক বাংলা কবিতা সম্বন্ধেই এই নামটা খাটে।

অথচ এই কবি, যাঁর কবিতা লেখার পদ্ধতি ছিল 'from

words...not towards words', তিনি পরিণতির সঙ্গে জীবনের মৌলিক অভিজ্ঞতাসমূহের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে শেষ পর্যায়ে দীর্ঘতর কবিতা লিখতে উদ্যোগী হলেন এবং সেই দীর্ঘ কবিতাগুলিতে প্রাক্তন দুর্ভেদ্য ঘনত্বের জায়গায় এলো আন্তরিক জটিলতা সত্ত্বেও অধিকতর বাহ্য সরলতা। তিনি নিজেকে অবচেতনে আত্মসমর্পণকারী সুররিয়ালিস্ট বলে মেনে নিতে আর রাজি নন। তিনি এখন বলেন অবচেতন উৎস থেকে যা আবির্ভূত হয় তাকে ভাষা দেওয়া এবং বোধগম্য করাই কবির শিল্প। মৃত্যুর পূর্বে তিনি চারটি অংশ সংবলিত 'In Country Heaven' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনায় হাত দিয়েছিলেন, তার প্রথম তিনটি অংশ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন, শেষটি, নামকবিতাটি আর লেখা হয় নি। সেই তাঁর দীর্ঘতম এবং পরিকল্পনার সম্ভাবনায় মহত্তম কবিতাটি লেখা হলে তাঁকে হয়তো নিতান্ত মাইনরের দলে পড়ে থাকতে হতো না। তা হয় নি, কিন্তু তিনিও যে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি গুরুতর কথা বলার জন্যে দীর্ঘ কবিতা রচনার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, সেইটি লক্ষণীয়।

তারাপদ রায়ের 'জীবনানন্দ দাশ ১৯২২' কবিতা উদ্ধৃত করছি।

> স্যার, বারান্দায় একটু অপেক্ষা করুন।
> দুলাইন লিখে নিতে দিন, একটু লিখতে দিন
> আপনার উৎপাতে বড়ো ব্যতিব্যস্ত আছি।
> আট বছর আগেকার লাশকাটা ঘর থেকে রক্তমাখা ঠোঁটে
> প্রত্যেক রাত্রিতে কেন, প্রত্যেক রাত্রিতে
> কোনো পরিচয় নেই, কোনো আত্মীয়তা নেই—কেন
> আমার ঘরের মধ্যে কেন ?
> দয়া করে বারান্দায় অপেক্ষা করুন।

কিন্তু তাঁর আত্মা ঘরে না ঢুকুক বারান্দায় অপেক্ষা করতেই থাকে—যতোই তফাৎ যাও তফাৎ যাও বলে আবেদন করা যাক না কেন। কারণ গোগোলের ওভারকোট থেকে যেমন আধুনিক রুশ বাস্তববাদী

কথাসাহিত্যের জন্ম, তেমনি জীবনানন্দের লাশকাটা ঘর থেকেই সম্প্রতিকালের বাংলা কবিতার জন্ম—জীবনানন্দের স্বাচ্ছতাময় আলো-অন্ধকারে অবগাহন এখনো তার শেষ হয় নি। চেতন ও অবচেতন জগতের সীমারেখা ঘুচিয়ে দিয়ে তিনি কবিতায় পরাবাস্তবের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন—'দুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মতো' তিনি প্রবেশ করেছেন সেই অচেনা জগতে। তাঁর কবিতায় আপাত অসংলগ্ন প্রত্নস্মৃতি উঠে এসে মুগ্ধ করে দিয়েছে নবীনদের, যাঁরা উদ্‌ভ্রান্ত মোহে অবচেতনে নিরঙ্কুশ আস্থা রাখাই যথেষ্ট বলে মনে করেছেন। অবচেতনে-নির্ভরশীল পরাবাস্তবের সন্ধান আজ এতো সর্বব্যাপী বলেই যুক্তিকে, চিন্তা ও তত্ত্বকে আজ এতোটা অবিশ্বাস, এবং অবচেতনও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতক বলে, সাম্প্রতিক কবিতার এমন ক্রমহ্রস্বমান আয়তন। অথচ 'আট বছর আগের একদিন' মোটামুটি একটা দীর্ঘ কবিতা, এবং প্রত্নস্মৃতি থেকে উঠে আসা উট, গলিত স্থবির ব্যাং, থুরথুরে অন্ধ পেঁচা, বুড়ি চাঁদ, থ্যাতা ইঁদুর, এই সব কুশীলবের উপস্থিতি সত্ত্বেও, এই কবিতা অবচেতনায় নির্ভরশীল কোনো উন্মার্গগামী উৎকেন্দ্রিকতা নয়—তার মধ্যে ভাবকল্পনার ঐক্য, বক্তব্যের সুস্পষ্ট পরম্পরা বর্তমান। পেঁচা ব্যাং মশা মাছি ফড়িং যে পাশব উৎসাহে জীবিত, সেই সব জীবনধারণের জৈবিক উপকরণ থাকা সত্ত্বেও কবিতার নায়ক আত্মহত্যা করেছিল, কারণ 'নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ নয় সবখানি',

> আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
> আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
> খেলা করে···।

রক্তের ভিতরে সেই বিপন্ন বিস্ময়ের সঙ্গে কবিও পরিচিত, তিনি সেই আত্মঘাতী মানুষটির মতো আত্মহনন করতে পারেন নি। থুরথুরে পেঁচার মতো তিনিও বুড়ো হবেন এবং যথারীতি 'আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার'-এর মধ্যে যেন কবির

নিজের প্রতি বিষণ্ণ আত্মবিদ্রূপ পাচ্ছি। যে-লাশকাটা ঘরে ক্লান্তি নেই যেখানে টেবিলে চিৎ হয়ে শোয়া লোকটিকে কবি যেন ঈর্ষাও করছেন।

জীবনানন্দ নিজে আরো অনেক দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন—'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা' গ্রন্থে সেগুলোর বেশির ভাগ সংকলিত হয়েছে, এবং দীর্ঘ কবিতা লিখতে গেলে যা হয়, আকাট গদ্যকেও তত্ত্বকথাকেও তিনি কবিতার সামগ্রিক উদ্দেশ্যে কবিতার অন্তর্গত করতে অপ্রস্তুত বোধ করেন নি। দু-একটা অস্ফুট ইশারা অগ্রাহ্য করলে 'বোধ' কবিতার প্রথম স্তবকে কোনো ইমেজ বা উপমা পাই না, পুরো স্তবকটাই স্টেটমেণ্টে ভরা—

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়,—কোন্ এক বোধ কাজ করে!
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে,
সব কাজ তুচ্ছ হয়—পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়!

অর্থাৎ পরাবাস্তবের আলো-অন্ধকারে প্রবেশের সময়েও তিনি অনুকারী তরুণদের মতো যুক্তি বা বোধকে অনাবশ্যক বিবেচনায় বিসর্জন দিতে রাজি ছিলেন না।

যে নব্যপন্থীরা বাধা ও বোঝা বিবেচনায় সে বালাই বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের কাব্যচেষ্টাকে জীবনানন্দ বড় জোর প্রথম স্তরের কবিতা বলতেন। সেই কবিতাকে তিনি বেশি মূল্যবান মনে করতে পারেন নি—'যে কোনো সৎ কবিতাই স্বভাব কবিতা, কিন্তু যেখানে

কবির অভিজ্ঞতা কম, দু-চারটের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতার ভার বহন করবার শক্তি নেই কিংবা দু-চারটে অভিজ্ঞতাকে দেশকালের ভিতর তলিয়ে অল্প-বেশি স্পষ্টতায় দেখবার ক্ষমতা নেই—সেখানে স্বভাব-কবিতা তার প্রথম স্তরে…' (কবিতার আলোচনা)। সমসাময়িককালের কবিদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য সত্ত্বেও স্বকীয় কাল সম্বন্ধে জীবনানন্দের সংশয় ঘোচে নি। নিজের কাল সম্বন্ধে সংশয়গ্রস্ত হয়ে তিনি আশা করেছিলেন পরবর্তী দশ-পনেরো বছরে কবিরা দীর্ঘ কবিতা কাব্যনাট্য লেখার দিকে নজর দেবেন। তাঁর সেই প্রত্যাশা পূরণ হয় নি; আর জীবনানন্দের কাল যদি ভবিষ্যৎ ভাবনায় ভাবিত হয়, তাহলে সাম্প্রতিক কালের কী দশা হবে! অবশ্য দশক দিয়ে যে সময়ের কবিরা চিহ্নিত হন, এক দশকের বেশি আয়ুষ্কাল কামনাও করেন না, তাঁরা হয়তো মহাকালের কাছে দীর্ঘায়ুর দাবি উপস্থিত করতেও উৎসুক নন, আর তাই দাবি জোরালো করার জন্য নথিপত্র প্রস্তুতেও নারাজ। বলা হবে, বাতাসে যখন তেজস্ক্রিয় ভস্ম সামূহিক বিনাশের বার্তা নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে তখন দূরতর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কী হবে। তেজস্ক্রিয় ভস্ম চিরকাল ছিলো না, মৃত্যু কিন্তু চিরকালই আছে—উপায়ের রূপান্তর হয়, পরিণাম একই থাকে। 'বীজাণু, সরল ক্ষুর, হাঁটুজল, এক কৌটা বিষ/এবং প্রভাবে তার নেই কোনো বিশ কি উনিশ' (বুদ্ধদেব বসু)। সুতরাং ক্রান্তদর্শী কবি এই অজুহাতে তাঁর দুরূহ দায়িত্ব পালন করবেন না কেন? 'কেবলই খণ্ড কবিতার সিদ্ধি নিয়ে' তুষ্ট থাকা তাঁর মানায় না।

'একলব্যের সম্পর্ক'

কবিতার অনুবাদ

নিজের তর্জমা কবিতার সংকলনের নাম যখন সুধীন্দ্রনাথ 'প্রতিধ্বনি' দিয়েছিলেন তখন 'কণিকা'র সেই লাইন নিশ্চয় তাঁর মনে ছিল— 'ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে'। বাস্তবিক কবিতার অনুবাদ হয় কিনা এ বিষয়ে তো অনেকের বদ্ধমূল সন্দেহ। কবিতার তর্জমা কী— না, 'a perpetual attempt to square the circle'। কবিতার অনেক সংজ্ঞা আছে ; তার মধ্যে একটা, যা অনুবাদ করা যায় না তাই কবিতা। অনুবাদের মধ্য দিয়ে অর্থটুকু স্থানান্তরিত হলেও যা সত্তাসার তা মূল কবিতার মধ্যে অবিচলিতভাবে জ্বলতে থাকে। সুধীন্দ্রনাথ নিজে 'প্রতিধ্বনি'র ভূমিকায় বলেছেন : 'কাব্য যেহেতু উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত, তাই আমি এও মানতে বাধ্য যে তার রূপান্তর অসম্ভব।' দেখা যাচ্ছে অনেক নবীনেরও এই রকম মত। 'অন্যদেশের কবিতা'-র ভূমিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : 'এই বইতে যাঁরা বিশুদ্ধ কবিতার রস খুঁজতে যাবেন, তাঁদের নিরাশ হবার সম্ভাবনাই খুব বেশি। এই বইতে কবিতা নেই, আছে অনুবাদ কবিতা। অনুবাদ কবিতা একটা আলাদা জাত, ভুল প্রত্যাশা নিয়ে এর সম্মুখীন হওয়া বিপজ্জনক।...আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, অনুবাদ কবিতার পক্ষে বিশুদ্ধ কবিতা হওয়া সম্ভব নয়, কখনো হয় নি।' এসব নতুন কথা নয়। ভায়োলেট ফুলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ক'রে যাঁরা তার বর্ণগন্ধের কারণ আবিষ্কার করতে চান তাঁরা যতটা অবিজ্ঞ, যাঁরা কবির সৃষ্টিকে ভাষান্তরিত করতে চান তাঁরাও ততোটাই অবিজ্ঞ—শেলিও এই কথা বলেছিলেন।

রবার্ট ফ্রস্ট ঠিকই বলেছেন, কবিতা সবচেয়ে গোঁড়া জাতীয়তাবাদী শিল্প, কারণ স্বভাষার সীমান্ত অতিক্রমে তার বড়ই অনিচ্ছা। আমরা যাকে জল বলি, হিন্দীতে তাই পানি, ইংরেজিতে ওয়াটার, ফরাসিতে ও। অর্থ এক, ধ্বনি কিন্তু আলাদা। তাছাড়া সমার্থক শব্দ স্বতন্ত্র চিত্রের দ্যোতনাও জাগায়। অথচ কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের তিনটে গুণই অত্যাজ্য, কবিতা এই তিন গুণেরই এক 'total complex'। তাই বিদেশী ভাষার সমার্থক শব্দ বসিয়ে মূল কবিতার স্বাদ সঞ্চারিত করা যায় না। দুই ভাষার দুটো সমার্থক শব্দ কিছুতেই পুরোপুরি সমকক্ষ নয়। ব্যুৎপত্তিগত কারণে, ঐতিহাসিক অনুষঙ্গের ফলে, বাক্যগঠন প্রণালীর জন্যে তাদের মধ্যে আলাদা ইশারা এসে যায়। তাই সমার্থক শব্দ দুই ভাষায় জাগায় দুই রকম আবেগের প্রেরণা। একটা উদাহরণ দিই 'Hollow Men' কবিতার এপিগ্রাফ্ থেকে। বিষ্ণু দে 'ফাঁপা মানুষ' কবিতায় 'Penny for old Guy'-এর তর্জমা করেছেন 'বুড়ো মোড়লকে কানাকড়ি'। এই নিরুপায় তর্জমায় ইতিহাসের গাই ফক্সের অনুষঙ্গ উঠে গেছে একেবারে। একই সমস্যায় বিব্রত স্যাঁ ঝ্ঁ পার্স ফরাসি তর্জমায় এপিগ্রাফ্‌টিকে একেবারে রূপান্তরিত করে নিয়েছেন—'Aumóne aux hommes de peude poids'।

তাই অনুবাদকে বলে এমব্রয়ডারির উল্টো পিঠ। ইতালীয় প্রবাদে অনুবাদককে বলা হয়েছে বিশ্বাসঘাতক। সাহিত্যের এই দুয়োরানীর সেবা যাঁরা করেন তাঁদের কপালে এইরকম নিন্দামন্দ কম জোটে নি। পোপ নিজে অনুবাদক হিসাবে বিখ্যাত, অথচ তিনিই তর্জমাকারীদের বলেছেন 'saddest pack of rogues in the world'। কেউ বলেছেন অনুবাদ হল আইনসংগত সাহিত্যিক চুরি। ওমর খৈয়ামের নতুন অনুবাদ ক'রে সম্প্রতি যিনি অপযশ কুড়িয়েছেন সেই রবার্ট গ্রেভসের মতে অনুবাদ একটা 'polite lie'। 'On Translating Eugene Onegin' কবিতায় নবোকফ্ সাধারণ তর্জমাকারীদের তীব্রভাবে বিদ্রূপ করেছেন।

What is translation ? On a platter
A poet's pale and glaring head,
A parrot's screech, a monkey's chatter,
And profanation of the dead.

এবং এই অনুবাদের পরিণাম—'Dove-droppings on your monument'।

এত ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করেও কিন্তু অনুবাদকেরা স্বকার্য থেকে বিরত হন নি। যাঁরা কবি হিসাবে সফল হয়েছেন তাঁরাও অন্যের রচনা তর্জমার ধন্যবাদহীন কাজে আজও বারবার হাত দিচ্ছেন। আসলে অনুবাদ না ক'রে আমাদের উপায় নেই। তাই যে-দান্তে 'কনভিভিও'-তে বলেছিলেন তর্জমা ব্যাপারকে তিনি ঘেন্না করেন, তিনি নিজেও অনেক অনুবাদ ক'রে গেছেন। আর অনুবাদের সেতুবন্ধ বিনা আমরা কজন দান্তের জগতে পদার্পণ করতে পারতাম ! কজন শিক্ষিত মানুষ তুই-তিনটির বেশি ভাষা জানেন ? বিশ্বের বিচিত্র ভাষায় বদ্ধ মনীষাকল্পনার শ্রেষ্ঠ ফসলগুলো সর্বসাধারণের আস্বাদের অতীত থেকে যেত যদি মাঝখানে অনুবাদক না থাকতেন। এই কারণে 'all translation is a crutch for human incompetence' বলে যতোই ঠাট্টা করা যাক, এই ক্রাচ্ না থাকলে ভাষার ব্যাপারে পঙ্গুদের পক্ষে ভাষাসীমার গিরিলঙ্ঘন কোনোদিন সম্ভব হতো না। তাই অনুবাদ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আপত্তি ব্যবহারিক কারণে অগ্রাহ্য না ক'রে উপায় নেই। যাঁরা বলে থাকেন অনুবাদ রচনা ও পাঠ সময়ের অপব্যয় মাত্র, 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'শেকসপীয়র ও কীটস অনুবাদে ভিন্ন গ্রীক বা লাটিন সাহিত্য জানেন নি, এবং ভারতীয় মানসে যে-তুটি গ্রন্থ সব চেয়ে প্রতিপত্তিশালী, সেই মহাভারত ও রামায়ণ সর্বভারতে বহু শতক ধরে অনুবাদে বা অনুলিখনে প্রচারিত হচ্ছে।' কাঙালকান্তি বিষয়ে লিখতে গিয়ে পাউণ্ড বলেছেন অনুবাদক

হবেন পথপ্রদর্শক—দেখাবেন কোন্ ভাষা শেখা উচিত, কোথায় আছে ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার।

কবিতার জন্ম ভাষার গূঢ়তম সত্তা থেকে ; তাই এক ভাষার কবিতা যখন পুরোপুরি অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যায় না, তখন আমরা দুই ভাষার স্বভাবে কোথায় দূরত্ব তা ভালোভাবে বুঝি। এইরকম নেতিবাচকভাবে অন্য ভাষার স্বভাব, অন্য ভাষার কবিতার স্বভাব আমাদের আয়ত্ত হয়। সালংকারা সংস্কৃত ভাষার মূলানুগ ইংরেজি অনুবাদকে ইংরেজি ভাষা বলে চেনাই কঠিন—ইংগলস্-কৃত বিদ্যাকরের 'সুভাষিতরত্নকোষ'-এর চমৎকার অনুবাদের ব্যতিক্রম সত্ত্বেও একথা সত্যি। অনুবাদচর্চার ফলে নিজের ভাষাকেও আরো ভালোভাবে জানি। অন্য ভাষার কবিতার চিত্রকল্প সংগীত আবেগ অনুষঙ্গ নিজের ভাষায় সঞ্চার করতে গেলেই বোঝা যায় কোথায় নিজের ভাষার দৈন্য, কোথায় বা ঐশ্বর্য। অনুবাদ তাছাড়া এক ধরনের সমালোচনাও। স্টিনার ঠিকই বলেছেন, হ্যেল্ডার্লিনের সোফোক্লেস, ভালেরি-কৃত ভার্জিলের একোলোগের তর্জমা, লোয়েলের হাইনে-অনুবাদ মহত্তম অর্থে সমালোচনা। কবিতার সমস্ত অনুবাদই এক অর্থে ব্যাখ্যা ; প্রিয় কবির একটি প্রিয় কবিতাকে তর্জমাকারী কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন তার পরিচয় থেকে যায় ভাষান্তরিত কবিতাটিতে।

সময়ে-সময়ে কবির হাতে যখন মৌলিক রচনা কোনো কারণে জন্মাতে চায় না তখন কবি তর্জমার মধ্য দিয়ে চর্চা বজায় রাখেন, আর মনে-মনে অতন্দ্রভাবে অপেক্ষা করেন সেই অনবদ্য মুহূর্তটির জন্য যখন কর্ষিত জমিতে নিজের কবিতার বীজটি উড়ে এসে পড়বে। তাই 'কবির পক্ষে এই কর্ম তাঁর পরম স্বার্থের সংলগ্ন ; শিক্ষা, সংযম, আত্মশোধনের জন্য উৎকৃষ্ট একটি উপায়।' এই উপার্জন তিনি সুদে খাটাতে পারেন পরবর্তী স্বকীয় রচনায়। অনুবাদের মধ্যে এমনভাবে এসে যায় অনুবাদকের আত্মপরিচয়। তর্জমার জন্য তিনি যে কবির কবিতাকে নির্বাচন করেন তার সঙ্গে কোথায়ও খুঁজে পান স্বভাবগত

মিল, 'নিজেরই একটি সম্ভাবনার উন্মীলন' ; আর স্বভাবের এই সাদৃশ্যই আকৃষ্ট করে অনুবাদের কাজে। এই জন্যই বিষ্ণু দে এলিয়টের তর্জমা করেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র হুইটম্যানের, বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ারের। রেনাটো পোগ্‌গিওলি তাই সুন্দরভাবে বলেছেন কবির মতো অনুবাদকও নার্সিসাস ; কবি প্রকৃতির আয়নায় নিজেকে দেখেন, আর অনুবাদক নিজেকে দেখেন অন্যের রচিত শিল্পের দর্পণে। আর অনুবাদের মধ্য দিয়েই এক ভাষার সাহিত্যের প্রভাব অন্য ভাষায় সহজে সঞ্চারিত হয়।

এইসব নানান কারণে অনুবাদ। অধিকাংশ অনুবাদ যে পরিত্যাজ্য জঞ্জাল এতেও সন্দেহ নেই। তবু এমন সার্থকতার শিখর মাঝে-মাঝে অর্জিত হয়, কবিতার অনুবাদে যারা তাত্ত্বিকভাবে অবিশ্বাসী, তাঁরাও তখন হার মানতে বাধ্য হন। ভালেরি মনে করতেন খাঁটি কবির কবিতা তর্জমা করা যায় না। কিন্তু ফাদার সাইপ্রিয়াঁ-কৃত St. John of the Cross-এর অনুবাদের তিনি ভূয়সী প্রশংসা না ক'রে পারেন নি। এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে বলেছিলেন, মৌলিক রচনার সাফল্যের চেয়ে এই সার্থকতা মহত্তর এবং আরো দুর্লভ, কারণ মূল লেখক নিজের মাধ্যম নির্বাচনে যে স্বাধীনতা ভোগ করেন সেই স্বাধীনতা অনুবাদকের নেই।

কিন্তু কবিতার অনুবাদের মূল নীতি কী হবে ? এ বিষয়ে নানান্ মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত। হওয়াও স্বাভাবিক, কারণ কবিদের মতো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এমন তীব্র আর কার ! যে উভয়সংকট অনুবাদকের পেশাগত বিপত্তি সেই উভয়সংকট একটা মজাদার ফরাসি সুভাষিতে চমৎকার ফুটেছে—সুন্দরী কদাচ সতী হয়, সতী কদাচ সুন্দরী হয়। স্বতন্ত্র কবিতা হিসাবে সুন্দর হয়ে ওঠা, না মূলের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য—এই হল অনুবাদকের সমস্যা। পোগ্‌গিওলি অবশ্য এই সংকটের অস্তিত্ব মানতে রাজি নন। তাঁর মতে—'in every artistic pursuit beauty is the highest kind of fidelity, and

ugliness is only another name for disloyalty.' (The Added Artificer)। তিনি বলেন সত্যিকারের অনুবাদে খাঁটি সোনা খাঁটি সোনাতেই রূপান্তরিত হয়। যে অনুবাদ চরম উৎকর্ষের উদাহরণ তার সম্বন্ধে পোগ্‌গিওলির কথা সত্যি—সততা ও সৌন্দর্যের দ্বন্দ্ব তার মধ্যে শমতা লাভ করেছে বলেই সেই অনুবাদ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অনুবাদককে যে এই সংকটবন্ধুর পথে চলতে হয়, তাকে যে সংশয়ে ভুলতে হয় এতে সন্দেহ নেই।

অনুবাদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতির সমর্থক নবোকফ্‌ সাহেব এবং কবি লোয়েল। নবোকফ্‌ তাঁর পথকে বলেছেন দাসত্বের পথ, 'the servile path'। পুশকিনের 'ইউজিন ওনেগিনে'র স্বকৃত অনুবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'total accuracy and completeness of meaning'-এর প্রয়োজনে তিনি রূপকল্পগত সমস্ত উপকরণ উপেক্ষা করেছেন। এই সূত্র অনুযায়ী এই অনুবাদ সম্বন্ধে পূর্বে উল্লিখিত কবিতায় নবোকফ্‌ বলেছেন—'honest roadside prose/All thorn, but cousin to your rose.'। এই কণ্টক-কঠিন গদ্যময় অনুবাদে মূলের সুষমা নেই বটে, কিন্তু এই কাঁটা সেই গোলাপেরই আত্মীয়। অনেক আগে ড্রাইডেন তিন রকমের অনুবাদের কথা বলেছিলেন—metaphrase আক্ষরিক অনুবাদ; paraphrase-এ আনুগত্য অক্ষরের প্রতি নয় অর্থের প্রতি এবং সেই অর্থ 'may be amplified, but not altered'; আর তৃতীয়ত imitation, যা ড্রাইডেনের মতে মৃতের স্মৃতি ও খ্যাতির প্রতি অবিচারবিশেষ। ইউজিন ওনেগিনের অনুবাদের ভূমিকায় ড্রাইডেনের ধরনে নবোকফ্‌ও তিনরকম তর্জমার কথা বলেছেন। প্রথম paraphrastic বা ভাবানুবাদ, এই ধরনের অনুবাদে মূলের কিছু হারায়, মূলের সঙ্গে যোগ হয় কিছু; নবোকফ্‌ এইরকম আটি অনুবাদের বর্ণনা দিয়েছেন: 'carefully rhymed, pleasantly modulated versions containing, say, eighteen percent

sense, plus thirtytwo of nonsense and fifty of neutral padding…' (Encounter, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬)। দ্বিতীয় ধরন lexical বা আভিধানিক—এতে মূলের প্রাথমিক অর্থ ও বিন্যাস দেওয়া হয়। নবোকফের নিজের পছন্দ তৃতীয় ধরনের অনুবাদ, যাকে বলেছেন literal বা আক্ষরিক। অনুবাদের ভাষার প্রকৃতি ও বাক্যগঠনপ্রণালী বজায় রেখে মূলের প্রতি, মূলের সঠিক প্রাসঙ্গিক অর্থের প্রতি যত বেশি আনুগত্য রক্ষা করা যায় সেইদিকেই নবোকফের চেষ্টা। এডমাণ্ড উইলসন নবোকফের এই পদ্ধতিকে আক্রমণ করলে নবোকফ্ এই বলে ক্ষোভ করেছিলেন, যারা 'textual precision'-এর বালাই বিসর্জন দেয় তারা হাততালি-সহযোগে সংবর্ধনা পায়, আর যে বেচারা মূলের প্রতি আবেগতপ্ত নিষ্ঠাবশত সৌন্দর্যের দিকে নজর না দিয়ে সংগততম শব্দটি হাতড়ে বেড়ায় সমালোচকেরা তাদের ডালকুত্তার মতো তাড়া ক'রে ফেরে। নবোকফ্ স্পষ্টই জানিয়েছেন সুখপাঠ্যতা নয়, আক্ষরিকতাই তাঁর অভীষ্ট। কার্লাইল বেঁচে থাকলে নির্ঘাৎ নবোকফের পিঠ চাপড়াতেন, কারণ এই মধ্যভিক্টোরীয় মানুষটি বলেছিলেন—'Tell us what they thought, none of your silly poetry.'। ব্রেশ্টের মতেও কবির চিন্তা বা ভাবনাটুকু মাত্রই অনুবাদ করা উচিত। মূলের ছন্দ যতক্ষণ কবির ভাবনার অংশ, বড় জোর সেই ছন্দকে ভাষান্তরে বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু তার বেশি নয়।

অর্থের প্রতি এই দাসত্বের উল্টো মেরুতে আছেন যাঁদের প্রার্থনা স্বাধিকার। এঁদের মুক্ত অনুবাদকে বলা হয়েছে ইমিটেশন। এই ইমিটেশনের দলে পড়ে ফিটজেরাল্ডের ওমর খৈয়াম, পাউণ্ডের সেক্সটাস প্রোপারটিয়াস, রবার্ট লোয়েল-কৃত অনেক রূপান্তর। এইসব রচনাকে হয়তো অনুবাদ না বলাই সংগত। বরং এইসব কবিতাকে অন্যের কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত মৌলিক কবিতা বলে বিচার করলে দুপক্ষের প্রতি সুবিচার করা হয়। বাংলায় এইরকম ইমিটেশনের

চমৎকার উদাহরণ জীবনানন্দের 'সমারূঢ়'—ইয়েটসের 'The Scholar' কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত।

এই দুই বিরুদ্ধ মেরু এড়িয়ে বরং সুবর্ণমধ্যমকে গ্রহণ করাই ভালো এবং কবিতার অধিকাংশ সার্থক অনুবাদক কার্যত তাই করেছেন। এই মধ্যপন্থী কয়েকজনের অভিজ্ঞতার কথা বলি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু চারটি সূত্রের কথা বলেছিলেন। তাঁর কথা: 'যে ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে সে তার নিজের আইন-কানুন জারি করে: যিনি অনুবাদ করছেন তাঁরও স্বকীয়তার সংগ্রাম অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।...আসলে, আনুগত্য বা আক্ষরিকতার দাবিটাই অর্থহীন...'আক্ষরিক অনুবাদ' কথাটাই সোনার পাথরবাটির নামান্তর।...অনুবাদের উচ্চতম লক্ষ্য হতে পারে—১. মূলের ভাব, বক্তব্য ও সংবাদের পরিবেশন, ২. চিত্রকল্প, ভাষার ভঙ্গি, ছন্দ, মিল ও স্তবকের বিন্যাস অর্থাৎ সমগ্র রূপকল্পের অনুসরণ, ৩. মূল কবির দেশ ও কালের স্বাদ সঞ্চার, এবং ৪. অনুবাদের ভাষায় একটি সুন্দর—অন্তত সুখপাঠ্য—নতুন কবিতার রচনা।' জ্যাকসন ম্যাথুজ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ঐ রকম কথাই বলেছেন, অনুবাদ মূলের প্রতি বিশ্বস্ত হবে, 'it will "approximate the form" (কথাটা ভালেরি-র) of the original', এবং তা স্বকীয় প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত হবে। মূলানুগ সেই অনুবাদের মধ্যে শোনা যাবে অনুবাদকের কণ্ঠস্বর।

আসলে কবিতার অনুবাদ ব্যাপারে চার পক্ষের বোঝাপড়া থাকে। মূল কবিতার ভাষার স্বভাব, অনুবাদের ভাষার ধর্ম, কবির ব্যক্তিত্ব এবং অনুবাদকের ব্যক্তিত্ব—এই চার পক্ষ। মূলের প্রতি আনুগত্য ('to give the author entire and unmaimed',) স্বাবলম্বী কবিতা হয়ে ওঠা ('the translation of a poem should be a poem')—এই দুই লক্ষ্য, এই দুই দাবির মধ্যেও বোঝাপড়া হয় অনুবাদে। এই বোঝাপড়ার ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় তারও সাক্ষী

বুদ্ধদেব বসু। তিনি বোদলেয়ারের কবিতা তর্জমার অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন: 'বিশেষ্য কোথাও রূপান্তরিত হয়েছে বিশেষণে, এবং বিশেষণ বিশেষ্যে, প্রতিটি স্তবকের সত্তা অব্যাহত থাকলেও পঙ্‌ক্তিগুলির পারম্পর্যে বদল ঘটেছে। এর কারণ, বলা বাহুল্য, বাংলাভাষার প্রকৃতি, বাংলা ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য ও ছন্দ-মিলের অনুশাসন।... আমার বিশ্বাস, এই অনুবাদগুলি বোদলেয়ারের ভাষা ও অভিপ্রায় থেকে কোথাও ভ্রষ্ট হয় নি, এবং উপমায় চিত্রকল্পে ও প্রতিটি কবিতার রূপকল্পে এরা বিমুগ্ধভাবে মূলের অনুগামী। তাছাড়া বাংলাভাষার কবিতা হিশেবে এদের পাঠযোগ্য করে তোলার জন্য আমি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি।' বাস্তবিকই

> প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে,
> যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার—
> অমৃতের দিব্যপ্রতিমারে,
> অমৃতেরে করি নমস্কার।

বিশেষ ক'রে এইসব অংশে বুদ্ধদেব বসু কবিতার অনুবাদের সমস্ত শর্তকেই তর্কাতীত সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে পেরেছেন।

রিচমণ্ড ল্যাটিমোরের ধারণা, অনুবাদ কবিতা একটা নতুন কবিতা —মূল ভাষার কবিতাটি যদি আদিতে অনুবাদের ভাষায় লেখা হতো তাহলে যা দাঁড়াত তাকে রচনা করাই হচ্ছে কবিতার অনুবাদকের আদর্শ। যা চাই তা একটি নতুন কবিতা, মূল কবিতাটির সমতুল্য অভিজ্ঞতা যার মধ্যে সাকার হয়েছে। একেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'প্রতিরূপ না হয়ে অনুরূপ' হওয়া। কবিতার অনুবাদককে যতদূর সম্ভব মূলের অনুগত হতে হবে, যত বেশি স্তরে সম্ভব তত বেশি স্তরে। ঠিক কথা, কিন্তু শুধু মূলের ভাব ও ভঙ্গির বিশ্বস্ত আনুগত্য, এমন কি স্বয়ংসম্পূর্ণ সৃষ্টি হওয়াও যথেষ্ট নয়। মূল কবিতায় যে শিল্পমূল্য তাও অনুবাদের থাকা চাই, তবেই আমরা পেয়ে যাব একটি মহৎ অনুবাদ। মূল রচনা যদি ভাবী তর্জমাকারীর মনে আত্মিক

অনুকম্পা না জাগায় তাহলে শ্রেষ্ঠ তর্জমা সম্ভব হয় না। এইসব কারণে মৌলিক স্রষ্টার চেয়ে খাঁটি অনুবাদক কম বিরল নন।

আধুনিক বাঙালি কবিদের অনেকেই তর্জমার মধ্যে আত্মপ্রকাশের একটি পথ খুঁজে পেয়েছেন—ফলে এই ধাবা অব্যাহতভাবে নাব্য রয়েছে, অনর্গল রয়েছে। অনুবাদের সমস্যাগুলো তাঁদের তর্জমায় কার্যত তাঁরা কীভাবে সমাধান করার চেষ্টা করেছেন তা কৌতূহলপ্রদ আলোচনার বিষয় হতে পারে। শুধু অনুবাদ-কবিতা নিয়েই বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রত্যেকে একটি ক'রে সংকলন প্রকাশ করেছেন। অনুবাদক হিসাবে সুধীন্দ্রনাথের খ্যাতি বেশি, কিন্তু কবিতার অনুবাদক হিসাবে সুধীন্দ্রনাথের তুলনায় বিষ্ণু দে যে অনেক বেশি মূলানুগ, মূলের সঙ্গে তর্জমা মিলিয়ে পড়লে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শেক্সপিয়রের অনেকগুলো সনেটের তর্জমা দুজনেই করেছেন, তারই একটি 'Shall I compare thee to a summer's day ?' থেকে প্রথম উদাহরণ দিচ্ছি। প্রথমে সুধীন্দ্রনাথের তর্জমা—

> বসন্তদিনের সনে করিব কি তোমার তুলনা ?
> তুমি আরও কমনীয়, আরও স্নিগ্ধ, নম্র, সুকুমার :
> কালবৈশাখীতে টুটে মাধবের বিকচ কল্পনা,
> ঋতুরাজ ক্ষীণপ্রাণ, অপ্রতিষ্ঠ যৌবরাজ্য তার ,
> আলোকের বিলোচন কখনও বা জ্বলে রুদ্রতাপে,
> কখনও সন্নত বাষ্পে হিরণ্ময় অতিশয় ম্লান ,
> প্রাকৃত বিকারে কিংবা নিয়তির গূঢ় অভিশাপে,
> অসংবৃত অধঃপাতে সুন্দরের অমোঘ প্রস্থান।

তার পাশে বিষ্ণু দে-র তর্জমা—

> তোমার উপমা আমি দেব নাকি বসন্তের দিনে ?
> তুমি আরো রমণীয়, শীতে-উষ্ণে আরো যে সুষম।

দ্বিতীয় স্তবকের ছয় চরণ সাত চরণে বিস্তৃত হয়ে পুষিয়ে দিয়েছে। বিষ্ণু দে অবশ্য স্তবকবিভাগ স্পষ্ট ক'রে দেখান নি।

দেহ দুঃখময় হায়। সব শাস্ত্র করেছি নিঃশেষ।

—সুধীন্দ্রনাথ

শরীর বিষণ্ণ হায়। গ্রন্থপাঠ করেছি নিঃশেষ।

—বিষ্ণু দে

দুই রূপের মধ্যে ব্যবধান বিশ কি উনিশের। কিন্তু মূল, আক্ষরিক গদ্যতর্জমা ও অভিধান মিলিয়ে পড়লে দেখা যায় কীভাবে সুধীন্দ্রনাথ আদর্শ থেকে সরে এসেছেন। 'reflétés par les yeux'— সুধীন্দ্রনাথ মূল থেকে সরে এসে অনুবাদ করেন 'চোখের দুলাল'; এবং এই অনুষঙ্গ এখানে প্রাসঙ্গিকও নয়। বিষ্ণু দে কিন্তু মূলের প্রতি অনুগত—'নয়ন বিম্বিত'। তেমনি 'exotique nature'-এর তর্জমায় যেখানে সুধীন্দ্রনাথ অবান্তর অনুষঙ্গ আমদানি করেন 'পরকীয়া প্রকৃতি', সেখানেও বিষ্ণু দে মূলের সান্নিধ্য বজায় রেখে লেখেন 'নিসর্গ অদ্ভুত'।

O nuits ! ni la clarté déserte de ma lampe
Sur le vide papier que la blancheur défend
Et ni la jeune femme allaitant son enfant.

এই তিন চরণের তর্জমা যখন সুধীন্দ্রনাথ দুই চরণের মাপে বে-আইনি-ভাবে বেঁধে ফেলেন—

হে শর্বরী, রিক্ত কাগজের শুক্ল স্বগত সংযম
বিবিক্ত প্রদীপে, তথা স্তন্যদায়ী যুবতী তেমনই।

তখন ঠাসবুনোন শব্দকতিপয়ের চাপে ভাব পিষ্ট হয়ে যায়। বিষ্ণু দে কিন্তু শুধু যে চরণসংখ্যা অপরিবর্তিত রেখেছেন তাই নয়, ভাবমূর্তিও এখানে অক্ষুণ্ণ।

কত রাত! প্রদীপের পরিত্যক্ত আলো যাক জ্বলে
শূন্য শুভ্রতায় বৃথা সুরক্ষিত বিন্যস্ত খাতায়,
নবশিশু পয়োধরে তরুণী ও ভাষাও বৃথায়।

তবে বিষ্ণু দে যখন 'তরুণী ও ভার্যা' লেখেন তখন 'তরুণী ভার্যা' যে একজনই তা বুঝতে সময় লাগে।

কবিতাটির শেষ চার চরণ সুধীন্দ্রনাথের তর্জমায় একটি বাড়তি চরণ জুড়ে বসেছে।

> এবং ঝড়কে ডাকে জাতিস্মর ওই যে মাস্তুল,
> হাওয়ার দমক ওকে হয়তো বা নোয়াবে আবার
> সে অগাধে, যার কোলে বানচাল নৌকার কাতার,
> মাস্তুল ঘুচিয়ে আসে, ভোলে কামদ্বীপের প্রশ্রয়···
> কিন্তু নাবিকের গান কী মধুর সেখানে হৃদয়।

'জাতিস্মর' শব্দের আভাস মূলে ছিল না, কিন্তু 'fertiles ilots' বা উর্বর দ্বীপের জায়গায় 'কামদ্বীপ' ব্যবহারে অতিরিক্ত ইঙ্গিত আসে বটে, কিন্তু তা দোষের হয় নি। বিষ্ণু দে এখানে বিশেষণবর্জিত 'চর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যদিও তিনি মূলের ভাব ও চরণবিন্যাস বজায় রেখেছেন, তবু তিনিও 'মৈনাক-মন্থন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার বালাই মূলে নেই। বিষ্ণু দে-র চরণ চারটি এই,

> এবং মাস্তুল ঐ ঝঞ্ঝাকে যে ডাকে আমন্ত্রণে
> জাহাজডুবিতে বুঝি বাতাসের মৈনাকমন্থনে
> নিরুদ্দেশ—মাস্তুল নেইকো, নেই চরের সন্ধান···
> তবুও আমার মন, শোনো ঐ মাল্লাদের গান।

'প্রতিধ্বনি'-র ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'চিত্রকল্পের বেলাতেও মাছি-মারা কেরানী রসাভাস ঘটায়···যেমন অনূদিত বাইবেলের আক্ষরিক রীতি অনাবশ্যক, তেমনি অনাবশ্যক খ্রীসমাসের পরিবর্তে জন্মাষ্টমীর ব্যবহার; এবং তারপরে এমন একটা সাধারণ নিয়ম হয়তো গ্রাহ্য যে ভাবচ্ছবির তারতম্যেও অভিপ্রায় যেখানে বদলায় না, সেখানেই পরিচিত বা সার্বভৌম প্রতীক প্রযোজ্য, অন্যত্র নয়।' এই সূত্রের সাহায্যে সুধীন্দ্রনাথ চিত্রকল্প ও প্রতীকের অনেক রূপান্তর সমর্থন করতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনিও খ্রীসমাসেব পরিবর্তে

জন্মাষ্টমী ব্যবহারে কুণ্ঠিত—যেহেতু অভিপ্রায় বদলে যায়। অথচ সুধীন্দ্রনাথ নিজের এই উদার সূত্র নিজেই লঙ্ঘন ক'রে তর্জমায় এনেছেন মূলে অনুপস্থিত 'শংকরাচার্য' 'নটবর নবকার্তিক' 'পঞ্চসতী' 'কোনারকের সুন্দরীদের'—ফলে এই তর্জমায় ঘটে গেছে মূলের জন্মান্তর। সুধীন্দ্রনাথের হাতে হাইনের এমন 'পুরোপুরি ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত' হওয়ায় বুদ্ধদেব বসুর 'মনে বদ্ধমূল আপত্তি' সত্ত্বেও তিনি 'পরিবাদ' নামক কবিতার লঘু মাধুর্যে মোহিত হয়ে সেই আপত্তি উপেক্ষা করতে প্রস্তুত। কিন্তু মূলের প্রতি আনুগত্য এইভাবে বজায় রাখা যায় কি, ভাবচ্ছবির এই জাতীয় পরিবর্তনে মূলের অভিপ্রায় কি বদলে যায় না? 'বঙ্গীয় আদর্শ' রক্ষার দায়ে পরিচিত প্রতীক ব্যবহার করতে যেয়ে যদি মূলের স্বাদ একেবারে উবে যায় তাহলে তাকে একটি মৌলিক কবিতা বলা যেতে পারে, কিন্তু তাকে অনুবাদকবিতা বলা যায় না।

কতটা 'বঙ্গীয় আদর্শের' ছাঁচে ঢালা হবে, কতটা মূলের স্বাদ বজায় রাখা হবে, অনুবাদ করতে গেলে এই প্রশ্ন পদে-পদেই আসে। প্রত্যেকবারই অনুবাদককে নতুন ক'রে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়—একটা কবিতার সমাধান অন্য কবিতার বেলায় কাজে লাগে না। এলিয়টের 'Gerontion' কবিতার তর্জমায় বিষ্ণু দে-কে একই সমস্যায় বিব্রত হতে হয়েছিল। তিনি 'Jew squats on the window sill'-এর ভাষান্তর করেছেন 'জানালার কিনারে ঐ মারবারী'। এবং 'Spawned in some estaminet of Antwerp, / Blistered in Brussels, patched and peeled in London' হয়েছে 'জন্ম যার বনারসে ঘাটের কাদায় কোন্ / কানপুরে তেতেছে সে মেতেছে সে কলকাতায়'। যেখানে টিশিয়ানের চিত্রাবলির মাঝখানে হাকাগাওয়া নতশির ছিলেন সেখানে বিষ্ণু দে-র হাতে 'কালাচাঁদ প্রাণোলিয়া বেলোয়ারি ঝাড়ের তলায়'। কোথায় টিশিয়ানেব ছবি আর কোথায় বেলোয়ারি ঝাড়!

ওয়ার্ডসোয়ার্থের 'The Reverie of Poor Susan'-এর তর্জমা করতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ একই সমস্যার সামনে পড়ে 'thrush' পাখিকে ময়নায়, 'pail'-কে কলসিতে রূপান্তরিত করেছেন। মেয়েটির নাম কিন্তু রয়ে গেছে সুসান। এখন সুসান নাম্নী মেয়েকে কলসি কাঁখে চলতে দেখলে যদি উদ্ভট লাগে তাহলে কিছু বলার নেই। এলিয়টের 'The Dry Salvages'-এর যে অনুবাদ শঙ্খ ঘোষ করেছেন তা সার্থক অনুবাদের একটা ভাল নিদর্শন :

> দেবতার কথা আমি জানি না বিশেষ। শুধু যেন মনে হয় এই
> নদী এক সমর্থ ধূমল দেব, অনম্য, অনাব্য, ক্রূর।
> কিছু দূর সহ্য করে সব, প্রথমে তো মনে হয় সীমাপট ;
> উপযোগী, কিন্তু নির্ভরতাহীন বাণিজ্য-বাহিনী ;
> তারপরে একমাত্র দুরূহতা দেখা দেয় সেতুর নির্মাণে।...

তাঁকেও 'In the rank ailanthus of the April dooryard, / In the smell of grapes on the autumn table...' এই লাইন দুটোতে পৌঁছে দোটানের মধ্যে বোঝাপড়া করতে হয়েছে। তাঁর রূপান্তরে লাইন দুটো দাঁড়িয়েছে 'চৈত্রের দুয়ারপ্রান্তে কৃষ্ণচূড়া সারিতে সে ছিল, / অথবা আমের গন্ধে জ্যৈষ্ঠের ভাঁড়ারে।' আঙুরের বদলে আম—এরই মধ্যে আছে অনুবাদের আসল সমস্যা—মূলের অভিপ্রায়ের প্রতি আনুগত্য এবং অনুবাদের ভাষার রীতিঐতিহ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের সমস্যা। একই কারণে ইয়েটসের কবিতার কাটুল্লাস বিষ্ণু দে-র তর্জমায় হন কালিদাস।

মূল থেকে সরে যাবার যে প্রবণতা সুধীন্দ্রনাথে লক্ষ করেছি তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ 'সুরাত্রি' কবিতা, যেটি গ্যেটের 'Die Schöne Nacht'-এর অনুবাদ বলে দাবি করেছেন। গ্যেটের প্রথম চার চরণের আক্ষরিক গদ্য অনুবাদ হবে—'এখন আমি এই কুটীর, আমার প্রিয়তমার আবাস ত্যাগ ক'রে, মৃদুপায়ে অন্ধকার পরিত্যক্ত বনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি।' অথচ সুধীন্দ্রনাথের প্রথম স্তবক—

প্রাণপ্রতিমার কুঞ্জকুটীর ছেড়ে,
নৈশ, নিরালা কান্তারে দিই পাড়ি ;
অপার ব্যবধি পায়ে পায়ে যায় বেড়ে,
কিন্তু এখনও রভসে বিবশ নাড়ী।

অর্থাৎ প্রথম দুই চরণে গ্যেটের চার চরণের কথা বলা হয়ে গেছে, পরবর্তী দুটি চমৎকার চরণ আসলে সুধীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা—গ্যেটেতে তার কোনো ইঙ্গিত নেই। তাই একে অনুবাদ না বলাই বোধহয় সংগত। মূলের আক্ষরিক গদ্য অনুবাদ যেখানে—'এই নির্জনস্থানে হৃদয় কেমন সুখে পূর্ণ হয়! সেই আনন্দ অনুভব করাও কঠিন!'—সেখানে সুধীন্দ্রনাথ লেখেন—'এ-মহামৌনে অশোভন মাধুকরী, / ভূমা সমাহিত চেতনারই রচনীয়।' তিনি মূলকে বক্তব্যে, অনুষঙ্গে এবং ভাষার ধ্বনে একেবারে অতিক্রম ক'রে যান। শব্দগুলো মূল প্রসঙ্গের পক্ষে বড় বেশি গুরুভার। আসলে সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথ মূলকে ছাপিয়ে বড় বেশি সুধীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন।

মালার্মের 'Angoisse' কবিতাটি মোহিতলাল অনুবাদ করেছিলেন। তিনি সম্ভবত মূল ফরাসি হাতের কাছে না রেখে কোনো ইংরেজি তর্জমার উপর পুরোপুরি নির্ভর করেছিলেন—ফলে মূল থেকে মোহিতলালের তর্জমা অনেক দূরে সরে গেছে।

আমিও তোমারি মত কামরণে ক্লেদাক্ত বিজয়ী
অসহ্য তাহার জ্বালা, কালচক্র নহে এত ক্রূর!
তবু তুমি পাপের সে বিষদন্তে নাহি কর ভয়,
হৃদয় পাষাণ তব, উদাসিনী পাপীয়সী অয়ি!
আমি হেরি স্বপ্নে—মোর মরা মুখ, ভীষণ পাণ্ডুর!
একাকী শুইতে তাই বড় ডরি, পাছে মৃত্যু হয়!

মূলের মিলবিন্যাস ছিল ক খ খ ক গ গ, মোহিতলালের হাতে তা বদলে গেছে। ছয় চরণের এই অংশটিতে যখন চার চরণের শেষে বিস্ময়চিহ্ন পাই, তখন বুঝি মোহিতলালের কাব্যধর্মে এখানে মালার্মে পুরোমাত্রায় আচ্ছন্ন। অনুবাদে অনেক কথা তিনি ব্যবহার করেছেন

যার আভাস মূলে নেই—'কামরণে ক্লেদাক্ত বিজয়ী', 'কালচক্র নহে এত ক্রূর', 'উদাসিনী পাপীয়সী অয়ি', 'মরা-মুখ, ভীষণ পাণ্ডুর'। বাস্তবিক প্রথম চার চরণ যে মালার্মের অনুবাদ তা বোঝাই কঠিন। কারণ যেমন নতুন কথা তর্জমায় এসেছে তেমনি মূলের 'native noblesse' 'sterilite", 'Je fuis, pa'le, de'fait', ব্যাকাংশের প্রতিরূপ তর্জমায় আসে নি। মালার্মের 'hante' par mon linceul' শবাচ্ছাদক বস্ত্রের দ্বারা আমি তাড়িত হই, তর্জমায় দাঁড়িয়েছে 'আমি হেরি স্বপ্নে—মোর মরা মুখ, ভীষণ পাণ্ডুর!' আর যিনি মোহিতলালের কবিতা পড়েছেন তিনিই জানেন 'কামরণে ক্লেদাক্ত বিজয়ী' এই জাতীয় ভাষা মোহিতলালের একেবারে নিজস্ব। সুধীন্দ্রনাথের ও এই রকম অন্যান্য অনেকের উদাহরণ মনে রেখেই বুদ্ধদেব বসু 'কবিতার অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' প্রবন্ধে লিখেছিলেন: 'কখনো-কখনো তাঁর (অর্থাৎ অনুবাদকের) ইচ্ছা হয় মূল কবিকে মুখোশের মতো ব্যবহার ক'রে ফাঁকে-ফাঁকে নিজেরই কথা উচ্চারণ করবার। এবং এই অবস্থায়, অনেক সময় রচনাটি দাঁড়ায়, অনুবাদ নয়, অন্য একটি প্রতিযোগী কবিতা।'

'অন্য দেশের কবিতা' বইতে আপলিনেয়ার থেকে একটা চমৎকার অনুবাদ আছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের। মূলানুগ এই তর্জমায় মূলের স্বাদ ও ভঙ্গিও রক্ষা পেয়েছে।

> হায় রে আমার পরিত্যক্ত যৌবন
> শুকনো ফুলের মালা
> এখন অন্য ঋতুর আসার পালা
> সন্দেহ আর জ্বালা।

কিন্তু মিলের ব্যাপারে মিল নেই মূলে আর তর্জমায়। সুনীল নিজেই বলেছেন: 'পর পর লাইনে মিল ছিল, অনুবাদের সময় আমার হাতে অন্যরকম মিল এসে গেছে।' এখানে অবশ্য ততটা দাঁড়ায় নি, কিন্তু একবার মূল থেকে অন্যরকম এসে যাওয়াটা প্রশ্রয় পেলে তাকে

ঠেকানো মুসকিল হয়। যেমন 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত'-য় সংকলিত দিনো কাম্পানার 'Giardino Autumnale'-এর জগন্নাথ চক্রবর্তী-কৃত অনুবাদ 'শরতের বাগান'। জগন্নাথবাবু যদিও মূলের ভাব বজায় রেখেছেন, কিন্তু তিনি অনুচিতভাবে বাইশ লাইনের কবিতাটিকে সতেরো লাইনে কমিয়ে এনেছেন।

রিলকের 'Herbst' কবিতার তর্জমা করেছেন দুজনে। বুদ্ধদেব বসুর তর্জমার নাম 'হেমন্ত', বিষ্ণু দে-র 'শরৎ'। বিষ্ণু দে যখন লেখেন 'জ্বলে যায় শত শাহীবাগ' তখন তর্জমায় আসে অতিরিক্ত অনুষঙ্গ। বুদ্ধদেবের 'ভঙ্গিতে জানায় প্রত্যাখ্যান'-এর চেয়ে বিষ্ণু দে-র 'নেতির মুদ্রায়' অনেক সুন্দর। দ্বিতীয় স্তবকে কিন্তু দুজনের বড় বেশি ব্যবধান।

আর ধীর রাত্রির গহনে পৃথিবীর ভার ঝরে যায়
তারার শৃঙ্খল থেকে নিঃসঙ্গ আঁধারে। —বুদ্ধদেব বসু

এবং রাত্রিতে যবে ছেয়ে যায় নির্জনতা সমুদ্রের প্রায়,
বর্তুল পৃথিবী ঝরে দূরগামী হাহাকারে তারাদের পায়ে পায়ে ডেকে।

—বিষ্ণু দে

দুজন অনুবাদকের তর্জমায় পার্থক্য হতে বাধ্য, কবি-ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যই তার কারণ। কিন্তু যেখানে অর্থগত এতটা ব্যবধান ঘটে, সেখানে কারণ মূলের প্রতি প্রয়োজনীয় আনুগত্যের অভাব।

মূলের প্রতি অনুগত হলেও স্বতন্ত্র কবিস্বভাবের জন্য তর্জমায় কেমন পার্থক্য এসে যায় তার প্রমাণ দাখিল করছি। বোদলেয়ারের 'La Mort des Pauvres'-এর বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসুর তর্জমায় মূলানুগত্যের দিক থেকে পার্থক্য সামান্য।

মৃত্যু তো সান্ত্বনা, আহা তারই তরে বেঁচে থাকা যায়,
জীবনের শেষ সে তো, তাই তো সে একমাত্র আশা,
সে-সঞ্জীবনীতে বাঁচি, প্রত্যাশার পরম নেশায়
হৃদয় জিয়াই আর খুঁজে চলি দীর্ঘ কালো বাসা। —বিষ্ণু দে

মৃত্যুই, হায়, সান্ত্বনা! সে-ই বাঁচিয়ে রাখে ;
আয়ুর লক্ষ্য, সে ছাড়া ভরসা নেই কিছুই ;
সে-ই কড়া মদ, ভরপুর যার নেশার ঝোঁকে
বুক বেঁধে চলি, যাবৎ সাঁঝের ছায়া না ছুঁই। —বুদ্ধদেব বসু

প্রয়োজনের চেয়ে প্রসারিত ছন্দ নির্বাচন করায় বিষ্ণু দে-কে অপ্রয়োজনীয় 'তো' 'আর' অব্যয় দিয়ে ছন্দরক্ষা করতে হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর মাত্রবৃত্ত একটু বেশি চটুল হলেও অর্থের সংহতি বজায় রেখেছে। এখানে যেন রূপকল্পের নয়, তর্জমাকারীদের ব্যক্তিত্বের ব্যবধানের প্রশ্নই বেশি এসে পড়ে।

ভিলোঁর 'L'Epitaphe Villon'-র ছুটো ইংরেজি তর্জমায় ছুরকম কবিস্বভাবের পরিচয় পাচ্ছি। অবশ্য কবিস্বভাবের পার্থক্যের মধ্যে স্বতন্ত্র যুগের কাব্যাদর্শের পার্থক্যও আছে একথা মানতে হবে। প্রথমে সুইনবার্নের অনূদিত চার লাইন

Here are we five and six stiung up, you see,
And here the flesh that all too well fed
Bit by bit eaten and rotten, rent and shred,
And we the bones grow dust and ash withal...

ঠিক এই চারটি লাইনের রবার্ট লোয়েল-কৃত অনুবাদে সমস্ত মেদ ঝরিয়ে কবিতা হাড়েমজ্জায় নিতান্ত নির্ভার।

Five, six—you see us tied up here,
the flesh we overfed hangs here,
Our carrion rots through skin and shirt,
and we, bones, have changed dirt.

আর এজরা পাউণ্ড সারাজীবন সপ্তসিন্ধু দশদিগন্তের নাবিকগিরি ক'রে বেড়ালেও নিজের ছুর্মর মার্কিনী-সত্তা হারিয়ে ফেলেন নি কোনোদিন। মৌলিক কবিতায় তো বটেই, একভাষা থেকে অন্যভাষায় খেয়াপারাপারের সময়েও ঐ মার্কিনী স্বভাব বেরিয়ে পড়ে। ছোট একটা উদাহরণ দিচ্ছি। র‍ঁ্যাবোর 'An Cabaret-Vert' কবিতায় 'adorable' পরিচারিকা পাউণ্ডের হাতে হয়ে যায় 'very nice'

এবং সেই পীনপয়োধরা 'la filleaux te'tons e'normes' পাউণ্ডের রূপান্তরে দাঁড়ায় 'the gal with the big bubs'। এই ধরনের অনুবাদে ক্রিয়াবান ভাষার চরিত্র এবং কবির স্বভাব।

অনুবাদক কোনো কোনো বিরল মুহূর্তে মূলের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য বজায় রেখেও একটি স্বাবলম্বী কবিতা লিখে উঠতে পারেন। মূল ও অনুবাদ পাশাপাশি সাজিয়ে নিলে দেখা যাবে ইয়েটসের 'A Coat'-এর অলোকরঞ্জন-কৃত তর্জমা 'আঙরাখা' সেইরকম সফল ভাষান্তরের উদাহরণ।

(ইয়েটস)	(অলোকরঞ্জন)
I made my song a coat	বানিয়েছিলাম গানেরই আঙরাখা
Covered with embroideries	পৌরাণিকী উপাখ্যানের
Out of old mythologies	নকশা বুনেছিলাম ঢের
From heel to throat ;	একেবারে পা থেকে বুক ঢাকা ;
But the fools caught it,	মূর্খেরা তা ছিনিয়ে নিলো, জানো,
Wore it in the world's eyes	ঢাক পিটিয়ে পরলো অসংকোচে
As though the'd wrought it.	যেন এটা তাদেরই বানানো।
Song, let them take it.	গান, নিয়ে যাক নিয়েই যদি যায়,
For there's more enterprise	আরো অনেক অভিনবত্ব যে
In walking naked.	একেবারে নগ্ন হেঁটে যাওয়ায়।

কিন্তু এক জায়গায় সফলতা অন্য জায়গায় সাফল্যের চাবিকাঠি হাতে তুলে দেয় না। আর ঘনিষ্ঠতম তর্জমাতেও এমন এক-একটা সমস্যা আসে যখন কোনো সূত্র দিয়ে কাজ হয় না, অনুবাদকে নিজের মতো ক'রে সমস্যার একটা কাজচালানো সমাধান ক'রে নিতে হয়। ধরা যাক, স্পেণ্ডারের 'The Express' কবিতার বাংলা রূপান্তর, যেটি অমিয় চক্রবর্তীর করা। এই তর্জমা মোটের উপর মূলের অনুগত। কিন্তু স্পেণ্ডারে এক জায়গায় আছে, 'The song of her whistle screaming at curves, / of deafening tunnels, brakes, innumerable bolts', তার অনুবাদ করেছেন অমিয় চক্রবর্তী

এইভাবে, 'চলার বাঁকে বাঁকে বাজে তার বাঁশির চিৎকার-গান, / বধির করা শব্দের ঝড় ঝঙ্কৃত হল সুরঙ্গে, যন্ত্রে যন্ত্রে অগণ্য কলকব্জার অন্তর্লীন সংঘর্ষে।' দ্বিতীয় লাইনে 'শব্দের ঝড় ঝঙ্কৃত হল' অনুবাদকের 'padding' (নবোকফের ভাষায়)—'deafening tunnel'-এর ভাব বোঝাতে যেয়ে এই অতিরিক্তের যোজনা। আর 'brakes, innumerable bolts'-কে বাংলায় আনতে অসুবিধা বোধ ক'রে তার প্রতিরূপে লিখেছেন তিনি 'যন্ত্রে যন্ত্রে অগণ্য কলকব্জার অন্তর্লীন সংঘর্ষে'--কিন্তু শেষ দুটি শব্দের কোনো ইঙ্গিত মূলে ছিল না।

অন্য সমস্যাও দেখা দেয়, যেমন দেখি নিট্‌শের 'Ecce-Homo'-র নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর করা অনুবাদে। নীরেন্দ্রবাবুর রচনা 'অগ্নিশিখা' বাংলা কবিতা হিসাবেও ভালো, মূলের প্রতিও একনিষ্ঠ।

> জানি, আমি জানি, কোথায় উৎস মম।
> আমি লেলিহান অগ্নিশিখার সম,
> তারই মতো আমি আত্মদাহনেকামী যে।
> আমি যাকে ছুঁই, জ্বলে সে তখনি। আর
> যা-কিছুকে ছাড়ি, পড়ে থাকে অঙ্গার।
> তৃপ্তিবিহীন আগুনের শিখা আমি যে।

এই অনুবাদে আমার আপত্তি 'মম' / 'সম' মিলে, এবং দ্বিতীয় চরণের অভ্যস্ত বিশেষণ 'লেলিহান' বিষয়ে। আর মূল জার্মানে দ্বিতীয় চরণে 'লেলিহান' বিশেষণ ছিল না, ছিল 'তৃপ্তিবিহীন' এই বিশেষণ—যেটি তর্জমায় ষষ্ঠ চরণে অ-জায়গায় বসেছে। মূলের বিন্যাস রক্ষিত হয়েছে নীরেন্দ্রনাথে। তাঁর সমস্যা হয়েছিল নামকরণ নিয়ে। Ecce-Homo—এই লাটিন বাক্যাংশের অর্থ, লোকটিকে দেখ। বাইবেলের এই বাক্যাংশের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যিশু। কিন্তু নিট্‌শে সম্ভবত সেই ইঙ্গিত দিতে চান নি—তিনি বিদ্রোহী মানুষের কথাই বলতে চেয়েছিলেন। তাই এখানে ছবি যিশুর নয়, দেববিদ্রোহী অগ্নি-অপহারক

প্রমিথিউসের বরং। তাই আমার মনে হয় Ecce-Homo-র তর্জমা 'অগ্নিশিখা' ক'রে নীরেন্দ্রনাথ ভালোই করেছেন।

ধরা যাক অন্যের অনুবাদ না ক'রে কবিরা নিজেরাই নিজেদের কবিতা অনুবাদ করলেন। তাতেই কি সবসময় মূলের প্রতি তর্জমা নিষ্ঠাবান হয়! বরং স্বকীয় সম্পত্তি বলে যা-কিছু করার অধিকারের দাবিতে কবিরা আরো বেশি স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ সবচেয়ে আগে মনে পড়বে। টমসন তো পষ্টাপষ্টি রবীন্দ্রনাথকে বলেইছিলেন: 'You···have been your worst enemy.···One sin is, you have increasingly paraphrased, instead of translating.'। রবীন্দ্রনাথ দোষ স্বীকার করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথও একই অপরাধে অপরাধী। তাঁর মহৎ কবিতা 'সংবর্ত'-এর তর্জমায় তিনি কী কাণ্ড করেছেন, শেষ কয় চরণের মূল ও ইংরেজি রূপান্তর সাজিয়ে দিলে তার পরিচয় মিলবে।

> অন্তর্হিত আজ অন্তর্যামী:
> রুষের রহস্যে লুপ্ত লেনিনের মামি,
> হাতুড়ি নিষ্পিষ্ট ট্রটস্কি, হিটলারের সুহৃদ স্টালিন
> মৃত স্পেন, ম্রিয়মাণ চীন,
> কবন্ধ ফরাসিদেশ। সে এখনো বেঁচে আছে কি না,
> তা সুদ্ধ জানি না।

'Cyclone' নামে স্বকৃত অনুবাদে এই ছয় পঙ্‌ক্তি সম্প্রসারিত ও ব্যাখ্যাত হয়ে দাঁড়িয়েছে এগারো লাইনে।

> Departed is the inner guide
> Today, the outer ghosts have also fled.
> Their after-image being all I see:
> Old Lenin's mummy wrapt in the mysteries
> Of Muscovy; undaunted Trotsky felled
> By hammer-blows; triumphant Stalin turned
> To Hitler's friend; the corpse of Spain; Cathay

Approaching dissolution ; headless France
Exhibiting reflexive agony.
Alas, I have no means of finding out,
If she is still alive or bombed to dust.

দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণ পুরোপুরি মৌলিক রচনা ; লেনিন ট্রটস্কি স্টালিনের আগে যথাক্রমে 'old' 'undaunted' এবং 'triumphant' বিশেষণগুলোও নতুন যোজনা। মূলের 'কবন্ধ ফরাশিদেশ' রূপান্তরে শুধু 'headless France' নয়, উপরন্তু 'Exhibiting reflexive agony'। আর আন্তর্জাতিক বিপর্যয়ের পটভূমিকায় যে ব্যক্তিগত হারানোর দীর্ঘশ্বাস বেজে উঠেছিল শেষ দেড় চরণে, বিশেষ করে 'না'-এর দীর্ঘায়িত স্বরধ্বনিতে, ইংরেজিতে সেই বেদনা সেই দীর্ঘশ্বাস কোথায় ! 'সে এখনো বেঁচে আছে কিনা / তা সুদ্ধ জানি না।'—এর অনুবাদের সঙ্গে 'or bombed to dust' যোগ হওয়ায় মূলে হারিয়ে-যাওয়ার বহু সম্ভাবনার যে অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনা ছিল, ইংরেজিতে তা একেবারে অন্তর্হিত।

যেমন অন্য ভাষা থেকে বাংলা অনুবাদে তেমনি নিজের কবিতার ইংরেজি অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথের তুলনায় বিষ্ণু দে অনেক বেশি মূলানুগ। প্রমাণ—

আমার স্বপ্নও অপরিসীম
আমার মনে কোনো ক্লান্তি নেই,
অথচ ডালে-ডালে শুকনো হাহাকার,
অথচ মাঠে-মাঠে অসাড় হিম,
আকাশে কান্নারও ক্ষান্তি নেই।

My dreams too are endless
The mind knows no fatigue
Yet the withered wailing of the boughs
Yet the numb cold on plains and meadows
And unceasing the sky's tears.

বুদ্ধদেব বসু কখনো মূল থেকে দূরে সরে যান—'কিন্তু যদি আধেক তাকিয়ে তুমি পাশ ফেরো, ফুটে ওঠে ফুলের বিস্ময়,' হয়ে যায় 'yet should you flick an eyelid flowers will race like children's'। অন্যত্র দেখা যায় তিনি মূল রচনার কাছাকাছি আছেন : প্রমাণ হিসেবে তুলনা করা যায়—'আমাকে দিয়ো না দৃষ্টি। বিচ্ছেদে ভরে আছে মন। / যত গাঁথি মালা, তত সরে যায় দূর আর কাছে।' 'Cast not your spell. Separation masters me./ My wreaths do only sundur Far and Near.'।

মূল কবির সাহায্য নিয়ে যখন বিদেশী ভাষার কবি অনুবাদের দায়িত্ব নেন, তখনই সফল হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তাতেও সবসময় বিপত্তি এড়ানো যায় না। অ্যালেন গিনসবার্গ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও দু-তিনজন বাঙালি কবির কবিতার তর্জমা করেছিলেন কবিদের সাহায্য নিয়ে। ঐগুলো ছাপা হয়েছিল দুই নম্বর City Lights Journal-এ। গিনসবার্গ লিখেছেন : 'The poems were translated into funny English by the poets themselves & I spent a day with a pencil reversing inversions of syntax and adding in railroad stations.'। সুনীলের একটি কবিতার অংশ মিলিয়ে দেখি ফল কী দাঁড়ালো। কবিতাটির নাম 'আঠাশ বছরে'।

মৃত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে চোখে চোখে কথা হয় শেষ
তুমি কিংবা আপনি বলবো মনেও পড়ে না
জানলায় বাদুড় এসে হেসে যায় দগ্ধ ভোরবেলায়
বিবাহিত রমণীরা সিঁড়ির উপর থেকে চকিতে দাঁড়িয়ে
যেন বহু কষ্টে কেনা
মুণ্ডহীন হাসি দিয়ে চলে যায় ঝুল বারান্দায়,
এখন প্রত্যেক দিন দাড়ি না কামালে আর বাঁচে না সম্মান,
রক্তের সমুদ্রে এক দ্বীপ আছে, সেখানে স্টীমার ছাড়ে সঠিক দশটায়।

AGE TWENTY EIGHT

I meet my dead friends, finishing conversation exchanging glances, I have forgotten their right names
My tea cup jumps breaking in a dry morning.
Married women sometimes stop on the staircase and throwing a headless smile, pass up to the balcony—
Now, prestige mainly depends on shaving regularly.
An island exists in the sea of blood, where a steamer goes everyday at night 10 A. M.

বাস্তবিক 'তুমি কিংবা আপনি বলবো মনেও পড়ে না'—এর আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদ হতেই পারে না, তাই নিরুপায় গিনসবার্গ লিখেছেন 'I have forgotten their right names.'। কিন্তু 'জানলায় বাদুড় এসে হেসে যায় দগ্ধ ভোরবেলায়'—এই ইমেজ অবচেতনের কোন্ অলৌকিক খেয়ালে বা অজ্ঞতায় 'My tea cup jumps breaking in a dry morning'-এ রূপান্তরিত হল তা নির্ণয় করা কঠিন। বিবাহিত মহিলাদের 'যেন বহু কষ্টে কেনা' হাসি তর্জমায় ক্ষতিকরভাবে অনুপস্থিত। কিন্তু ইংরেজিতে 'at night 10 A. M.' কী ক'রে হল জানি না—রাত্রিতে কি 10 A.M. হয়? কবিতা পড়তে যদি অতটা বিষয়ী অতটা হিসেবি নাও হই, তবু রাত্রির কথায় কবিতাটি নিরর্থক হয়ে যায় নাকি? সুনীল মূল কবিতায় বলতে চেয়েছিলেন, এখন আঠাশ বছরে নিত্যি দাড়ি কামিয়ে সঠিক বেলা দশটায় আপিসে যেতে হয়। কিন্তু তর্জমায় 'রাত্রি' আনামাত্র সেই অনুষঙ্গ হারিয়ে গেল, ফলে আঠাশ বছরে চরিত্রের পতনের জন্য যে ক্ষোভ কবিতাটির অভিপ্রায়, তাই খানিকটা নষ্ট হয়ে গেল।

এইভাবে অনুবাদের হাতে মূল বারবার বিপন্ন হয়। অনুবাদকের জন্য অপেক্ষায় থাকে গোপন কাঁটা, গুপ্তঘাতক, চোরাবালি, ফাঁদ, পরাজয়। তবু প্রিয় বিদেশী কবির কবিতা নিজের ভাষায় সঞ্চারিত করার লোভ অদম্য। তাছাড়া বিদেশী কবিপ্রতিভা ও ভাষার সামর্থ্যের

সঙ্গে দ্বৈরথসমরে লিপ্ত হয়ে নিজের ও নিজের ভাষার ক্ষমতার দৌড় যাচাই করার লোভও সংবরণ করা কঠিন। তাই যতদিন বিদেশী ভাষার কবিতা কবির সামনে চ্যালেঞ্জের মতো আছে ততদিন অনুবাদ চলছে এবং অনুবাদ চলবে।

ত্রিশের দশক : 'আদিম দেবতারা'

একদিন এক দয়াময়ী মহিলা সূতিকাগারে নুন খাইয়ে এঁদের খুন করতে চেয়েছিলেন, আর একদিন আর একজন মহিলা তাঁদের সম্বন্ধে গবেষণাগ্রন্থ লিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি পেলেন। বিশ শতকের ত্রিশের দশক প্রকৃতপক্ষে বাংলা আধুনিক কবিতার প্রথম দশক ; এই দশকেই যাঁদের আমরা আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতিষ্ঠাতা পিতৃপুরুষ বলে জানি তাঁদের কণ্ঠস্বর প্রথম শোনা গিয়েছিল। ইতিমধ্যে ঋতুপরিবর্তন যে হয়েছে তার প্রমাণ ঐ দুই ঘটনায় আছে, দুই মহিলার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায়। যাঁরা ছিলেন নিষিদ্ধ প্রবাসী, গরিষ্ঠের ধারণায় উন্মার্গগামী, তাঁরা আজ স্বীকৃত শুধু নন, প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস, এমন কি উত্তরকালের স্বতন্ত্র বিদ্রোহের তাঁরা সম্মুখীন। ১৯৩০ সালে সুধীন্দ্রনাথের 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, ১৯৪১ সালে মৃত্যু হল রবীন্দ্রনাথের। এই দুই ঘটনার মধ্যে ত্রিশের দশকের বৃত্তসীমা রচনা সম্ভব। ত্রিশ বছর পরে সেই দশকের কবিদের রচনাবলীর দিকে ফিরে তাকিয়ে আজ তার সাধারণ লক্ষণগুলো দেখা চলে ; অতি-নৈকট্য ও অতি-দূরত্বের দুই রকম ভয় থেকেই আমরা মুক্ত।

কী অবস্থায় আধুনিক কবিতার জন্ম হয়েছিল ইয়োরোপে, তার সঙ্গে আমরা সকলেই এখন অল্পবিস্তর পরিচিত। প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ক্রমান্বয় ভাঙনের পথে তার আবির্ভাব। যুদ্ধে-যুদ্ধে রাষ্ট্রবিপ্লবে ইয়োরোপ তখন ক্ষতবিক্ষত—এবং যেহেতু তখন ইয়োরোপ ছিল প্রায় সমস্ত বিশ্বের শাসক, সেই কারণে দূরতম দিগন্ত পর্যন্ত ইয়োরোপীয় ঘটনাভাবনার অনুকম্পন পৌঁছে যেত। রুশ

বিপ্লব, উনত্রিশ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, শক্তিবাদ ও ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান, সেই পশুবাদের বিরুদ্ধে স্পেনের গৃহযুদ্ধে শিল্পীসাহিত্যিকের সমবেত যোগদান ও পরাজয়ের গ্লানিবহন—এই সমস্ত ঘটনায় অনুকম্পায়ী কবিসম্প্রদায়ের উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া চিন্তা ও মনীষার জগতে এল বিপুল পরিবর্তন। রুশ বিপ্লব জয়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবী মহলে মার্কসবাদ সশ্রদ্ধ কৌতূহল জাগালো, সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত ধারণা তাই ভাঙতে শুরু করলো। পুঁথিগত ও বিশ্ববার্তাগত জ্ঞান মানুষের চৈতন্যচিন্তার মধ্যে এক ঘোর আলোড়ন বাধিয়ে দিল। ফ্রয়েডের গবেষণা বিশ্লেষণ করলো স্বপ্নের কুহেলিময় জগৎকে, সেই গবেষণার ফলে পারিবারিক সম্পর্ক, মনোজগৎ ও নরনারীর প্রেম ইত্যাদি বিষয়ে পুরোনো ধারাণাগুলো চুরমার হয়ে গেল। নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা দেখালো কোনো নীতি বা অনুশাসনই নিত্য বা সর্বদেশে সমান সত্য নয়, নষ্ট হয়ে গেল চিরন্তন মূল্যবোধ এই নৈতিক আপেক্ষিকতায়। এ সবের সঙ্গে এসে যোগ দিল ক্রমান্বয় শিল্পবিস্তার। মুছে গেল এতদিনের পরিচিত প্রকৃতি, চিমনির ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল ঈশ্বরের আকাশ। ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ, অতিকায় রাষ্ট্র ও যন্ত্রশক্তির সামনে মানুষের ঐকান্তিক অসহায়তা, প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন নৈর্ব্যক্তিক নাগরিক জীবনযাপন, যান্ত্রিক উৎপাদনের ফল হিসাবে অনিবার্য যূথবদ্ধতা—এ সমস্তই মানুষের ব্যক্তিত্বকে যেন বিনাশের পথে নিয়ে চলেছিল। এই প্রতিকূল পরিবেশেই বীরের মতো, যেন সিসিফাসের মতো আধুনিক কবির যাত্রা। তার মনে হল রিয়ালিটির চেহারার যেন এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং এই পরিবর্তিত রিয়ালিটিকে রূপ দিতে গেলে প্রকাশের নতুন পন্থা খুঁজে নেওয়া প্রয়োজন। যে অবস্থায় ভেঙে পড়েছে ঈশ্বর ও নীতিধর্মে বিশ্বাস, যুক্তি ও মানবতার প্রতিপত্তি, সৌজন্য ও সামাজিক দায়িত্ব-বোধ—অর্থাৎ রেনেসাঁসের যাবতীয় উত্তরাধিকার, যেখানে ভেঙে পড়তে চায় ভাষার অর্থ

এবং ব্যাকরণের অনুশাসন। সুতরাং খুঁজতে হয় শিল্পীকে প্রকাশের নতুন মাধ্যম, আত্মপ্রকাশের ক্ষুরধার অন্য এক ভঙ্গিমা। প্রকাশের ও রূপায়ণের এই নতুন ভঙ্গিমার মধ্যেই কবিতার আধুনিকতা। এই ধারালো নতুন ভঙ্গিমা দিয়েই বিরুদ্ধ পরিবেশ থেকেও আধুনিক কবি কবিতার অবিনাশী রস আহরণ করেন।

ইয়োরোপীয় কবিতার ক্যাকটাসেরই কি অন্ধ অনুকরণ বাংলা আধুনিক কবিতার ফণিমনসা? যে-জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা পুরোনো মতামতকে চূর্ণ করে দিল তার আবির্ভাব প্রতীচ্যে, যে-সমস্ত ঘটনা আঘাতে-আঘাতে প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিল তাও ঘটেছে প্রতীচ্যে। সুতরাং প্রতীচ্যে যদি আধুনিক নাম নিয়ে কোনো স্বতন্ত্র চরিত্রের কবিতা জন্ম নেয় তবে তাকে কবিতা বলে যদি নাও মেনে নিই অন্তত তার আবির্ভাবকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু যে দেশে ঐ জ্ঞানচর্চা হয় নি, যেখানে অনুরূপ ঘটনার আঘাত-প্রত্যাঘাতের কোনো অভিজ্ঞতা নেই সে দেশে আধুনিকতার নামে এই পালাবদল স্বাভাবিক না শূন্যগর্ভ প্রতিধ্বনিমাত্র—এই প্রশ্ন তুলেছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি স্মরণীয়, 'যে-দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায় নি, সে দেশের সাহিত্য ধার করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে (সাহিত্য-ধর্ম)।' আজ জানি রবীন্দ্রনাথের এই অভিযোগ পুরো সত্য নয়। কেননা যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির জন্য চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে দেশগুলি আজ আর ততো দূর বিভক্ত নয়। আজ যে কোনো নতুন আবিষ্কার সহজেই সমস্ত বিশ্বমানবের উত্তরাধিকার হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথেরও দেখেছি ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েট বোমাবর্ষণের খবর তাঁর প্রকৃতিধ্যানকে চূর্ণ করে দিয়েছিল। আজ বুদ্ধিজীবীমাত্রেই যখন বিশ্বনাগরিক, তখন কালান্তরের কোলে যারা জন্মেছে, যারা বিংশ শতাব্দীর সমান বয়সী, যারা বিগতশতাব্দীর শুভ ও স্থৈর্যের প্রসাদ পায় নি, কৈশোর কেটেছে

যাদের প্রথম মহাযুদ্ধের রক্তপঙ্কে, যৌবন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুঃস্বপ্নে, যারা মার্কস-ফ্রয়েড-ফ্রেজার গলাধঃকরণ করেছে ক্ষুধিত উৎসাহে, তাদের রচনায় যে সমগ্র পৃথিবীর পচনশীলতা আনুপূর্ব প্রতিফলিত হবে এ তো স্বাভাবিক। তাছাড়া ইয়োরোপের ঘটনাচিন্তা একদিকে কলকাতার বন্দরে ঢেউয়ের আঘাত দিয়েছে যেমন, তেমনি ভারতবর্ষের অন্দরেও যে কোনো কিছু হয় নি তাও নয়। অসহযোগ আন্দোলন, শিল্পবিস্তার, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বেকার সমস্যা, সমস্তই অনুভূতিপ্রবণ যুবক কবিদের চোখের সামনে ঘটেছিল। সুতরাং আধুনিক বাংলা কবিতা প্রতিধ্বনিমাত্র নয়, প্রতীকের ধ্বনিটির ব্যঙ্গমাত্র নয়। আধুনিকরা বাঙালি কবি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের নাগরিক, একথা সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী থেকে যে কোনো আধুনিক কবির সম্বন্ধে খাটে। সেইজন্যেই সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিকে মাধুকরীর মতো পরিব্রাজকের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, ভুক্তাবশিষ্টের জন্য যাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়াতে হয়। এবং যে পরিমাণে সে বিশ্বনাগরিক ঠিক সেই পরিমাণে সে উদ্বাস্তু। আধুনিক কবিমাত্রেই স্বভাব-উদ্বাস্তু, স্বদেশেও সে প্রবাসী। তাই বোধহয় বলা যায় রবীন্দ্রনাথই সর্বাংশে শেষ ভারতীয় কবি।

ত্রিশের দশকের কবিরা গূঢ়ার্থে সবাই ভারতীয় হলেও, আপাতত মাত্র-ভারতীয় নন। তাঁরা সমগ্র আন্তর্জাতিক বিশ্বের কেন্দ্রে বর্তমান, অন্তত তাঁরা যে দেশীয় দিগন্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না একথা স্বীকার করতেই হবে। তারই বহিরঙ্গ প্রমাণ এই কবিদের কবিতায় প্রসারিত ভূগোলের বিবরণে, আন্তর্জাতিক জগতের চিত্রমালায়। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রেমিকা বিদেশিনী, পিঙ্গল তার চক্ষু, আর তার উড্ডীন কেশপাশ মলয়ের তপ্ত স্পর্শে ধান্যসম কেলিপরায়ণ, আর তার আঙুল শেফালির মতো শুভ্র। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যতোই কালিদাসের কালের অলঙ্কার ও প্রসাধন থাক না কেন, সেই বহুবল্লভা প্রতীচ্য রমণী। কবন্ধ ফরাসিদেশ ও ম্রিয়মাণ চীনের

বেদনায় তাঁর কবিতা আচ্ছন্ন। 'রূপসী বাংলা'-য় যে জীবনানন্দ হেমন্তপ্রকৃতি, ধানসিঁড়ি নদী ও লক্ষ্মীপেঁচার সংসর্গে ছিলেন তাঁকেও দাঙ্গাযুদ্ধবিধ্বস্ত মহাপৃথিবীর কথা বলতে হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর রাজনৈতিক নানা জটিলতা তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতায় ছায়াপাত করেছে। বিষ্ণু দে-র চৈতন্য যে বৃহৎ বিশ্বের পটভূমিতে ক্রিয়াবান্ তার প্রমাণ বিদেশী পুরাণ-উল্লেখে, বিদেশী কবির চরণাংশের অঙ্গীভূত ব্যবহারে; তাঁর কবিতায় আথেনে-প্রজ্ঞাপারমিতা, লেনিন-রথসচাইল্ডের সহাবস্থান মেলে একই কারণে। এই বিশ্ব-চেতনারই অন্য চেহারা আছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় ভৌগোলিক নামতালিকা ও বিবরণে। রবীন্দ্রনাথ বসুন্ধরা বা অহল্যার প্রতি কবিতায় যে বিশেষ ধরনের বিশ্বচেতনাবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন, আর সুধীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ-বিষ্ণু দে যে বিশ্ব-অভিজ্ঞতার অংশীদার হলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভৌগোলিক বিশ্বচেতনাবোধ যেন সেই দুইয়ের মাঝখানের সাঁকো। বহুদেশ ঘুরলেও রবীন্দ্রনাথের কবিতার পটভূমি বাংলাদেশ। উর্বানা বা পারস্যে যেখানেই থাকুন তাঁর কবিতা বাংলাদেশের কবিতা। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা চার মহাদেশের পটভূমি ব্যবহার করে। রবীন্দ্রনাথ জড়ের মধ্যে চৈতন্যের নর্তন দেখেছিলেন, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন অনাত্মীয় সূত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্র ভৌগোলিক নামতালিকার মধ্য দিয়ে যেমন একটা দূরবিস্ময় সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, তেমনি বিশ্ব-ঐক্য উপলব্ধিও তাঁর আরেক উদ্দেশ্য। বস্টন এলিজাবেথভিল বা ডুসেলডর্ফ যেখানেই থাকুন, সকল মানুষের মধ্যে এক পবিত্র সৌহার্দ্যবন্ধন আবিষ্কার করেন অমিয় চক্রবর্তী। সুধীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ বিশ্বনাগরিক অন্য কারণে, বিশ্ব-যন্ত্রণার অংশীদার হিসেবে; বিষ্ণু দে আর এক কারণে, বিশ্ব-সংগ্রামের সহমর্মী বলে, বিশ্বের মানবিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে।

এই বিশ্বনাগরিকতার আর এক প্রমাণ পাশ্চাত্য কবিদের সঙ্গে তাঁদের মর্মগত যোগে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে—আর

তাঁরা তো রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্যে সর্বস্ব পণ করেছিলেন—স্বদেশী পূর্বসূরীদের সঙ্গে তাঁদের যোগ সামান্য। হুইটম্যানের ভাবালুতাপ্লুত বিশ্বাত্মবোধ, শ্রমজীবীর আত্মীয় হবার সাধ, সারল্যের সন্ধিৎসা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার ভাষণে ও আঙ্গিকে পাওয়া যায়। আদিম বর্বরতার প্রতি লরেন্সের আসক্তিও তাঁকে কম প্রভাবিত করে নি। বুদ্ধদেব বসু চিরকাল পরিক্রমা করেছেন রোম্যান্টিক অ্যাগনির রক্তিমপিঙ্গল বৃত্তে। মরিস, সুইনবার্ন প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিকুল থেকে বোদলেয়ার পর্যন্ত সকলেই শুদ্ধশিল্পের সাধক বুদ্ধদেব বসুর উপর একে-একে প্রভাব বিস্তার করেছেন। একদিন যা ছিল নিষ্করুণ নারী বা নির্মম শয়তানের হাতে নির্মিত বেদনা, র‍ঁ্যাবো বা বোদলেয়ারের আনুকূল্যে সেই যন্ত্রণা সত্য ও অন্তর্গূঢ় হয়েছে ঠিকই—কিন্তু বৃত্তটি যে চ্যুতিহীনভাবে এক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। জীবনানন্দের প্রথম যুগে কীটস ও প্রি-র‍্যাফেলাইটদের চিত্রলতার প্রভাব দেখা যায়, কখনো কখনো একেবারে বিপরীত মেরুর হুইটম্যানের প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়। এক সময় তিনি ইয়েটসেরও নিবিড় প্রভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। মালার্মে ও মালার্মে-শিষ্য ভালেরির দ্বারা খুব প্রভাবিত হয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ—বিশেষ করে শব্দের মহিমাকে পরম মনে করার ব্যাপারে। বিষ্ণু দে-র অনেক চতুর কবিতায় এলিয়ট বা পাউণ্ড, এমন কি অডেনের ছায়া পড়েছে। পরে যখন তিনি মার্কসবাদে বিশেষ আগ্রহী হলেন তখন তাঁর রচনায় কখনো কখনো এলো এলুয়ার বা আরাগঁ বা নেরুদার আদর্শ। আঙ্গিকে ও প্রকরণে প্রথম দিকের অমিয় চক্রবর্তীর উপর হপকিন্সের খুব প্রভাব ছিল, পরে তাঁর কোনো-কোনো কবিতা ওয়ালাস স্টীভেনস প্রভৃতি মার্কিন কবির কবিতার কথা মনে পড়ায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছাড়া এঁরা সকলেই যে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন এটা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, অনিবার্য ছিল তাই-ই। প্রশ্ন হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের উপরেও তো প্রতীচ্যপ্রভাব পড়েছে,

তাহলে ত্রিশের দশকের কবিদের উপর প্রতীচ্যপ্রভাবের বিশেষত্ব কোথায়? প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ পড়লেই বোঝা যায় মজ্জায়-মজ্জায় এই ভারতীয়ের উপর প্রতীচ্যপ্রভাব নিতান্ত গৌণ। দ্বিতীয়ত, ত্রিশের দশকের কবিদের উপর বিদেশী প্রভাব সামগ্রিক উপলব্ধি, চৈতন্যচিন্তা ও যন্ত্রণার সাদৃশ্যজাত একই বিশ্ববীক্ষার ফল। রবীন্দ্রনাথের উপর শেলির প্রভাব যে একই বিশ্ববীক্ষার ফল নয়, তা সদৃশ কবিতাগুলো আলোচনা করলেই স্পষ্ট হবে। বিশ্ববীক্ষায় এই সাদৃশ্য ছিল বলেই আলোচ্য কবিদের উপর বিদেশী প্রভাব এত বেশি কাজ করেছিল।

জগৎ-দেখা দৃষ্টির পার্থক্যের জন্যেই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এঁদের বিদ্রোহ করতে হয়েছিল। অবশ্য এমন কথা বলার সময় খানিকটা সতর্ক থাকা দরকার। কারণ সব সময় সামাজিক পরিবেশগত কারণেই যে সাহিত্যের পরিবর্তন আসে তা নয়, বিশেষত সামাজিক ঘটনাপুঞ্জ এতই জটিল যে কোনটি কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়া তা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। অনেক সময় সাহিত্য ও ভাষার স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্যে সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনেই সাহিত্যের যুগ-পরিবর্তন ঘটে। একথা মনে রেখেও মনে হয় সমাজের বীভৎসতা, পঙ্গুতা ও অন্ধতার মধ্যে বাস করে রবীন্দ্রকাব্যের নন্দনতত্ত্বে আধুনিকেরা অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন পচনশীল সংঘর্ষসংকুল সভ্যতার মধ্যে বাস করে, অনাত্মীয় শহরে বাস করে, তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন কুৎসিত ও কদর্যকে বর্জন করার অর্থ অস্তিত্বের অধিকাংশকেই উপেক্ষা করা। রবীন্দ্রনাথের শুভবাদী সুন্দর জগৎ তাঁদের অনাত্মীয় মনে হয়েছিল, সেই কল্যাণলোকে তাঁরা নিজেদের পরিচিত পৃথিবীকে খুঁজে পেলেন না। প্রেম ও অপ্রেমের দাবি, প্রেম ও রিরংসার দাবি তাঁদের কাছে তুল্যমূল্য মনে হলো। অন্য পৃথিবীর বাসিন্দা বলেই রবীন্দ্রকবিতার আঙ্গিক প্রকরণ ছন্দ তাঁদের তৃপ্ত করতে পারলো না। তারই ফল হলো তথাকথিত রবীন্দ্রবিদ্রোহ। এই বিদ্রোহীদের সকলের প্রতিক্রিয়া অবশ্য এক নয়, সেই প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কোনো সামান্য উক্তি করতে

যাওয়াও বোকামি। এই কবিদের অন্যতম বুদ্ধদেব বসুর মতে, 'বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে, প্রধানতম সমস্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।' যিনি ঘটা করে ঘোষণা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে সরিয়ে তাঁরা এগিয়ে যাবেন, 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর'-এ এসে দেখি সেই বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রপ্রত্যয়ে কী পরিমাণ নিষ্ঠাবান। অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রপ্রত্যয়ে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা পোষণ করেও আঙ্গিকের দিকে নতুন পথে অবলীলায় এগিয়ে গেলেন কোনো ছদ্মবিদ্রোহের অপেক্ষা না রেখে; আবার বিপরীতক্রমে সুধীন্দ্রনাথ শব্দপ্রকরণ ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করে নিয়ে, এবং ছদ্মবিদ্রোহের কোনো অপেক্ষা না রেখে, তাই দিয়ে প্রকাশ করলেন রবীন্দ্রবিরোধী প্রত্যয় ও জীবনবীক্ষাকে। জীবনানন্দ প্রথম দিকে কিছুটা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, এমন কি নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু আশ্চর্যভাবে কি প্রত্যয়ে কি আঙ্গিকে তিনি সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে গেলেন। রবীন্দ্র-নাথের চরণাংশ কখনো বিকৃতভাবে কখনো অবিকৃতভাবে উল্টো পরিমণ্ডল ব্যবহার করে বিষ্ণু দে দেখিয়ে দিলেন দুই জগতে প্রভেদ কত বেশি। পরে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছেই শিখতে চাইলেন, কীভাবে আত্মচ্ছেদনহীন সত্তার সন্ধানী হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের ব্যবহারে তাই মিল নেই, একটাই মিল যে রবীন্দ্রনাথের পর তাঁরাই একত্রে প্রথম নতুন স্বাদের কবিতার জন্ম দিলেন, পুনরুদ্ধার করলেন ভাষার স্বাস্থ্য।

রবীন্দ্রনাথ আর ত্রিশের দশকের কবিদের মাঝখানে অন্য একদল কবি আত্মাহুতি দিয়েছিলেন; সুধীন্দ্রনাথ-কথিত এই চিত্রল পতঙ্গের দল, তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে রবীন্দ্রনাথের মায়াবী আসঙ্গ নিরাপদ নয়। রবীন্দ্রবৃত্তে তাঁরা চিরকাল আবর্তিত হলেন, তাঁদের অন্যতম সার্থকতা যে তাঁদের পরিণাম পরবর্তীদের সাবধান করে দিতে পেরেছিল। ছন্দোকুশল সত্যেন্দ্রনাথ, শাক্ত মোহিতলাল, বৈষ্ণব

কুমুদরঞ্জন বা নিসর্গধ্যানী করুণানিধান কেউ-ই সেই সর্বগ্রাসা প্রভাব থেকে রেহাই পান নি। একমাত্র নজরুল ইসলামের উচ্চকণ্ঠ অশিক্ষিতপটুত্বে, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বার্ধক্যময় বিষণ্ণ বিদ্রূপে কিছু স্বতন্ত্র স্বাদ পাওয়া গিয়েছিল। এঁদের অবস্থার তুলনা রয়েছে ইংরেজি সাহিত্যেও। রোম্যান্টিক আন্দোলন যখন ভিক্টোরীয় যুগে ম্রিয়মাণ, তখন একদল কবি চিত্রল প্রি-র‍্যাফলাইটে, হরিদ্রাভ নব্বইয়ে, জর্জিয়ান গোপগাথার নকল ভাটিয়ালে, ইমেজিজমের ছদ্মরূপদে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের একমাত্র মূল্য আজ ঐতিহাসিক। তাঁরা উত্তরকালের নান্দী রচনা করেছিলেন এইমাত্র তাঁদের গৌরব। বিষণ্ণ হার্ডির মধ্যে যতীন্দ্রনাথের মতো খানিকটা ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছিল।

আর ত্রিশের দশকের কবিরাই যে শুধু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভাবিত ছিলেন তাই নয়, রবীন্দ্রনাথও এই নতুন আন্দোলনের সম্মুখীন হয়ে একদিকে যেমন আধুনিক কবিতার নিত্যমূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তেমনি নিজের কবিতা সম্বন্ধেও নতুন করে ভাবতে শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্তির সমস্যা যেমন আধুনিক কবিদের চিন্তিত করেছিল, তেমনি ত্রিশের যুগের প্রতীচ্যের ও বাংলাদেশের কাব্যবিপ্লবও রবীন্দ্রনাথকে কম চিন্তিত করেনি। 'শেষের কবিতা'-য় কবিতার আধুনিকতার সপক্ষে অমিতের বক্তৃতা ও নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতায়, এলিয়ট প্রভৃতির কবিতার অনুবাদে, বিচিত্রায় কবিতার আধুনিকতা বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত অভিভাষণে, নিজের গদ্যছন্দে লেখা কবিতায় নতুন ধরনের ইমেজ-প্রকরণ-শব্দের আশ্রয় পাওয়ায় তার বড় প্রমাণ। ত্রিশের কবিদের অমরত্বের যদি আর কোনো অভিজ্ঞান নাও থাকে, তাঁরা যে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী পর্যায়ের উপর নিজেদের স্বাক্ষর মুদ্রিত করে দিয়েছেন তাতেই অমরত্বে তাঁদের যথেষ্ট দাবি রয়ে গেল।

ত্রিশের দশকের কবিতার সামান্য লক্ষণ আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে কবিদের প্রগাঢ় ইতিহাসচেতনা। আসলে

ইতিহাস-সচেতন বলেই তাঁদের কবিতার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর এমন মৌলিক পরিবর্তন, তাঁদের নন্দনতাত্ত্বিক ধারণায় এমন বিপ্লব। তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন কালজ্ঞান ভিন্ন কবির গতি নেই। এই কালজ্ঞান কখনো নিয়তির মতো শুভাশুভ সম্বন্ধে নির্লিপ্ত উদাসীন, আবার কখনো সেই কালজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কবি ক্ষণবাদে আশ্রয় খোঁজেন —ইতিহাসের সিন্ধবাদের বোঝা স্কন্ধ থেকে নামিয়ে দিতে চান। এঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথই সব চেয়ে ইতিহাসচেতন কালজ্ঞানী কবি। কিন্তু কালের ঘূর্ণ্যমান সিঁড়ির শিখরে দণ্ডায়মান জীবনানন্দও কম কালজ্ঞানী নন : নাটোরের বনলতা সেনের মুখে তিনি শ্রাবস্তীর কারুকার্য লক্ষ্য করেন, শ্যামলীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে পড়ে যায় দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা ; কালপ্রবাহের দুর্বার স্রোতে অস্তিত্বের কণা যে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় দ্রুত বহমান একথা জীবনানন্দ যে উপলব্ধি করেছিলেন তার চিহ্ন আছে তাঁর কবিতার মজ্জায়-মজ্জায়। সুধীন্দ্রনাথকে আর জীবনানন্দকে যদি বলি কালসচেতন কবি, তাহলে সমসাময়িক অন্য কবিদের অন্তত বলতে হয় স্বকালসচেতন। অন্যান্যেরা স্বীয়কালকে দেখেছেন, এঁরা দুজন স্বীয়কালকে সর্বকালের পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন—এতেই বোধহয় আছে দুজনের শ্রেষ্ঠত্বের উৎস। তাৎক্ষণিকের সঙ্গে চিরন্তনের এই মুখোমুখি দেখা, তাতে এক নতুন তাৎপর্য আসে—বর্তমান চিরন্তনের অঙ্গ হয়ে ওঠে, চিরন্তন বর্তমানের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পায়। কিন্তু সমকালীন বেশির ভাগ কবিতায় পাই এই স্বকালচেতনারই পরিচয়। অর্জুন বা টাইরেসিয়াসের সূত্রে প্রাচীন পুরাণের পৌনঃপুনিক উল্লেখ সত্ত্বেও বিষ্ণু দে-র বেশির ভাগ কবিতায় যা পাই তা এই স্বকালচেতনা। হাইফার যে ইহুদি মেয়ে ফেলে-আসা ইয়োরোপের দিকে তাকিয়ে থাকে, ডুসেলডর্ফে বোমাভাঙা গির্জায় যে যিশুমাতৃমূর্তি রক্তমাখা, সেই সব চিত্রপরম্পরায় সাকার হয়ে ওঠে অমিয় চক্রবর্তীর স্বীয় কালচেতনা। স্বকালের চলমান পলায়নপর বিরক্ত বিষণ্ণ ছবিগুলোকে ধরে রাখেন সমর সেন।

এই কালজ্ঞান, এই স্বকালসচেতনতা বা বর্তমানচেতনার প্রতীক আধুনিক শতাব্দীতে নগর ও নাগরিক সভ্যতা। এই কারণে ত্রিশের দশকের বাংলা কবিতা বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রথম নাগরিক কবিতা। নাগরিক কবিতা এই আপতিক অর্থে যে এই কবিতার সঙ্গত পরিবেশ ও অনিবার্য পটভূমি আধুনিক কালের বহুলবিস্তৃত নগর; রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো বীরভূমের সন্ন্যাসী মৃত্তিকা নয় বা পূর্ব বাংলার বাঁকা জল খেলা করা ছোট খেত নয়। অবশ্য উনিশ শতকের কবিরাও কলকাতাবাসী ছিলেন, কিন্তু নগরবাসী হলেও নগরের কবি তাঁরা ছিলেন না। নগরের স্বতন্ত্র নির্মম সৌন্দর্য আবিষ্কার করলেন ত্রিশের দশকের কবিরা এলিয়ট পড়ে, কেউ হয়তো বোদলেয়ার এবং ভের্লেন পড়ে—আর সেই নগর ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার নগর, যন্ত্রসভ্যতার নগর; রেনেসাঁসের ফ্লোরেন্স নয়, কালিদাসের উজ্জয়িনী নয়। আধুনিক কবিতার নগর ক্লান্ত, অনিকেত, গড্ডল-প্রবাহের নগর। রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যায়ে নগরের স্বতন্ত্র সৌন্দর্যের চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন, কিন্তু সেই জুগুপ্সিত পরিমণ্ডল সম্বন্ধে তিনি বিতৃষ্ণা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। উত্তরকালে প্রেমেন্দ্র মিত্রও নাগরিক দুঃস্বপ্নের জাল ছিন্ন করে মাঠের শস্য ঘরে আনার স্তোত্ররচনায় উৎসাহী। যে পরিবেশে জন্মেছি তাকে উপেক্ষা করা বিশ্বাসঘাতকার সামিল, নাগরিক জীবনের বীভৎসতার দিকে চোখ বুজে থাকা মানে মিথ্যার বেসাতি; তাই আধুনিক কবি আপাত-বীভৎসতার মধ্যে খুঁজে বের করে এক সচ্চরিত্র সৌন্দর্য—কেননা এই নগরই তার বিধিলিপি, তার কালজ্ঞানী চিত্তের অনিবার্য প্রতীক।

কলুষিত নগরের বাহিরের অপাপবিদ্ধ প্রকৃতির জগতে এই দশকের কবিরা যে একেবারেই ফিরে যান নি তা নয়, তবে সে প্রস্থান বিরল হয়ে এসেছে। বাংলার বিচিত্র ফল গাছ পাখি, শৈশবের রূপকথা ও লোককাহিনীর মধ্যে দেশের চিন্ময়ী অস্তিত্বকে ধ্যান করেছেন জীবনানন্দ। যেমন বাংলার প্রকৃতিতে বাংলার মুখ দেখেন জীবনানন্দ,

তেমনি অমিয় চক্রবর্তী উদাসীন উৎসুক চোখ মেলে মহাভারতীয় নানা প্রান্ত থেকে বিদেশী স্ট্রবেরির বনে ঘুরে বেড়ান। তবু জীবনানন্দের মগ্ন নিসর্গ ধ্যানের মধ্যে রূঢ় মনুমেণ্ট জেগে ওঠে; সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার বিষয় যতোই নগর-বিচ্ছিন্ন হোক না কেন, বর্তমান চেতনার প্রতীক মহাকায় নগর থেকে তাঁরা একেবারে দূরে সরে যান না। সরে যে যান না তা দুভাবে দেখানো যেতে পারে। স্বকালচেতনা যে কালোপযোগী প্রকরণের পাত্রে বিধৃত থাকে, চলতিকালের ভাষার চিরন্তন ভঙ্গিমা পায়, নগর-বিচ্ছিন্ন নিসর্গের কবিতাও সেই প্রকরণেই লেখা। সেই প্রকরণের মধ্য দিয়েই অসংবরণীয় কালচেতনার ছোঁয়া পাওয়া যায়, যার প্রতীক বলেছি মহাকায় নগরকে। দ্বিতীয়, সুধান্দ্রনাথ জীবনানন্দের প্রকৃতি সব সময়েই হেমন্ত প্রকৃতি; হেমন্ত, এক রুগ্ন পাণ্ডুর ঋতু। সমর সেনের নগরজীবনের কবিতায় যে অসুস্থতা যে রোগজনিত পাণ্ডুরতা দেখি, সেই অসুস্থতা পাংশু ক্ষয়ের প্রতিফলন পাই হেমন্তপ্রকৃতির বর্ণনায়। শহরের চিনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে বা সন্ধ্যার নৈরাশে বিবস্ত্র ব্যর্থতা আর হেমন্তের পীতপাংশু ম্রিয়মাণ আলো বা শূন্য মাঠ, একই কালজ্ঞানের দুই ইমেজ, সভ্যতার একই ক্ষয়ের দুটি স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি। শহবের মধ্যে বর্তমানের যে বিষণ্ন ছবি তাই দেখে কেউ সাঁওতাল পরগণায় যায়। অজিত দত্ত বা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতায় যে রূপকথার জগৎ বা শান্ত স্তব্ধ বেদনার্দ্র ছায়াব কোমল জগৎ পাই সে আসলে নাগরিক অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। এই অসহ পরিমণ্ডল থেকে মুক্তির ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত রূপ নেয় প্রবাসীর ঘরে ফেরার আকাঙ্ক্ষায়, সুতীব্র নস্টালজিয়ায়। স্বভাব-উদ্বাস্তু এই কবিরা, নগরের নিরুপাধি উদাসীনতা ও নির্মমতায় কাতর হয়ে প্রার্থিত নীড়ে, যে কোনো নীড়ে ফিরে যেতে চান কোনো কোনো সময়। নগরের ধূলিধূম্রজালে কেউ স্বপ্ন দেখে মাঠের শস্যের, কেউ যায় গ্রামের মেলায়, কারো কাছে ঈর্ষণীয় মনে হয় ভ্রাম্যমাণ বেদেদের জীবন।

প্রকৃতি স্বাভাবিক আর স্বভাবের প্রবর্তনায় ঋতুতে-ঋতুতে তার রূপান্তর হয়। এই বাৎসরিক পরিবর্তন নিয়ে প্রকৃতি আসলে অপরিবর্তনীয়, মানুষের মৌলিক আবেগগুলোর মতোই। প্রকৃতি স্বাভাবিক, কিন্তু নগর নির্মিত। এই সব নগর মানুষের গঠনবুদ্ধি ও পরিকল্পনার ফল। যদি প্রকৃতিকে বলি মানুষের অপরিবর্তনীয় আবেগসমূহের উপমান, তাহলে বোধহয় নগরকে বলা যায় মানুষের বুদ্ধি ও মনীষার উপমান। ত্রিশের দশকের বাঙালি কবিরা শুধু নগরের কবি নন, তাঁরা সর্বতোভাবে সচেতন কবি, মনীষা তাঁদের কবিতার একটা মৌলিক লক্ষণ। তাঁদের কোনোক্রমেই আর স্বভাবকবি বলা যাবে না, প্রেরণাবাদে তাঁরা আস্থাহীন, স্বপ্নগ্রস্ত পথিক ও অনুপ্রাণিত কবিকে তাঁরা সমান ডরান। সচেতন মননশীল তাঁদের কবিতা যে শহরের প্রেক্ষাপটে রচিত, সেই নগরের মতোই সুপরিকল্পিত, সুনির্মিত। এ কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয় যে আধুনিক কবিতার সমালোচনায় আমরা প্রায়ই স্থাপত্যের কথা পাই। স্থাপত্যেব মতো, সামগ্রিকভাবে ঐক্যময় চাবিত্র্যময় নগরের মতো আধুনিক কবিতাও সচেতন মনীষার ফল। এই কবিদের কবিতা প্রত্যক্ষভাষণ বর্জন করেছে, নিটোল নৈতিক ভাষণ পরিহার করেছে, তার সংসর্গ কবিতার পবিত্রতাকে কলুষিত কবে ব'লে। স্বভাবকবিত্ব এখন বিদ্রূপের বিষয়, কবিতা এখন পরোক্ষতাজীবিত। পরোক্ষতা ও তির্যক ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে কবিতার ঐক্যকে, তার পূর্বপরিকল্পনাকে অনুধাবন করতে হয়। সরল কাহিনী, সহজ নীতিকথা আর নেই ; পুঞ্জিত বা পরম্পরাময় ইমেজের মধ্য দিয়ে কবিতা এখন কৃষ্ণহীরার মতো তার রহস্যময় তাৎপর্য ক্ষণে-ক্ষণে দ্যোতিত করে। কবির মনীষা যেমন রচনা করে কবিতা, তেমনি পাঠকের কাছেও কবিতা চায় সচেতন মনোযোগ। ব্যঞ্জনা, কাব্যসঙ্গীতের বৈচিত্র্য, চরণস্তবকের ঘনত্ব, ব্যাকরণের অনুশাসনের বিপর্যয়, মিতভাষণ—সমস্তই আপাত-উন্মার্গগামিতার মধ্য দিয়ে কবিতার সামগ্রিক ঐক্যময় তাৎপর্য উন্মেষিত হয়।

জীবনানন্দের আপাতশিথিল বিস্রস্ত চরণগুলোর মধ্যে এই বৈদগ্ধ্য ও সচেতনতার অভাব ছিল প্রথম দিকে। আসলে তখন এলায়িত প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি মগ্ন ছিলেন, তার পক্ষে এই এলায়িত চরণগুলো যেন অনিবার্য ছিল। কিন্তু সে বিচ্ছিন্ন চরণগুলো যতোই দুর্বল এলায়িত বা শিথিল মনে হোক না কেন সেই চরণসমূহের সমবায়ে রচিত সমগ্র কবিতার মধ্যে কোনো শৈথিল্য দেখা যায় না। তাছাড়া জীবনানন্দের নিসর্গ কবিতাও পরোক্ষতানির্ভর, আবেগের প্রবলতায় তাঁর কবিতা কখনো প্রত্যক্ষভাষণে বাগ্মী নয়। তির্যক ইঙ্গিতে, সহযোগী-প্রতিযোগী ইমেজের সমবায়ে তিনি অভীষ্টকে অর্জন করেন। যে-মুহূর্তে তিনি সবচেয়ে নিসর্গমগ্ন, সেই মুহূর্তেও তাঁর প্রকরণ আধুনিক বিদগ্ধ মানুষের। এবং শেষ পর্যায়ের কবিতায়, যখন জীবনানন্দ মন থেকে মননের পথে যাত্রী, তখন এক দার্শনিক ধূসরতায় ইন্দ্রিয়ের ঐশ্বর্য নির্বাসিত হয়ে গেছে। তাঁর প্রথম জীবনের হেমন্ত প্রকৃতিও এতো পাণ্ডুর ছিল না, যতো পাণ্ডুর তাঁর শেষজীবনের মননচিন্তায় মগ্ন পিঙ্গল-ধূসর কবিতাগুলো। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেই বোধহয় মননের ছাপ সবচেয়ে তীক্ষ্ণ। সুধীন্দ্রনাথ এদিক থেকে অংশত মেটাফিজিকাল, তাঁর কবিতায় মননই আবেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশুদ্ধ বুদ্ধির ব্যায়াম কাব্যের বিষয় হতে পারে না, মনন তখনই কবিতা হয় —আবেগের জান্তবস্পর্শে সে যখন কেঁপে ওঠে—সুধীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতায় যা সম্পাদিত হয়েছে। অমিয় চক্রবর্তীর ছন্দোবিন্যাসে, ইমেজপরিকল্পনায়, সঙ্গীতে সচেতনতার সন্দেহাতীত পরিচয় আছে। বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ কবিতার সাঙ্গীতিক বিন্যাস সম্ভব হতো না সচেতন মনীষার পূর্বপরিকল্পনা ব্যতিরেকে। এই সৎ ও সচেতন শিল্পীও আবেগ ও বুদ্ধির অখণ্ডতা বিরচনে উৎসাহী। বিরূপ বিশ্বে যখন এই হৃদয়বৃত্তি ও চিন্তার ঐক্য ঘটে ওঠে না তখন বিষ্ণু দে-র বিদগ্ধ মানস ব্যঙ্গের ক্ষুরধারে দারুণ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। এই ব্যঙ্গশাণিত কবিতাগুলোর তুলনা মেলে উত্তরকালে সমর সেনের ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনায়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রেমের আবির্ভাব বেশির ভাগ সময়েই দেহনিরপেক্ষ। কিন্তু 'আজিকে দেহের পালা'। নিঃসঙ্কোচ জৈবধর্মে অনির্বচনীয় তনুর অঙ্গারে হয়তো পরমক্ষণে প্রেমের হীরে ফুটে ওঠে—সেই দেহসাপেক্ষ প্রেমের বন্দনায় এই কবিদের ক্ষান্তি নেই। কিন্তু এই দেহচেতনার প্রখর স্বীকৃতি বাংলা কবিতার ইতিহাসে কোনো অভিনব আবির্ভাব নয়। সংস্কৃত কাব্যে ও বৈষ্ণব পদাবলীতে দেহের উৎসব আছে, দেহের স্বীকৃতি আছে মধুসূদনে, কখনো অল্পখ্যাত গোবিন্দদাসের মতো কবির রচনায়—'আমি তারে ভালোবাসি অস্থি-মাংসসহ।' ভিক্টোরীয় রুচিবাগিশতা ও ব্রাহ্ম শুচিবায়ুগ্রস্ততার তাড়নায় এই দেহ-সচেতনতা বাংলা কবিতা থেকে কিছুদিনের জন্য লোপ পেয়েছিল মাত্র। আধুনিক কবিরা এই লুপ্ত উত্তরাধিকারকে পুনরায় উদ্ধার করলেন। কিন্তু পুরোনো ও আধুনিক কবিতার দেহ-বন্দনায় কয়েকটা স্পষ্ট পার্থক্য আছে। প্রথমত প্রাচীন কবিতার দেহচেতনা নিতান্ত প্রথানুসারী, তাতে নায়িকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রথানুগ উপচারে অলঙ্কৃত হয়ে ওঠে। বাৎস্যায়নের চোখ দিয়ে দেখা হয় প্রেমিকার দেহ। একজন কালিদাস বা একজন বিদ্যাপতি তারই মধ্যে স্পন্দন-রক্তিমা সঞ্চার করতে পারেন অবশ্য, কিন্তু তাঁদেরও সেই দেহোৎসবের উপকরণ এক। অথচ এই নতুন কবিরা নিজের দৃষ্টির সন্ধানী। একজন কবি লেখেন 'আমার চোখে তোমার দুই বুক স্বর্গের স্বপ্নের মতো'। 'আমার চোখে' কথাটা মনে রাখার মতো, কেননা প্রাচীনদের দেহবর্ণনায় যে নিজস্ব দৃষ্টির অভাব ছিল সেই নিজস্ব দৃষ্টির মধ্য দিয়ে ত্রিশের দশকের কবিদের কবিতায় প্রেম দেহে সাকার হয়ে ওঠে। তাছাড়া পুরোনো কবিতায় দেহকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সম্ভোগের চোখে দেখা হয়েছে, এখন তাকে প্রায়ই দেখা হয় অসুস্থ অক্ষমতার চোখ দিয়ে। যে কারণে চুনবালিপলেস্তারা-খসা নোনা-ধরা শহরের কবি তাঁরা, যে কারণে ঋতুসমূহের মধ্যে হেমন্তের কবি, ঠিক সেই কারণে সুস্থ সম্ভোগের নয়, অসুস্থ জ্বরগ্রস্ত মর্বিড দেহচেতনার কবি

তাঁরা। নতুন ননীর মতো তনুর অন্তরালে তাই অপ্রকৃতিস্থ রুগ্ন চোখ খড়ির মতো শাদা শুষ্ক অস্থিশ্রেণী খুঁজে বেড়ায়। 'জগতের শূন্য অন্ধকারে শরীরের রূপরেখা আমাদের অনন্য সম্বল', অথচ সেই শরীরের রূপরেখার প্রতি আসক্তিও আজ অসুস্থ হয়ে গেছে। আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর শুভ্র বুক, রক্তিম ঠোঁট আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস নিয়ে যে একটি মেয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, তার উজ্জ্বল বাসনা যেন আমাদের কলুষিত দেহে, দুর্বল ভীরু অন্তরে তীক্ষ্ণ প্রহার। পিঙ্গল বালুচর সর্বভুক, অনিঃশেষ বালুচরের এই পিঙ্গলতা হেমন্তকে পিঙ্গল করে, পিঙ্গল করে পারিপার্শ্বিক শহরকে ও দেহের সুতীব্র কামনাকে।

অবশ্য একই কালের কবিদের মধ্যে সামান্য লক্ষণ যেমন থাকে, তেমনি থাকে পার্থক্যও, বোধহয় পার্থক্যই বেশি। ত্রিশের দশকের কবিদের রচনায় যে দেহোৎসবের কথা বলেছি অমিয় চক্রবর্তীতে তার চিহ্ন নেই। এমন কি 'মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে'-র কথা সত্ত্বেও সেই চেতনা জীবনানন্দে দুর্নিরীক্ষ্য। জীবনানন্দ অনেক প্রেমের কবিতা লিখছেন, তাতে অপ্রেমের যন্ত্রণা আছে, মর্বিড অসুস্থতার দাগ আছে, কিন্তু তাতে দেহের বঙ্কিমরক্তিম রেখাগুলো নেই। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় দেহের কোনো প্রগলভতা নেই, প্রেমের প্রকাশও বড় ব্রীড়াময়, খুব প্রচ্ছন্ন। বিষ্ণু দে-র কবিতাতেও তাই।

ত্রিশের দশকের নতুন কবিতার আবির্ভাবসময়ে তার মৌলিক চরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ দুটো মন্তব্য করেছিলেন—এতদিন পরে তাদের সত্য আজ যাচাই করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা' (আধুনিক কাব্য) আর সুধীন্দ্রনাথের মন্তব্য হলো 'বিংশ শতাব্দীর মূল মন্ত্র হলো অবৈকল্য আর অকপটতা' (কাব্যের মুক্তি)।

প্রথম কথা, এক দশকের অভিজ্ঞতা দিয়ে একটি শতককে যাচাই করা যায় কিনা সন্দেহ। উপরন্তু এই মন্তব্য ছুটো সত্য হলে ত্রিশের দশকের কবিদের কবিতাকে রোম্যান্টিকতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এক নব্য ক্লাসিসিজমের ফসল বলে মেনে নিতে হয়। অবৈকল্য নৈরাত্মসিদ্ধির আর এক নাম, যার আর এক নাম বিষয়ের আত্মতা। অভিজ্ঞতার জগৎকে সততার সঙ্গে রূপ দিতে হবে, ঘটাতে হবে ব্যক্তিত্বের বিনাশ—এই তার অভিপ্রায়। কিন্তু একথা আজ জানাজানি হয়ে গেছে যে আধুনিক কবিতায় আপাতধ্রুপদের যে সাধনাই থাক না কেন, মূলে সে রোম্যান্টিক কবিতারই বংশধর। পুরোনো রোম্যান্টিকদের মতো সে আজ প্রত্যক্ষ আত্মপ্রকাশে অনর্গল নয় বটে, কিন্তু তার বহিরঙ্গ জগতের বর্ণনা আসলে ব্যক্তিস্বরূপকে প্রকাশেরই পরোক্ষ উপায়। জানতেই হবে ধ্রুপদী কবিতার ধ্যান তাকে রোম্যান্টিক স্বেচ্ছাচার থেকে বাঁচিয়েছে, শিখিয়েছে কী ভাবে উদ্দাম আবেগকে সংযমে সিদ্ধি দিতে হয়, মিতভাষণে, তির্যক ভঙ্গিতে, বিদগ্ধ ঐতিহ্যের স্বীকৃতিতে কীভাবে কবিতাকে স্মচরিতার্থ পরিণামে নিয়ে যাওয়া যায়।

কিন্তু যে সময়ে শিল্পী নিজেকে সমাজবিচ্ছিন্ন, উদ্বাস্তু প্রবাসী বলে মনে করে, গরিষ্ঠের প্রত্যয়বিশ্বাসের সঙ্গে শিল্পীর মেলে না, সেই সময়কে ক্লাসিকাল সময় বলা যায় না। আর রোম্যান্টিক সময়ের কবিতা কোনো-কোনো প্রবণতায় হয়তো ক্লাসিকাল হতে পারে, কিন্তু তার মূল চরিত্র রোম্যান্টিক হতে বাধ্য। রোম্যান্টিক আদর্শের শবকে তাঁরা চিতায় চড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন বটে কিন্তু আবার প্রমাণ হলো সেই রোম্যান্টিক আদর্শের অন্তকাল এখনো ঘনায় নি। এই স্মধীন্দ্রনাথ, অগাস্টান কবিদের সঙ্গে যাঁর অনেক সাদৃশ্য, সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে যিনি নিবিড়ভাবে পরিচিত, শব্দসচেতন কাব্যের নিরলস স্থপতি স্মধীন্দ্রনাথের মধ্যে পর্যন্ত রোম্যান্টিক আত্মার অনির্বাণ হাহাকার। বোদলেয়ারের কাব্য বহিরঙ্গে যতোই ক্লাসিকাল হোক অন্তরঙ্গে যেমন রোম্যান্টিক, স্মধীন্দ্রনাথেরও তাই। তিনি রোম্যান্টিক অনুপ্রেরণাবাদ

মানেন না, তবু তিনি খাঁটি রোম্যান্টিক। বিষ্ণু দে-ও রোম্যান্টিক, নিরবচ্ছিন্ন কবিতা লিখে, কবিতার সঙ্গীতধর্মে আস্থা রেখে তিনি সেই চরিত্রের প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতায় মার্কসবাদের ছায়া পড়েছে; তখনও মনে রাখা দরকার এরেনবুর্গ মার্কসবাদকে বলেছেন 'romanticism of the unromantic'। প্রকৃতি-প্রেমিক, নির্জনতানিমগ্ন, আপন আত্মার নিঃসঙ্গতায় সুনিহিত জীবনানন্দ—যিনি পৃথিবীর দিকে অনেক সময় তাকিয়েছেন কীটসের দৃষ্টিতে, তাঁর আপাতশিথিল চরণগুলোয় ক্লাসিকাল সংহতির কোনো চিহ্ন নেই; তিনি, বলাই বাহুল্য, রোম্যান্টিক কবি। অমিয় চক্রবর্তীও তাই। আগেই বলেছি, বুদ্ধদেবের সমস্ত কবিজীবন রোম্যান্টিক অ্যাগনির বৃত্তে আবর্তিত। সমর সেনের বিদ্রূপ আর মোহভঙ্গ, সবই এক ব্যর্থ রোম্যান্টিকের আর্তবিক্ষেপ।

কাব্যে অবৈকল্য ও বিষয়ের আত্মতা প্রতিষ্ঠার তাগিদে, পলায়মান মুহূর্তকে ধরে রাখার প্রয়োজনে, কবিত্বকে ব্যক্তিত্বনিরপেক্ষ রেটিনার-কর্মে রূপান্তরিত করার অভিপ্রায়ে, অন্য সব উপকরণ বাদ দিয়ে ইমেজের উপর সব চেয়ে ঝোঁক গজায়, এই সময় নিয়মিত ছন্দের বাঁধন ভেঙে গদ্যছন্দ জন্ম নিল। গদ্যছন্দের ব্যবহারের সঙ্গে-সঙ্গে কবিতার জগৎ থেকে এতকাল যে সব শব্দ বাক্‌বন্ধ এতদিন বহিষ্কৃত ছিল তারা সবাই প্রবেশপত্র পেয়ে গেল। গদ্যছন্দ ছুঁৎমার্গ ভেঙে দিল, ফলে এই সময় পদ্যছন্দে লেখা কবিতাতেও অবলীলাক্রমে জায়গা পেল গ্রাম্যশব্দ, কথ্যবুলি, বিদেশী শব্দ। তাৎক্ষণিককে ধরার প্রয়োজনে, প্লাজমের মতো যা এখনো নির্দিষ্ট রূপ নেয় নি, সেই চঞ্চল বর্তমানকে রূপায়ণের তাগিদে গদ্যছন্দের ব্যবহার আরম্ভ হলো—ঠিক এলিয়ট নয়, হুইটম্যান লরেন্স হলেন প্রধান আদর্শ। সুধীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম, তিনি গদ্যছন্দ আদৌ ব্যবহার করেন নি, কিন্তু পদ্যের মধ্যে তিনি যে গদ্যের স্পন্দন ও বিন্যাস আনতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ আছে 'যযাতি' কবিতায়। জীবনানন্দ গদ্যছন্দের খুব চর্চা করলেনই, তাছাড়া এমন

শব্দ ব্যবহার করলেন যারা কবিতায় দূরে থাক ভদ্রসমাজে পর্যন্ত অচল। সমর সেন শুধু গদ্যছন্দেরই একনিষ্ঠ সেবক। অমিয় চক্রবর্তীই খানিকটা চর্চা করেছিলেন মুক্তছন্দের, যা নিয়মিত ছন্দের সংস্রব একেবারে হারায় না। তাঁর আদর্শ ছিল হপকিন্সের স্প্রাং রীদম্। এইভাবে ত্রিশের দশকে যে বাস্তবতার দাবি মুখরিত হয়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে দেবদানবের সমস্বর জটলায়, সুন্দর-কুৎসিতের সহাবস্থানে একদিকে তা আত্মপ্রকাশ করলো, অন্যদিকে সেই দাবির ফলে জন্মালো গদ্যছন্দ।

এই সব কথা মনে রাখলে বোঝা যাবে গীতাঞ্জলির ইংরেজি গদ্য অনুবাদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতার পরীক্ষায় হাত দেন নি। সেই সাফল্য প্রেরণা হলে গদ্যকবিতা লেখায় তিনি এত দিন দেরি করতেন না। 'লিপিকা'-ও যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার আদিরূপ নয়, প্রচলিত ধারণা সত্ত্বেও, একথাও ছন্দোবিচার করে দেখানো সম্ভব। 'পুনশ্চ'-র যুগে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা রচনার পিছনে অনেকটা রয়েছে ইংরেজি ভাষায় যাঁরা তখন নতুন ধরনের কবিতার পরীক্ষা করছিলেন তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আভাসিত পরিচয়—ইমেজিস্ট আন্দোলনের কবিদের সঙ্গে, আরো পরে এলিয়টের কবিতার সঙ্গে। একথা রবীন্দ্রকবিতার ঐ সময়ের ইমেজগুলো বিশ্লেষণ করেও দেখানো যায়। গদ্যকবিতা জন্মেছিল তৎক্ষণাৎকে ধরার প্রয়োজনে, চিরন্তন নয়, ক্ষণিকের দাবিতে। দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ গদ্যকবিতা হয় ডায়েরিধর্মী নিসর্গচিত্র-বর্ণনা অথবা স্মৃতিরোমন্থন। তাই অসংশয়ে বলা যায় ত্রিশের দশকের বাঙালি কবিদের আর রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতাচর্চা একই উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত, একই নন্দনতাত্ত্বিক প্রয়োজনের পরিণাম।

গদ্যকবিতায় বাস্তবজগৎ ও পরিচিত পৃথিবী বেশি ধরা পড়ে, কথ্য-গদ্যের সঙ্গে সংস্রবও তার নিবিড়। গদ্যে-নিবদ্ধ উপন্যাস ও গল্প পড়তে অভ্যস্ত পাঠকসাধারণের মধ্যে পদ্যের চেয়ে গদ্যকবিতা বেশি

জনপ্রিয় হবে এমনটাই ভাবা গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য লাগে, যে সময়ে কবিতা গদ্যছন্দে লেখা হলো, কথ্যপ্রকরণের কাছাকাছি এলো সেই সময়েই কবিতা হারিয়ে ফেললো জনপ্রিয়তা, পরিণত হলো গোষ্ঠীশিল্পে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দে ও পদ্যছন্দে লেখা কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করলেও দেখি তাঁর পদ্যছন্দে লেখা কবিতার জনপ্রিয়তা বহুগুণে বেশি। এই আপাত বিস্ময়কর ঘটনার অনেক কারণ আছে। একদিকে কবিতা ছন্দের আবরণ খুলে সহজ ও আটপৌরে হলো বটে, কিন্তু সে আগের মতো উপাখ্যান বা নীতিকথা বলে অপ্রস্তুত পাঠককে দলে টানতে চাইলো না। কবিতার শুদ্ধতার দীপ জ্বলে উঠলো, ভিড় অনেক পাতলা হয়ে গেলো। তাছাড়া পদ্য-ছন্দের মধ্যে আদিম স্পন্দনের যে উত্তরাধিকার আছে, মনে রাখা দরকার, মানুষ তার মোহ সহজে কাটাতে পারে না; গদ্যছন্দের চরণে সেই স্মরণীয়তা নেই, পদ্যছন্দের চরণে যা থাকে। গদ্যছন্দের প্রতি বিমুখতার একটা কারণ হয়তো পাঠকদের সনাতনী অভ্যাস, অন্য একটা গূঢ় কারণ হয়তো এই যে সম্পূর্ণ মুক্তি বলে শিল্পে বা কবিতায় কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। পূর্বনির্দিষ্ট নিয়মের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেই বারবার কবিকে জিততে হয়। বোধহয় এই শেষ কারণের উপলব্ধি থেকেই দেখি পরবর্তী সময়ে গদ্যছন্দের চর্চা কমে পদ্যছন্দের চর্চা বেড়েছে, পয়ারেও অনেক কবিতা লেখা হচ্ছে, যদিও তার মধ্যে এসে যাচ্ছে মুক্তছন্দের স্বভাব। কিন্তু গদ্যছন্দের প্রধান লাভটি এখন পদ্যছন্দের অন্তর্গত হয়ে গেছে--কথ্যপ্রকরণ ও গদ্যরীতি এখন অবলীলায় পদ্যছন্দে ব্যবহার্য হয়ে উঠেছে।

ত্রিশের দশকের কবিরা পরবর্তী দশকগুলোতেও সক্রিয় আছেন—এই অগ্রজদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে জীবনানন্দের, সুধীন্দ্রনাথের এবং সম্প্রতি বুদ্ধদেব বসুর। অন্যেরা মাঝে মাঝে পুনরুক্তিপরায়ণ হলেও এখনো কর্মিষ্ঠ। তাঁদের চেষ্টায়, যা কিছু কবিতা নয় তার থেকে শোধিত

হয়ে কবিতা হয়েছে অনেক পবিত্র, অনেক স্বাবলম্বী। তাকে আজ আর আত্মপ্রকাশের জন্য কথাকাহিনী বা হিতকথার উপর নির্ভর করতে হয় না। এই শুদ্ধ কবিতার পাঠক কমেছে, কিন্তু কবিতার তন্নিষ্ঠ পাঠক কোনোদিনই বেশি নয়। এই অগ্রজ কবিরা নিজেদের প্রয়োগের দ্বারা কাব্যাদর্শের পালাবদল ঘটিয়েছেন, ধীরে ধীরে তৈরি করে নিয়েছেন অনুরক্ত পাঠক। কবিতার প্রতি এই সব পাঠকের তন্ময় অনুরাগ অনেক বেশি গভীর। এইভাবে ত্রিশের দশকের কবিরা বাংলা কবিতার আকাশে বাতাসে হাওয়াবদল ঘটিয়েছেন।

এই কবিদের আবির্ভাব একটা উত্তেজনা-উন্মাদনার মধ্যে ঘটেছিল। সেই উত্তেজনা ফিকে হয়ে গেছে, আরো যাবে। কবিরা যখন থাকবেন না তখনও এই কবিতাগুলো থাকবে তো? জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ তো নেই, কিন্তু কবিতাগুলো তো আছে এখনো। চিরকাল? এঁদেরই একজন বলেছিলেন 'একটা লোকোত্তর পটভূমি না জুটলে, কবি তো কবি, খুব স্থূল অনুভূতির মানুষও বাঁচে না।' সেই লোকোত্তর পটভূমি এই সমস্ত কবিদের রচনায় ছিল কিনা তার নিশ্চিত উত্তর দিতে পারে সময় নামক প্রাজ্ঞ বিচারক, তাও এক সময়ের বিচার অন্য সময় নাকচ করে দেয়। বিশেষকালের খণ্ডিত দৃষ্টি নিয়ে নিরুপায় সমালোচক তাই মাত্র নিজের কথাই বলতে পারে। এই সমালোচকের পক্ষে নির্লিপ্ত হওয়া আরো কঠিন, কারণ এই সমস্ত কবির কাছে সে ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ; তার সময়েব কথাকে যে কবিরা বাণী দিয়েছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে উপায় কী? তবু মনে হয় এঁদের সামগ্রিক পরিণাম শ্রেষ্ঠকাব্যের নিরিখে বিচার করলেও কিছুমাত্র লজ্জাজনক হবে না। অবশ্য জীবনানন্দ সংশয়ান্বিত ছিলেন 'এ সময়টায় খুব দীর্ঘ কবিতা রচিত হয় নি, কাব্যনাট্যও নেই, শ্লেষও মহান কবিতা হয়ে উঠতে পারে নি।...কেবলই খণ্ডকবিতার সিদ্ধি নিয়ে দূরতর ভবিষ্যৎ তৃপ্ত থাকবে বলে মনে হয় না' (বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ)। কিন্তু 'সংবর্ত' বা 'আটবছর আগের একদিন' বা 'দময়ন্তী'

কিংবা 'জন্মাষ্টমীর' তুলনা মেলা সহজ নয়। সন্দেহ নেই চূড়ান্তে এঁরা অনেকবার পৌঁছেছেন, দ্বিতীয় শিখর জয় করেছেন অসংখ্যবার।

কিন্তু স্বকীয় মূল্য যদি সন্দেহের ব্যাপারও হয়, ঐতিহাসিক মূল্য থাকলোই। আধুনিক বাংলা কবিতার সূত্রপাতের নান্দীপাঠকেরাই সব চেয়ে ফলবান, তাঁদের তুল্য সিদ্ধি উত্তরকাল আজো অর্জন করতে পারে নি। শব্দের পবিত্র শিখা নিয়ে অতন্দ্র সাধনায় তাঁরা ঈর্ষাময়ী কবিতার ধ্যান করেছিলেন। তাঁরা কবিতার আদর্শ ও আবহাওয়া বদলে দিয়েছেন, পাঠক তৈরি করেছেন, সমালোচনার সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন, সঙ্গে-সঙ্গে রচনা করেছেন কিছু অনবদ্য পদাবলী - এমন কিছু পদাবলী যার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার অর্থ কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই প্রশ্ন তোলা।

ইয়েটস ও জীবনানন্দ প্রসঙ্গে

সব সৎ কবিই স্বভাব কবি, কোনো খাঁটি কবিই প্রভাব কবি নন। তবু পৃথিবীতে এমন কবি কম, যাঁর স্বদেশ বা বিদেশের পূর্বজ বা সমকালীন কবির কাছে ঋণ নেই। কিন্তু এই ঋণ কবিস্বভাবের সততাকে নষ্ট করে না, বরং আত্মসাৎ করার মধ্য দিয়ে নিজের মৌলিকতারও চরম পরীক্ষা হয়ে যায়। এই ঋণ নেওয়ার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁদের কবিস্বভাবের বৈশিষ্ট্য, আর প্রভাবিত হয়েই তাঁরা অন্তর্গত হয়ে ওঠেন প্রবহমান ঐতিহ্যের। আমাদের দেশের আধুনিক কালের কবিরা ঐতিহাসিক পাকেচক্রে পশ্চিমমুখী হয়েছেন। আর, নির্বিচারে যে কোনো দেশের কাব্যের প্রভাব কিন্তু অন্যদেশের কাব্যের উপর পড়তে পারে না। কারণ প্রত্যেক ভাষার শব্দের ধ্বনি, অনুষঙ্গ, চিত্রলতা, অন্বয়ের চরিত্র অনন্য। তাই জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, সেই কবির কবিতার প্রভাবই অন্যদেশের কবির কবিতায় পড়তে পারে—যেখানে দুই কবিচরিত্রে খানিকটা মিল আছে। কবিস্বভাবের মিল ভাষার স্বভাবের ব্যবধানকে অনেকখানি অতিক্রম করে যেতে পারে।

যে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আমাদের গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে ঐতিহাসিক নিয়তির অমোঘতায়, সেই ইংরেজি ভাষায় আধুনিক-কালের শ্রেষ্ঠ দুই কবি ইয়েটস এবং এলিয়ট। স্বাভাবিক তাই এই দুই কবির প্রভাব আমাদের দেশের কবিতায় এসে পড়া। এলিয়টের প্রভাব বাস্তবিকই বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে আধুনিক বাংলা কবিতায়—শুধু কবিতাংশের ছায়াপাত হয়নি, তাঁর ভাষার ভঙ্গিমা প্রাণিত করেছে অনেক কবিকে, তাঁর কাব্যচিন্তা নিয়ন্ত্রিত করেছে কবিতায় আধুনিকতার বোধকে। ইয়েটসের প্রভাব কিন্তু

ততটা পড়েনি। কিন্তু তাঁর প্রভাব হয়তো আরো বেশি পড়তে পারতো। আধুনিককালের বাংলা কবিতা এই দেশের স্বাধিকার লাভের আন্দোলনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে গড়ে উঠেছে। ইয়েটসের কাব্যের জন্ম ও পরিপুষ্টিকালও তেমনি আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। শিল্পবাণিজ্যের সর্বব্যাপী প্রসার ইয়েটসের আয়ারল্যাণ্ডে ছিল না, আমাদের দেশে আধুনিক কবিতার জন্মকালেও শিল্পবাণিজ্যের সেই সর্বব্যাপী বিস্তার দেখা যায় না। ইয়েটসের কবিতায় প্রাচীন গেলিক রূপকথা, লোক কাহিনী তাদের প্রসিদ্ধ উপস্থিতি নিয়ে বর্তমান। বাংলাদেশের কবিদের কবিতাতেও এই দেশের রূপকথা, উপাখ্যান ইত্যাদি ব্যবহারের যথেষ্ট অবকাশ ছিল, কেননা কৃষিনির্ভর দেশের সেই বিস্ময়রসে পরিপূর্ণ সম্পদ সেদিনও আমরা হারিয়ে ফেলিনি। আর শিল্পময় ইংল্যাণ্ডের কবি এলিয়টের কাব্যে গীতধর্মের অব্যবহিত রূপ নেই বটে, কিন্তু গানের সঙ্গে কবিতার আত্মীয়তা বাংলা কাব্যে বা ইয়েটসের কাব্যে সহজেই চেনা যায়!

সঙ্গে ছিল কিছু আকস্মিক ঘটনার যোগাযোগ, যার জন্যে আধুনিক বাঙালী কবির পক্ষে ইয়েটসের প্রতি মনস্ক হবার কারণ ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠার অনেক আগে থেকেই এদেশের বিষয়ে ইয়েটস কৌতূহলী ছিলেন। তার প্রমাণ আছে ভারতীয় উপাখ্যান অবলম্বন করে লেখা তাঁর একেবারে প্রথম দিককার অনেক কবিতায়। তরুণ বয়সে ডাবলিনে ভারতীয় কোনো দার্শনিকের মুখে তত্ত্বকথা শুনে তাঁর মন নতুন উপলব্ধিতে আলোকিত হয়েছিল। ইংরেজি গীতাঞ্জলির সময় থেকে শুরু হয়েছিল দীর্ঘদিনব্যাপী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিতে খানিকটা বে-আইনি ভাগ বসিয়েছিলেন যদিও ইয়েটস, তবু রবীন্দ্রভাগ্যের সঙ্গে জড়িত হওয়ায় তাঁর খ্যাতি এদেশে ছড়িয়েছিল খুব। পরে তিনি মোহিনী

চ্যাটার্জি বিষয়ে একটি চমৎকার কবিতা লিখেছেন। তাছাড়া মেয়র্কাদ্বীপে বসে শ্রীপুরোহিত স্বামীর সহযোগিতায় তিনি উপনিষদের তর্জমাও করেছিলেন। ফলে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, তাঁর কবিতার প্রতি বাঙালীর আকৃষ্ট হবার কারণ ঘটেছিল। আর এই রকম আকর্ষণ থেকেই তো ক্রমে প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অনুকুল পরিবেশ ও আকস্মিকের সহযোগ সত্ত্বেও, কোনো অজ্ঞাত কারণে, ইয়েটসের প্রভাব ততটা গভীর হলো না।

বিচ্ছিন্ন প্রভাব অবশ্য মাঝে মাঝেই মেলে। যেমন ইয়েটসের 'Adam's Curse' এবং বুদ্ধদেব বসুর 'কবিজীবনী'-র পরিকল্পনা ও বক্তব্যে অনেকটাই সাদৃশ্য আছে। সেই প্রণয়িনী ও কবির সংলাপ, সেই কবিতাকলার আলোচনা আর পিছনে সেই ঘনায়মান সন্ধ্যা—'We saw the last embers of daylight die,' 'যেখানে সন্ধ্যার সোনা দিগন্তের/নীলাভ পাহাড়ে জ্বলে গলে গেল।' নারী জানে—'We must labour to be beautiful' এবং কবিও জানেন যে তিনি 'জরাজয়ী কারুকর্মে' 'ঘর্মক্ষর/কিন্তু ক্লান্তিহর পরিশ্রমে' আজীবন নিযুক্ত। এতে ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন নেই, আছে শুধু আবশ্যিক অঙ্গীকার। এবং

১ Better go down upon your marrow-bones
কাটাও আষাঢ়/পাটক্ষেতে হাঁটুজলে

২ break stones
Like an old pauper, in all kinds of weather
করাল রৌদ্রের দিনে/রাজপথে উত্তপ্ত পাথর ভাঙো

৩ For to articulate sweet sounds together
Is to work harder than all these
মাঠে যারা ধান কাটে, পাট ক্ষেতে কাটায় আষাঢ়,
রাজপথে উত্তপ্ত পাথর ভাঙে, তারাও জানে না
এই ধৈর্য, এ-নির্মম শ্রম, আমি যাতে ছন্দ বুনি।

কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন মিল থেকে প্রভাব বিষয়ে কোনো মীমাংসায় পৌঁছানো যায় না। কারণ, যেমন বুদ্ধদেব বসু নিজেই বলেছেন, 'আঙ্গিক—এমন কি আক্ষরিক সাদৃশ্যেও—প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রমাণ হয় না; প্রত্যক্ষ প্রভাব ভাবগত, মনের গভীরতম স্তরে যার ক্রিয়াকলাপ। সেই কবিরই প্রত্যক্ষ প্রভাবে পড়ি আমরা, যাঁকে আমরা অনুভব করি একাত্ম বলে, চিনতে পারি পরিচালক ও প্রতিযোগী বলে।' (রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসমালোচনা)

এই সূত্র যদি আমরা স্বীকার করে নিই তাহলে নিচের কবিতা দুটো পরপর উদ্ধৃত করলেও বলা যাবে না যে ইয়েটস ও জীবনানন্দের মধ্যে কোথায়ও সেই গাঢ় গূঢ় এবং ব্যাখ্যাতীত মনোভাবের আত্মীয়তা ছিল, যাঁর ফলে বলা যায় একটি অপরটির প্রভাবে সঞ্জাত। এই মুহূর্তে সম্ভবত, অনুকরণ ছাড়া এই সাদৃশ্যের অন্য কোনো ব্যাখ্যাই আমরা খুঁজে পাবো না।

The Scholars

Bald heads forgetful of their sins,
Old, learned, respectable bald heads
Edit and annotate the lines
That youngmen, tossing on their beds,
Rhymed out in love's despair
To flatter beauty's ignorant ear.
All shuffle there ; all caugh in ink.
All wear the carpet with their shoes ;
All think what other people think ;
All know the man their neighbour knows.
Lord, what would they say
Did their Catullus walk that way ?

'বরং নিজেই তুমি লেখোনাক একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে ; ছায়াপিণ্ড দিল না উত্তর ;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভণিতা ;
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের পর
বসে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর অক্ষর
অধ্যাপক, দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিচুটি ;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস ক্রিমি খুঁটি ;
যদিও সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো—হাঙরের ঢেউএ খেয়েছিলো লুটোপুটি।

যদি এখানেই সাদৃশ্য শেষ হয়ে যেতো তাহলে বোঝা যেতো এটা একটা বিচ্ছিন্ন অনুকরণ। কিন্তু যখন ইয়েটসের এই উদ্ধৃত কবিতারই প্রথম স্তবকের শেষ তিন চরণের রূপান্তরিত প্রতিধ্বনি আবার পাই জীবনানন্দে—

একবার নক্ষত্রের পানে—একবার বেদনার পানে
অনেক কবিতা লিখে চলে গেল যুবকের দল ;
পৃথিবীর পথে পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে
শুনিল আধেক কথা ;—এই সব বধির নিশ্চল
সোনার পিত্তল মূর্তি…। (ইহাদেরি কানে)

তখন ? তারপর একসময় আবিষ্কার করি ইয়েটসের 'The White Birds' এবং জীবনানন্দের 'আমি যদি হতাম' কবিতাদুটোকে, আর পেয়ে যাই এই সব সদৃশ চরণ—

১ I would that we were, my beloved, white birds on the form of the sea !

আমি যদি হতাম বনহংস/বনহংসী হতে যদি তুমি ;
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে…

২ Where Time would surely forget us, and Sorrow
come near us no more;

আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না,
থাকত না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার;

'মৃত্যুর আগে' কবিতার ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার পূর্বাভাস পাই ইয়েটসের 'The Falling of the Leaves' নামক কবিতায়।

Autumn is over the long leaves that love us,
And over the mice in the barley sheaves;
Yellow the leaves of the rowan above us,
And yellow the wet wild strawberry leaves.

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,...

পরেই দেখি 'O curlew, cry no more in the air'—ইয়েটসের একটি চরণ বিস্তার পেয়েছে জীবনানন্দের 'হায় চিল' কবিতায়--

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!

'Because your crying brings to my mind/Passion-dimmed eyes...' জীবনানন্দের কবিতায় হয়েছে 'তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে'। দুজনেই পাখিকে কান্নায় ক্ষান্তি দিতে বলেছেন, কারণ 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে/ বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?' কারণ 'There is enough evil in the crying of the wind.'

এই সব দেখে শুনে অপ্রতিরোধ্য সন্দেহ জন্মায়, এই সব সাদৃশ্য আকস্মিক নয়, প্রকরণগত বা আক্ষরিক মাত্র নয়—এই সাদৃশ্যের মূল চলে গেছে কাব্যের জন্মের সেই অন্ধকার অনাবিষ্কৃত যোনিতে—যেখান থেকে অভিজ্ঞতা ও স্বজ্ঞার সমন্বয়ে জাত প্রতিভা তার ছটায়

ইমেজ নিয়ে আসে, শব্দ নিয়ে আসে, সুর নিয়ে আসে। উপলব্ধির আত্মীয়তা থেকেই আসে এই সাদৃশ্য, তাই প্রভাব আর মৌলিকতার অভাব এক কথা নয়।

I sing of the ancient ways. (ইয়েটস)

সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে (জীবনানন্দ)

দুজনে যখন অতীতচারী, তখন সেই অতীত গতিমুখর নয়, প্রাণচঞ্চল নয়, সেই অতীতের অতিক্রান্ত প্রাঙ্গণে জীবন স্পন্দনহীন হয়ে স্থিরচিত্রের বিশুদ্ধতা অর্জন করেছে। জীবনানন্দের প্রাচীন প্রাসাদে মূল্যবান আসবাব আছে, পারশ্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিনতরঙ্গের নিটোল মুক্তাপ্রবাল আছে, অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা, লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ আছে, শুধু মানুষ নেই, মানুষের পদশব্দ নেই, কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়। গ্রীক স্বর্ণকারেরা হাতুড়ি দিয়ে পিটে তাল তাল সোনাকে যে অক্ষয় অব্যয় আকৃতি দিতো, সেই রকম ভাস্কর্যের অধিকার 'artifice of eternity' যেন জীবনানন্দও অর্জন করতে চেয়েছেন। সময়ের পরপারে যে অতীত তাই অবয়ব পায় ইয়েটসের বাইজানটিয়াম নিনেভেতে। আর বিম্বিসার অশোকের জগতের ধূসরতা, দূর বিদর্ভ নগরের অন্ধকার বনলতা সেনের পিছনে অনিত্যতার পর্দার মতো কাঁপতে থাকে এবং তার ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বকে মূল্যবান করে তোলে। শ্যামলীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে শূন্য সব বন্দরের ব্যথা।

এই শান্ত অচঞ্চলতা, নির্বেদ, বিষাদ, সময়ের অমোঘ গতি দেখে ইচ্ছার বিবর্ণতা—এই সব জীবনানন্দের কবিতায় সাকার হয়েছে শীত আর হেমন্ত ঋতুতে, ইয়েটসের কবিতায় winter এবং autumn-এ। বারবার এই শোভাহীন, সম্পদশূন্য ঋতুর কথা; মাঠে যখন ফসল নেই, গাছে যখন পাতা নেই, রোদের রং যখন বিবর্ণ। সেই ঋতুই

এঁদের আকর্ষণ করে যখন বিশ্বচরাচর মৃতকল্প দিনগুলো একে একে যাপন করে।

১ The trees are in their autumn beauty,…(The Wild Swans at Coole)

চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে/হেমন্ত আসিয়া গেছে…(দুজন)

২ Like the pale waters in their wintry race…(The Rose of the World)

আকাঙ্ক্ষার আলোড়নে চলিতেছে বয়ে/হেমন্তের নদী…। (অনেক আকাশ)

এই পীত বর্ণ প্রকৃতি এবং নীরক্ত অতীতের মধ্যে সম্পর্কের নিবিড়তার প্রমাণ জীবনানন্দের নাভানা সংস্করণ শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনের অন্তর্গত 'আছে' কবিতাটি। নাম 'আছে'—ব্যাকরণে এই পদটিকে ক্রিয়াই বলে, কিন্তু তার মধ্যে ক্রিয়ার ক্রিয়াশীলতা নেই, গতি নেই; অচঞ্চল অস্তিত্বকে ঘোষণা করেই তার কাজ সমাপ্ত হয়। চৈত্রের নিবন্ত দিনে মাঠের মধ্যে শয়ান কবি তাঁর চারিদিকে অব্যবহিত প্রকৃতি এবং পৃথিবীর রূঢ় নষ্ট সভ্যতার কথা পর্যালোচনা করেছেন—

উরময় চীন ভারতের গল্প বহিঃপৃথিবীর শর্তে হয়ে গেছে শেষ;
জীবনের রূপ আর রক্তের নির্দেশ
পৃথিবীর কাম আর বিচ্ছেদের ভূমা—মনে হয়—এক তিলের সমান;
কিন্তু এই চেয়ে থাকা, স্থিতি, রাত্রি, শান্তি—অফুরান।

এই আছে, থাকা, স্থিতি, রাত্রি, শান্তি, এ সব কি জীবনের ভূগোল থেকে নির্বাসিত অন্য কোনো দেশের কথা—তার অঙ্গে অঙ্গে তবে কি মৃত্যুর প্রত্যাদেশ? চিন্তা, সংশয়, নির্বেদ, দ্বিধার অসহনীয় মানবিক বোঝার ভারে উৎপীড়িত হয়েই কি প্রার্থিত হয় এই পরম কাঙ্ক্ষিত বিশুদ্ধ থাকা, যা না-থাকারই অন্য নাম?

আরো এক ঝাঁক স্বতন্ত্র বিশিষ্ট ইমেজ এই দুই কবির কাব্যে বারবার উপস্থিত হয়েছে। এত বারবার যে মনে হয়, তারা যেন কবিকে

কিছুতেই অব্যাহতি দেয় না। তার কাছে পুনঃ পুনঃ স্বপ্নগ্রস্তের মতো কবিকে ফিরে আসতেই হয়, এবং ফলে, একই ইমেজকে তাৎপর্যের নতুন নতুন স্তরে মণ্ডিত করে কবিকে উপস্থিত করতে হয়। কেননা কবি কখনো কখনো বাধ্যবাধকতার বন্ধনে বন্দী। সেই এক ঝাঁক ইমেজ জন্তু ও পাখির—পবিত্রকরুণ হরিণহরিণী, বনহংসহংসীর দল, পঙ্কিল রাত্রির মতো ঝুলন্ত অথবা উড়ন্ত বাদুড়, বিজ্ঞ সমালোচকের মতো জ্ঞানবৃদ্ধ পেঁচা, হিংস্র শকুন এবং সবচেয়ে বেশি বীভৎস শূকর। ইয়েটস ও জীবনানন্দের কবিতায় দেখি কত অজস্রবার চিল-শকুনের ছায়া, হরিণহরিণীর দীর্ঘশ্বাস!

১ The delicate-stepping stag and his lady sigh.

(The Ragged Wood)

এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

(শিকার)

২ Where mouse-grey waters are flowing···

(The Pity of Love)

নেউল ধূসর নদী আপনার কাজ বুঝে প্রবাহিত হয়।···(আবহমান)

৩ And talked of the dark folk who live in souls
Of passionate men, like bats in dead trees,···

(To Some I have Talked···)

বাদুড় আঁধার ডানা মেলে হিম জ্যোৎস্নায় কাটিয়াছে রেখা/আকাঙ্ক্ষার ;

(রূপসী বাংলা)

৪ ···a bat rose from the hazels
And circled round him with its squeaky cry···

(The Phase of the Moon)

একটি বাদুড় দূর স্বোপার্জিত জ্যোৎস্নার মনীষায় ডেকে নিয়ে যায়
যাহাদের যতদূর চক্রবাল আছে লভিবার। (কবিতা)

৫ He bade his heart go to her
When the owls called out no more

(The Cap and Bells)

তখন হয়তো মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে। (কুড়ি বছর পরে)
পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে—(বুনো হাঁস)

সমস্ত বিরূপ বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করে ইয়েটস্ মন্তব্য করেছেন 'Preposterous pig of a world', আর জীবনানন্দ বলেছেন—

শত-শত শূকরের চিৎকার সেখানে
শত-শত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর;
এই সব ভয়াবহ আরতি। (অন্ধকার)

জীবনানন্দের কবিতার হেমন্ত প্রান্তর ঝিঁঝিঁ-র ডাকে মুখর, ইয়েটসের কবিতায় যে 'cricket' ডাকে তার 'chattering, wise and sweet'। একজনের কবিতার অনেক চরণের উপর 'dew' ঝরে পড়ে, অন্যজনের নায়কনায়িকা বিগত প্রেমের ইতিহাস রোমন্থন করতে করতে যে মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যায় সে মাঠের প্রতিটি ঘাস শিশিরে ভেজা।

জানি না কী কারণে স্বপ্নগ্রস্তের মতো এই দুই কবিকে বারবার এই সব পশুপাখির ইমেজের কাছে ফিরে আসতে হয়। এবং লক্ষ্য করার বিষয় এই যে এদের মধ্যে অনেকগুলিই কবিপ্রসিদ্ধিলোকে উত্তীর্ণ সুন্দর শোভন প্রাণী নয়, অনেকগুলি বীভৎস কুৎসিত, অনেকগুলি যাদের স্পর্শ মানুষ এড়িয়ে চলে। স্বপ্নের মতো কবিতাও আপাতত অযৌক্তিক, তাই কি সভ্য মানুষ যা সচেতন জীবনে এড়িয়ে চলে তাই পাহারাদারের নিষেধ ডিঙিয়ে হাজির হয় স্বপ্নে অথবা কবিতায়? নাকি এর মধ্যে মিশে আছে সেই সব টোটেম-প্রাণীর স্মৃতি, কৌমসমাজে যাদের ভূমিকার কথা আমরা নৃতত্ত্ববিদদের বিবরণ থেকে জানতে পারি। যেমন স্বপ্নসঙ্কুল অন্ধকারে তেমনি কবিতার জন্মের মুহূর্তে টোটেম-পূজার অনুষঙ্গ ও স্মৃতি জেগে ওঠা বিচিত্র নয়।

তাছাড়া স্বপ্নে যখন আমরা মানুষকেও দেখি তখন পুরো মানুষকে দেখি না, নাক মুখ চোখ যথাযথ থাকে না, মুখশ্রীর রেখা ও বিভঙ্গ শারীরতত্ত্বের সঙ্গে অনেকাংশেই মেলে না। কেননা স্বপ্নের জগতে

পুরো মানুষ মর্যাদা পায় না, সেখানে একটা বিশেষ ভানকে বিশেষ তাৎপর্য দেবার জন্যে মুখোশের মতো মানুষের মুখ বস্তু-নিরপেক্ষ হয়ে যায়। স্বপ্নের বিহ্বল জগতের মতো জীবনানন্দ-ইয়েটসের কাব্যলোকে মুখোশপরা ভাঁড় আর ক্লাউনের মেলা। সং আর আবহমানের ভাঁড়, 'পাড়াগাঁর ভাঁড়', 'রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সং' একদিকে, অন্যদিকে 'painted players' ও 'clown' সহাস্য বিদ্রূপের মতো বিরাজমান ইয়েটসের 'three old beggars' এবং জীবনানন্দের 'তিনজন আরো আইবুড়ো ভিখারী' সেই ভাঁড়েরই বিকল্প। আর স্বপ্নের মধ্যে একটা সিঁড়ির দৃশ্য আমরা নিজেরাই ব্যক্তিগত জীবনে কতবার দেখেছি; মনোবিকলনকারীদের সংগৃহীত বিবরণে কতবার সেই সিঁড়ির বর্ণনা আমরা পেয়েছি। নিজের 'The Winding Stair and Other Poems' সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ইয়েটস বলেছেন 'I have used towers, and one tower in particular, as symbols and compared their winding stairs to the philosophical gyres······Shelley uses towers constantly as symbols, and there are gyres in Swedenborg, and in Thomas Aquinas and certain classical authors.' (কাব্যসংকলনে কবির টীকা)।

> I declare this tower is my symbol ; I declare
> This winding, gyring, spiring treadmill of a stair
> is my ancestral stair ;···(Blood and the Moon)

জীবনানন্দের কাব্যভূমিতেও এই ঘূর্ণ্যমান সিঁড়ির দেখা বারেবারে পাই।

> সেই সিঁড়ি ঘুরে প্রায় নীলিমার গায়ে গিয়ে লাগে,
> সিঁড়ি উদ্ভাসিত করে রোদ ;
> সিঁড়ি ধরে ওপরে ওঠার পথে আরেক রকম
> বাতাস ও আলোকের আসা-যাওয়া স্থির করে কি অসাধারণ
> প্রেমের প্রয়াণ ? (মানুষের মৃত্যু হলে)

দুইজন আলাদা ভাষার কবি, কিন্তু তাঁদের ব্যবহৃত ইমেজ থেকে প্রমাণ হয় তাঁরা, অন্তত প্রথম পর্যায়ে, নিকটবর্তী লোকের প্রতিবেশী ছিলেন। এই অপ্রতিরোধ্য ইমেজ কোথা থেকে কবি পান ; বরং বলি, কোথা থেকে কবির কাছে আসে ? এলিয়ট উত্তরে বলেছেন 'It comes from the whole of his sensitive life since early childhood' (The Use of Poetry and the Use of Criticism)। রিলকে একই কথা অবিস্মরণীয় ভাবে বলেছেন মল্‌টে লৌরিডস্‌ বিগ্‌গের নোটবইয়ে। কিন্তু আগেই ইঙ্গিত করেছি ইমেজের উৎস শুধু কবির ব্যক্তিগত চৈতন্যের শৈশব নয়, জাতিগত চৈতন্যের শৈশবও বটে। কবি ইয়েটস্‌ 'ancestral night'-এর কথা বলেছেন, যে অন্ধকার থেকে আলোর পদ্মের মতো ইমেজ জন্ম নেয়। য়ুং এই রকম ইমেজেরই নাম দিয়েছেন 'primordial image'। ব্যক্তিচৈতন্যের নিম্নতল থেকেই হোক, আর য়ুং-কথিত 'racial psyche'-র অন্ধকার থেকেই হোক, যে উৎস থেকেই তার উত্থান হোক 'image is a concentrated expression of the total psychic situation'। জীবনানন্দ ও ইয়েটসের কবিস্বভাবের যে সাদৃশ্য আর চিহ্ন রয়ে গেছে তাঁদের ইমেজের মধ্যে।

অস্বাভাবিক তাঁদের দিব্যদৃষ্টির সংহত রশ্মি ; সেই রশ্মিপাতে বাস্তবের পরিচিত চেহারা অপরিচিত হয়ে যায়। বাস্তব হয় পরাবাস্তব।

> নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
> লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
> তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
> বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত। (রাত্রি)

চর্মচক্ষু দেখে নগর আর নগরের সুবেশ সভ্য মানুষ, অন্তশ্চক্ষু দেখে লিবিয়ার জঙ্গলে বিচরমান শ্বাপদের দল। এই বহিরাবরণভেদী দিব্যদৃষ্টির কাছে জগতের সামগ্রিক চেহারা তার সমস্ত যন্ত্রণাদায়ক ঘৃণ্যতা নিয়ে ধরা পড়ে যায়। দুজনের কাছেই ধরা পড়ে যায়

'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন,' ধরা পড়ে যায়, 'দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে ;/গ্রামপতনের শব্দ হয়'। ভাঙে, খুলে যায় অস্তিত্বের খিল।

Things fall apart ; the centre cannot hold ,
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned ;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity. (The Second Coming)

এরই কাছাকাছি এক জগতের চেহারা দেখেছেন জীবনানন্দ খানিকটা আলাদা ভঙ্গিতে—

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সব চেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া। (অদ্ভুত আঁধার এক)

চতুর্দশ শতকের একটা গানের প্রতিধ্বনি করে ইয়েটস বলেছেন—'I am of Ireland and the Holy Land of Ireland'। 'রূপসী বাংলা'-য় আবহমান বাংলাদেশকে ডেকে জীবনানন্দ আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন 'তোমার সন্তান' বলে। একজনের কবিতা আয়ারল্যাণ্ডের জল নদী এবং যে মৎস্যজীবী প্রভাতে চলেছে 'to cast his flies', তার লোককাহিনী, তার আত্মোৎসর্গকারী বীর বীরাঙ্গনাদের মহিমাকীর্তনে সততই ব্যাপৃত ; অন্যজন তেমনি এই বঙ্গভূমির বিচিত্র গাছফল, বিচিত্র পাখি, শৈশবে-শোনা রূপকথা ও লোককাহিনীর মধ্যে দেশের চিন্ময়ী অস্তিত্বের ধ্যান করেছেন। তাছাড়া দুজনেরই কবিতার উন্মেষ ও পরিণতির কাল দুই দেশের স্বাধিকার আন্দোলনের সমসাময়িক। ইয়েটসের কবিতায় দেশনেতা পার্নেল, সেই 'unquiet wanderer'-এর যে ভূমিকা, জীবনানন্দের

কবিতায় সেই ভূমিকা দেশবন্ধুর। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও, কবি হিসেবে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের এখানেই প্রমাণ যে তাঁদের দেশমূলক কবিতায় জাতীয়তাবাদের জ্বরোত্তাপ কখনো প্রকাশ পায় নি।

দেশকে ভালোবাসতেন, কিন্তু রাজনীতি বরং ইয়েটসের অপছন্দই ছিল। তিনি জানতেন বিপ্লবের ফলে শাসকের পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু অন্যায় শাসন থামে না; জানতেন পার্নেলকে আজ যারা জয়ধ্বনিতে সংবর্ধিত করছে, পার্নেল জয়ী হলেও তাদের পথের ধারে বসে পাথর ভাঙতে হবে। এও তিনি জানতেন, যদি কোনো বৃদ্ধকে হিমের রাত্রে, অথবা কোনো কিশোরীকে যদি নবযৌবনের মুগ্ধ আলস্যে খুশি করা যায় তবে সেই-ই কবির পক্ষে যথেষ্ট, কেননা, 'he has no gift to set a statesman right'। তবু শাসকশক্তির দ্বারা উৎপীড়িত আয়ারল্যাণ্ডের রক্তাক্ত দিনে তিনি দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন নি—তাই তাঁকে বারবার রাজনৈতিক উত্তেজনার পাশে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। উত্তেজনায় অংশ নিয়েছেন মানুষ হিসেবে; সেই উন্মাদনাকে অমর কবিতায় রূপ দিয়েছেন বারবার, যেমন ঈস্টারবিদ্রোহের ঘটনাকে। ব্ল্যাক এ্যাণ্ড ট্যানের পাশবিক উৎপীড়ন নিয়ে লিখেছেন 'Nineteen Hundred and Nineteen' কবিতায়—

> Now days are dragon-ridden, the nightmare
> Rides upon sleep : a drunken soldiery
> Can leave the mother, murdered at her door,
> To crawl in her own blood, and go scot-free ;···

জীবনানন্দ কোনোদিনই রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে প্রবেশ করেন নি, বরং স্পষ্ট বলেছেন 'নির্মল কোনো জননীতি নেই'। কিন্তু বিশ শতকে বাস করে অনুকম্পায়ী মানুষ রাজনীতিকে এড়াবেন কী করে! কারণ, ইয়েটস্ যতোই অস্বীকার করুন, মান্-এর এইকথা পুরোপুরি সত্য যে বর্তমান শতাব্দীতে মানবনিয়তি রাজনৈতিক চেহারা নিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং জীবনানন্দও লেখেন—

কুইসলিং বানাল কি নিজ নাম—হিটলার সাত কাণাকড়ি

দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হয়ে গেল লাল ;

মানুষেরই হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল ;

পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি। (সৃষ্টির তীরে)

তিনি দেখেন 'তুচ্ছ নদী-সমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে/রয়ে গেছে মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, অনন্ত কনভয়—'। দেশের মধ্যে দেখেছেন ইয়াসিন হানিফ মকবুল একদিকে, অন্যদিকে গগন বিপিন শশী—'মন্বন্তর দাঙ্গা দুঃখ নিরক্ষরতায়' বিভ্রান্ত বিপর্যস্ত।

দেশের রাজনৈতিক ব্যাপার তাঁর কবিতায় কম। দেশের প্রতি ভালোবাসা অনেক বেশি।

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে—সব চেয়ে সুন্দর করুণ ;

সেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল ;

সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল ;

সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ ;···

এই সুন্দর করুণ ভূখণ্ডের প্রতি ভালোবাসা 'রূপসী বাংলা'য় অনর্গল। এই আবেগ-নম্র রচনাবলীর অন্তরালে এক অন্তঃশীল প্রেমের স্পন্দন যখন অনুভব করি, তখন ইয়েটস্ নয়, অন্য একজন বাঙালী সাহিত্যশিল্পীর কথা, এখানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে, মনে পড়ে যায়। বিভূতিভূষণের কথা। মনে না পড়াই অস্বাভাবিক। কেন না, যে-দেশের তুচ্ছ পরিচিত আকন্দ বাসকলতা, শ্রাবণের বিস্মিত আকাশ, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত জীবনানন্দের মন ভুলিয়েছিল, সেই দেশের তুচ্ছাতিতুচ্ছের প্রতি সন্তপ্ত ভালোবাসা বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'-র পাতায়-পাতায়। আবার দুটো বই-ই বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় ছায়াচ্ছন্ন। প্রেমিকার কাছ থেকে প্রেমিকের বিদায়ের মতোই এ বিদায় দীর্ঘ, গম্ভীর-করুণ, বিষণ্ন-মধুর।

কোথায় চলিয়া যাব একদিন ; তারপর রাত্রির আকাশ

অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে ঘুরে যাবে কতকাল জানিব না আমি ;

জানিব না কতকাল উঠানে ঝরিবে এই হলুদ বাদামী—
পাতাগুলো—মাদারের ডুমুরের—সোঁদাগন্ধ—বাংলার শ্বাস
বুকে নিয়ে তাহাদের ;···

মমতামধুর 'পথের পাঁচালী'-র অন্তিমেও সেই এক বিষাদ—

> জনহীন ভিটার উঠান-ভরা কালমেঘের জঙ্গলে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিবে, গভীর রাত্রে পিছনের ঘন বনে জগডুমুর গাছে লক্ষ্মী-পেঁচার রব শোনা যাইবে।···কেহ কোনদিন সেদিক মাড়াইবে না, গভীর জঙ্গলে চাপা-পড়া মায়ের সে লেবু গাছটার সন্ধান কেহ কোনদিন জানিবে না, ওড়-কলমীর ফুল ফুটিয়া আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িবে, কুল নোনা মিথ্যাই পাকিবে, হলদে-ডানা তেড়ো পাখিটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে। বনের ধারে সে অপূর্ব মায়াময় বৈকালগুলি মিছামিছি নামিবে চিরদিন।

জীবনানন্দেও এই নশ্বরতার অনুভূতি বারে বারে—'হেমন্তে পাকিবে ধান, আষাঢ়ের রাতে/কালো মেঘ নিঙড়ায়ে সবুজ বাঁশের বন গেয়ে যাবে, উচ্ছ্বাসের গান/সারারাত', কিন্তু তবু 'কোনো দিন দেখিব না তারে আমি'। আমি থাকব না, শুধু এই নয় ; দুজনের বিষণ্ণ বর্ণনার মধ্যে যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে, কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের এই চেহারা যে লুপ্ত হতে চলেছে তারও ইঙ্গিত।

শেষ পর্যায়ে এসে দুইজন অন্যপথ, ভিন্নমতি। অথচ 'desolation of reality'-র কথা ইয়েটসের মতো জীবনানন্দও জানতেন—জানতেন যে তার বহু পরিচয় তাঁর কাব্যের চরণে-চরণে ছড়ানো আছে। কিন্তু জীবনের শেষে ভগ্নস্তূপে পর্যবসিত সভ্যতার অন্তরাল থেকে, বড় বড় নগরীর বুক ভরা ব্যথার অভ্যন্তর থেকে, 'লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ, মৃত গলিত আমিষ গন্ধ ঠেলে' তিনি 'অন্তিম মূল্যে'র অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছিলেন। স্বাদগন্ধরূপময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চরাচরের অব্যবহিত প্রকাশের চেষ্টায় যে কাব্য নিরলস ছিল তার কিছু কিছু চিহ্ন বেলাবসানের দিনেও রয়ে গেল বটে, কিন্তু তা নিরলঙ্কার হয়ে

এলো ; যে উত্তেজিত ইমেজের প্লাবন একদিন দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যেতো তাও স্তিমিত হলো। এখন দার্শনিক চিন্তা ও সত্যোপলব্ধিকে তিনি কাব্যের কেন্দ্রে নিয়ে এলেন।

> যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল ;
> মানুষের লালসার শেষ নেই ;
> উত্তেজনা ছাড়া কোনোদিন ঋতুক্ষণ
> অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ
> অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
> নেই। (এই সব দিনরাত্রি)

জগৎ সংসারের এই তমাচ্ছন্ন চেহারা তিনি অনেক দিনে আগে থেকেই জানতেন। এবার তিনি 'তিমিরবিনাশী' হতে চাইলেন।

তবে বৈষম্য বিক্ষোভের অন্ধকার থেকে 'আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়' সুষমাময় শান্তিতে প্রস্থানের ইচ্ছা একা জীবনানন্দের বিশেষত্ব নয়। অন্য অনেক বড় কবিই 'আরো বড় চেতনার লোকে' প্রবেশ করতে চেয়েছেন। জীবনানন্দের শেষ পর্বে অন্তিম গুণ, চরম মূল্য অনুসন্ধানের যে চেষ্টা, অস্তিত্বের সমুদ্রতীরে সেই পরশপাথর খোঁজার চেষ্টায় তিনি একা নন। জীবনের ভয়াবহতা, নেতির প্রলোভন, নরকের প্রতীকী কটাহে নিরুপায়-দাহ উত্তীর্ণ হয়ে মহাকবিরা দ্বন্দ্বাতীত সুষমার আলোকলোক খুঁজেছেন ; জীবনানন্দের মতো বলেছেন 'জলও কোন্ অতীতে মরেছে ; তবুও নবীন নুড়ি—নতুন উজ্জ্বল জল নিয়ে আসে নদী'। চরমে এই আশাভরসাময় মীমাংসায় পৌঁছুনো—একি মান্-এর ভাষায় 'contrivance' মাত্র। অন্য বড় কবির ক্ষেত্রে এই রূপান্তর যেমন পর্যায়-পরম্পরায়, জীবনানন্দের ক্ষেত্রে যেন সেই অমোঘতা নেই। নিজেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে—'শান্তি বা সিরিনিটির সুরে কবিতা বেঁধেও সত্যিকারের সৃষ্টিপ্রেরণার অভাব থাকলে হয়তো তাও নিষ্ফল হয়ে যায়।' সৃষ্টিপ্রেরণা কি ছিল, না ব্যাপারটা 'contrivance'—তার জবাব দেওয়া মুশকিল। তবে তিনি নিজে বলোছলেন—'আমিও

সাময়িকভাবে কোনো কোনো জিনিসকে 'চরম' বলে মনে করে নিয়েছি জীবনের ও সাহিত্যের তাগিদে, মনকে চোখ-ঠার দিয়ে মাঝে মাঝে টেম্পরারি সস্‌পেনশন অব ডিজবিলিফ হিসেবে।...সময় প্রকৃতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা লাভ করতে চেষ্টা করেছি।' (কবিতাপ্রসঙ্গে)

জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতার (নাভানা সংস্করণ) শেষে জীবনী-পঞ্জীতে বলা হয়েছে, তিনি শৈশবে 'প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে পিতার উপনিষদ আবৃত্তি' শুনতেন। উপনিষদের সেই আস্তিক্যবাদী মন্ত্রগুলিই কি জীবনানন্দকে ফিরিয়ে আনলো শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর, এই সব ভয়াবহ আরতির থেকে দূরে? অথবা যে নেতির, যে শূন্যের সাম্রাজ্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা মানবনিয়তির শেষ পরিণাম বলে মেনে নিতে তাঁর বাধলো। শাশ্বত মূল্যের খোঁজে এই যে তাঁর প্রস্থান এ কি রঙফেরাহীন পৃথিবীর দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠার ফল? অথবা হয়তো তাঁর কাব্যরচনার এই শেষ ফসলকেও তিনি পূর্বকবিতাবলীর মতো অনিবার্য মনে করেছিলেন। সে যাই হোক, 'আমরা সূর্যের যেই প্রাণ উজ্জ্বলতা/চীনে কুরুবর্ষে গ্রীসে বেথলেহেমে হারিয়ে ফেলেছি'—সেই প্রাচীন মহারশ্মির তিনি অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন।

উত্তরপর্যায়ে ইয়েটসের কবিতাও নিরলঙ্কার হয়ে এলো। কিন্তু তাঁর কবিতার এই নিরলঙ্কার আস্থাবচনকে উচ্চারণ করার জন্যে নয়। এই নিরলঙ্কারের উদ্দেশ্য, দ্বন্দ্বের চেহারাকে আরো শুদ্ধতায়, আরো ভাবাবেগবর্জিত স্পষ্টতায় দেখানো। ইয়েটসের এই শেষ পর্যায়ের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে পাউণ্ড বলেছেন, এক ধরনের কাব্য আছে যা মূলত সঙ্গীত, কিন্তু ভাষার মধ্যে ভাষ্য খুঁজে ফেরে, আর এক ধরনের কাব্য আসলে ভাস্কর্য, কিন্তু শব্দ ও বাক্যের মধ্যে উচ্চারিত হতে চায়। ইয়েটসের উত্তরকাব্যের স্বভাব দ্বিতীয় ধরনের। শেষ পর্যায়ে তাঁর রচনা মনে হয় যেন 'becoming gaunter

seeking greater hardness of outline' (পাউণ্ড)। কিন্তু ভঙ্গির এই পরিবর্তন শুধু কলাকৌশলের পরীক্ষা নয়—বিষয়ের রূপান্তরের সঙ্গে মিশে আছে এই রূপকল্পের পরিবর্তন। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় বললে, 'এইবার হঠাৎ তাঁর বীভৎস ভীতি ভাঙলো; তিনি নিজেকে এতখানি বশে আনলেন যে পশুত্বের পুনরাবর্তনেও তাঁর আপত্তি রইলো না' (ডব্লু. বি. য়েটস ও কলাকৈবল্য)। প্রেততত্ত্ব ইত্যাদি বিচিত্র উপকরণ তিনি কবিতায় উপাদান হিসেবে ব্যবহার করলেন বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত বা বিশ্বগত কোনো দর্শনে তিনি সান্ত্বনার আশ্রয় নিলেন না। স্বনির্বাচিত নাস্তির মরুভূমিতে তিনি সঙ্গীহীন পরিব্রাজক। তিনি জেনেছেন মানবধমনীতে প্রবহমান ক্ষিপ্ততা এবং পঙ্ক, শেষ পর্যন্তও তিনি মনে করেন 'The lion and the virgin,/The harlot and the child'-এর বিরোধ সঙ্গতিতে মিটে যায় না। সর্বত্রই বৈষম্যের ব্যঞ্জনা। যারা সুষমা ও সঙ্গতি খুঁজে বেড়ায় তাদের নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করার জন্যেই প্রকৃতি যেন ব্যঙ্গের আয়োজন করে—

> But love has pitched his mansion in
> The place of excrement.
>
> (Words for Music Perhaps VI)

অবরুদ্ধ এবং অবসিতপ্রায় কামের পঙ্কময় জলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ইয়েটসের শেষ জীবনের প্রার্থনা—'Grant me an old man's frenzy', উন্মত্ত ব্লেকের মতো বা উন্মাদ রাজা লিয়রের মতো। আর এই 'frenzy'-র আবর্ত থেকে কামাসক্ত বৃদ্ধের অপরিতৃপ্ত কামের জ্বরতপ্ত দুঃস্বপ্নের মতো তাঁর কবিতার শেষ লগ্নে এসেছে অজস্র যৌন ইমেজ। সেই সব ইমেজ অপরিতৃপ্তি, বিকারগ্রস্ত শূন্যতাকেই কবিতায় সাকার করেছে। সমস্ত ভানমুক্ত হলে, মানুষের অবশ্যম্ভাবী নিয়তি কী, সেই কথাই এই কবি বিষামৃতময় কাব্য লিখে জানিয়ে গেছেন। তাঁর কাব্যসংকলনের সব শেষের 'Under Ben

Bulben' কবিতায় তিনি মৃত্যুর পরে তাঁর স্মরণশিলায় খোদাই করার জন্য লিখে গিয়েছেন—'Cast a cold eye/On life, on death,/ Horseman, pass by.'। তিনি চেয়েছেন, জীবনকে এবং মৃত্যুকে আবিলতামুক্ত ঠাণ্ডা চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হোক। তিনি নিজেও বাষ্পহীন ভানমুক্ত 'cold eye' দিয়ে জীবনকে পর্যালোচনা করেছিলেন, মৃত্যুকেও।

জীবনানন্দের চার-অধ্যায়

জীবনানন্দের কবিতার সালতারিখের ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। তাঁর বইয়ে রচনাকাল দেওয়া নেই। কালগত ক্রমান্বয় বজায় রেখে কবিতা বইতে সাজানো নেই, আবার রচনার ক্রম অনুযায়ী বইগুলোও প্রকাশিত হয়নি তাঁর। একই সময়ের কবিতা নানা বইয়ে ছড়িয়ে আছে। যেমন ১৯৩৬-এ প্রকাশিত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র রচনাকাল ১৯২৬-১৯৩০, ১৯৪৪-এ প্রকাশিত 'মহাপৃথিবী'-র রচনাকাল ১৯২৯-১৯৪২, আবার ১৯৪৮-এ প্রকাশিত 'সাতটি তারার তিমির'-এর রচনাকাল পাচ্ছি ১৯২৮-১৯৪৪। চল্লিশের দশকে লেখা কিছু কবিতা আছে 'মহাপৃথিবী'-তে, কিছু 'সাতটি তারার তিমিরে', আবার কিছু মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'বেলা অবেলা কালবেলা'-য়। অন্য ব্যাপারেও নানা অব্যবস্থিততার পরিচয় মেলে। নতুন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে আদি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র সমকালীন কিছু 'ধূসরতর' কবিতা সংযুক্ত করা হয়েছে। নাভানা সংস্করণ শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশকালে কবির জীবদ্দশায়, এবং পরেও, কিছু গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা গৃহীত হয়েছিল। 'বনলতা সেন' কবিতাভবন সংস্করণের বারোটি কবিতার সব কয়টি ১৯৪৪-এ প্রকাশিত 'মহাপৃথিবী'-র অন্তর্গত হয়েছিল। কবির জীবদ্দশায় যখন সিগনেট-কর্তৃক 'বনলতা সেন' আলাদা বই হিসেবে বেরোল ১৯৫২ সালে, তখন সেই বারোটি কবিতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আরো আঠারোটি অন্য কবিতা যোগ করা হয়েছিল। তাই 'মহাপৃথিবী'-র যখন নতুন সিগনেট সংস্করণ বেরোল তখন সিগনেট-সংস্করণ 'বনলতা সেন'-এর অন্তর্গত আদি 'মহাপৃথিবী'-র বারোটি কবিতা বর্জিত হলো এবং বইটির পূর্ববৎ আকার দেবার জন্যে শূন্যস্থান

পূরণে গৃহীত হলো উনিশটি তৎকালে লেখা কবিতা। আজো বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁর অনেক কবিতা ছড়িয়ে আছে গ্রন্থিত হবার অপেক্ষায়। এই সব অসংলগ্নতা, যদিও মনে হয় জীবনানন্দের পক্ষে চারিত্রিক এবং অনিবার্য, তবু তাঁর কবিতার পরম্পরা ধরার পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করে। সেই পরম্পরাসূত্র ঠিকমতো না মেলায় তাঁর কবিতার 'বিপুলজটিল' অভিজ্ঞতা কী ভাবে স্তর থেকে স্তরান্তরে সন্ন্যস্ত হলো, কী ভাবে উন্মেষিত হলো তাঁর জগচ্চিত্র, তা বুঝে নিতে সময় নেয়।

এই অসুবিধা অতিক্রম করার উপায় হচ্ছে বাইরে থেকে সনতারিখের হদিস না খুঁজে উল্টো দিক থেকে এগোনো, অর্থাৎ কবিতার ভিতরের দিক থেকে তাকানো। যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো তন্নিষ্ঠ গবেষক 'মাংস কৃমি' খুঁটে সেই কালানুক্রমিকতার পুরো চেহারাটা স্পষ্ট করে না দিচ্ছেন, ততোদিন ভিতরের দিকে তাকানোই ভালো। আমি অবশ্য সমসাময়িক উল্লেখের সূত্র ধরে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ যোগাড় করার কথা ঠিক বলছি না। আমি বলছি জগচ্চিত্রের ক্রম-উল্লেখ বুঝে নিয়ে তার থেকে তারিখের ইশারা খুঁজে নেবার কথা। এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করি নাভানা-প্রকাশিত 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'-য় কবির ভূমিকা। তিনি লিখেছিলেন 'আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানা রকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো-কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।' এই উক্তি থেকে বোঝা যায় তাঁর সমগ্র রচনাবলীকে জীবনানন্দ একটি কাব্য হিসেবে বিবেচনা করতেই অভ্যস্ত ছিলেন। সমগ্র রচনাবলীর

এক-একটি কালগত পর্যায় যেন এক-একটি অংশ বা অধ্যায়। আমরা যদি কবিতার ভিতরের দিকে মনোযোগ দিয়ে ভাবনা, কল্পনা, প্রকরণের সূত্র ধরে এগিয়ে সেই অধ্যায়গুলো সনাক্ত করতে পারি, তাহলে প্রত্যেকটি কবিতার সঠিক তারিখ নির্ণয় করতে পারবো না বটে, কিন্তু বিশেষ কবিতাটি কাব্যের কোন্ অধ্যায়ের কোন্ গুচ্ছের অন্তর্গত তা চিনে নিতে পারবো। মনে হয় তাতে মোটামুটি একটা সময়ও বুঝে নেওয়া যাবে। অন্তত বহিরঙ্গ কালের সঙ্গে যদি সেই সনাক্তকরণ মিলে নাও যায়, কবির অন্তরঙ্গ কালের সঙ্গে তা খাপ খেয়ে যাবে। জীবনানন্দ-কাব্যের সেই অধ্যায় নির্ণয়ের কাজে প্রথমেই বাদ দিচ্ছি 'ঝরাপালক' বইকে। সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল প্রভাবিত ঐ কাব্যের রচনাকাল পরিধি সুপরিচিত, তাছাড়া জীবনানন্দের 'স্বতন্ত্র সারবত্তা'-র উন্মেষ ঐ কাব্যে শুরুও হয় নি।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে'

স্থানচিত্রের অনুপুঙ্খ রচনায় জীবনানন্দের মতো কুশলী বিরল। খুঁটিনাটির নিখুঁত সমাবেশে তিনি দৃশ্যচিত্রকে মূর্ত তথা শরীরী করে তুলতে পারেন, এক লহমায় আঁকা একটি রেখায় দিতে পারেন অবিস্মরণীয় অবয়বত্ব। জীবনানন্দের কাব্যের প্রথম অধ্যায়ের কবিতাগুলো এই ব্যাপারে, অর্থাৎ বস্তুজগৎকে বিশ্বাস্য করে তোলায়, বড় পরিপাটী। ভূবিশ্বের যে খণ্ডে আকস্মিক ভাবে তাঁর জন্ম, সেই ভূখণ্ডের তদ্গত বর্ণনায় তিনি সেই দেশকে চিনিয়েছেন; তার অস্তিত্বে তিনি আমাদের গভীরভাবে আস্থাবান করে তুলেছেন। যেমন রিয়ালিস্ট করেন—রিয়ালিস্টের কাজই হলো যে বস্তুজগতে আমরা বসবাস করি তাকেই আরো বিশ্বাস্য করে তোলা। বস্তুবাদীর বর্ণনা পড়ে আমরা বলি, 'বাঃ, এই তো আমাদের চিরচেনা চরাচর!' অবশ্য এই অধ্যায়ের জীবনানন্দকে রিয়ালিস্ট না বলে ন্যাচারালিস্ট বলাই

বরং ভালো—এবং দুই অর্থে। সাহিত্যসমালোচনায় যাদের ন্যাচারালিস্ট বলা হয় তাদের মতো তাঁর দৃষ্টিও অনুপুঙ্খের দিকে, সামগ্রিকতার দিকে নয় খাঁটি রিয়ালিস্টদের মতো। দ্বিতীয়ত তিনি ন্যাচারালিস্ট, প্রকৃতিপ্রেমী বলে।

'রূপসী বাংলা'-র প্রায় সব রচনাই এই জাতের। এখানে 'নরম ধানের গন্ধ—কলমীর ঘ্রাণ,/হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা, সরপুটিদের/মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোওয়া ভিজে হাত…।' এক স্পর্শ গন্ধময় চিত্রল জগৎকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। ঝরে-পড়া পাতা এবং সবুজ ঘাসের মধ্যে 'সিঁদুরের মতো রাঙা লিচু' এই কবির চোখ এড়ায় না, এবং তিনি দেখেন—

অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দয়েল পাখি…।

শ্যাওলা-সবুজ দামপানায়-ঢাকা বাংলার পুকুরকেন্দ্রিক গ্রামজীবনের ছবি এই সব। বিরল শব্দরেখায় আঁকা কিন্তু ইমেজের কী বহুলতা, কী উজ্জ্বলতা! ছায়াচ্ছন্নতা এবং উদ্ভিজ্জ গন্ধ চিনে নিতে ভুল হয় না, অনুপুঙ্খ দিয়ে দৃশ্যকে সাকার ও শরীরী করে তোলায় এতোই তিনি দক্ষ।

১ যখন পুকুরে হাঁস সোঁদা জলে শিশিরের গন্ধ শুধু পায়,
শামুক গুগলিগুলো পড়ে আছে শ্যাওলার মলিন সবুজে ।
২ দীঘির জলের গন্ধে রূপালি চিতল তার রূপসীর পিছু
জামের গভীর পাতা-মাখা শান্ত নীল জলে খেলিছে গোপনে ।

আর এই সব সশরীরী ছবি—'কাঁচা কাঠ জ্বলে ওঠে—নীল ধোঁয়া নরম মলিন/বাতাসে ভাসিয়া যায় কুয়াশার করুণ নদীর মতো ক্ষীণ…,' শান্ত মনে পূর্বস্মৃতি মন্থন করে পাওয়া নয়। এই সনেটকল্প রচনাগুলি মধুসূদনের চতুর্দশপদীর মতো প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীত নয়। কারণ বাংলার 'এই পথ ছেড়ে দিয়ে এ-জীবন কোনোখানে গেল নাকো' এবং

'কোনোদিন রূপহীন প্রবাসের পথে/বাংলার মুখ তুলে খাঁচার ভিতরে নষ্ট শুকের মতন/কাটাই নি দিন মাস···।' এই সব ছবি—'আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের ঘন স্তূপে'—সবই যেন সদ্যোজাত, বাংলার মুখ দেখে তৎক্ষণাৎ সেই আদলে আঁকা।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-রও অনেক কবিতা এই অধ্যায়ের মধ্যে পড়ে, কারণ সেখানেও 'চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান' (অবসরের গান)। হেমন্তের প্রত্যক্ষ কী ম্লান ছবি তিনি আঁকেন 'হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালীর বিছানার পর', 'বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা'। প্রকৃতিবাদী এই কবির অনুপুঙ্খের প্রতি কী নিবিষ্ট নজর।

চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে,—পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা,—কড়্ কড়্।
শসাফুল,—দু-একটা নষ্ট শাদা শসা,
মাকড়ের ছেঁড়া জাল—শুকনো মাকড়্সা
লতায়-পাতায়,—
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায়। (পঁচিশ বছর পরে)

রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলেছিলেন, সেই 'মৃত্যুর আগে' কবিতাতেও বহিরঙ্গ পৃথিবীরই স্বপ্নাচ্ছন্নতা ধরা পড়েছে। এখানে 'যে সবুজ বাতাস'-এর কথা আছে তাও বস্তুতন্ত্র থেকে খুব কিছু বিচ্যুতি মনে হবে না, যদি ইমপ্রেশনিস্টদের ছবিতে রঙ্ ব্যবহারের কথা মনে রাখি। একই কারণে 'শিকার' কবিতায় দেখি 'আকাশের রং ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল,' 'পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ', ভোর আকাশের শেষ তারাটি 'পাড়াগাঁর বাসরঘরে সব চেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো,' আর আগুনের রঙ্ মোরগফুলের মতো লাল।

নতুন সংস্করণ 'মহাপৃথিবী' এবং 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র এই বাস্তবিক ছবিটাও কি ঐ অধ্যায় থেকে তুলে আনা ?

> গোরুর গাড়িটি কার খড়ের সুসমাচার বুকে।
> লাল বটফলে থ্যাঁতা মেঠোপথে জারুল ছায়ার নিচে নদীর সুমুখে
> কতক্ষণ থেমে আছে ; চেয়ে ছাখো নদীতে পড়েছে তার ছায়া ;
> নিঃশব্দ মেঘের পাশে সমস্ত বিকেল ধরে সে-ও যেন মেঘ এক, আহা,
> শান্ত জলে জুড়োচ্ছে । (জর্ণাল : ১৩৪৬)

কিংবা সিগনেট সংস্করণ 'বনলতা সেনে'-র এই ছবি—

> সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন ; চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
> হেমন্ত আসিয়া গেছে ;—চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি ;
> ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি
> হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে ;...
> হলুদরঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিঁধে আছে, এলোমেলো অঘ্রাণের খড়
> চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীর ;
> চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির ;— (দুজন)

আর একটা লক্ষ্য করার ব্যাপার আছে। এই সব দৃশ্য হয় শুধুই দৃশ্য, নতুবা উপমায় সাদৃশ্য আনে। হয় প্রত্যক্ষ ছবি, নয় দৃশ্যে-দৃশ্যে যোগ করে 'মতো' 'মতন' এই সব সাদৃশ্যবাচক অব্যয়। উপমার এই অনর্গল ব্যবহার প্রমাণ করে ন্যায়শৃঙ্খল ভেঙে যায় নি এখনো, যেমন জগতে তেমনি কার্যকারণসূত্রেও তিনি আস্থাশীল।

আর জগতের যে কোণটিকে বেছে নিয়ে তিনি সেই আস্থা প্রকাশ করেছেন, সেই ভূখণ্ডকে সাকার করার জন্যেই বোধহয় তাঁর প্রথম অধ্যায়ের কবিতায় দেশজ শব্দের এমন ব্রীড়াহীন দ্বিধামুক্ত ব্যবহার। মন্ত্রবর্জিত ব্রাত্য এই সব শব্দকে অন্য কবিরা যখন আঙুলের ডগা দিয়েও ছুঁয়ে দেখলেন না তখন জীবনানন্দ সাদরে সেই সব গ্রাম্য অপজাত ইতর শব্দকে ডেকে নিলেন। সেই সব, বুদ্ধদেব বসু যাদের বলেছেন 'ভদ্রসমাজে অনুচ্চার্য,' বা কোনোরকমে-উচ্চার্য শব্দ। আর সেই জন্যেই হয়তো জীবনানন্দের হাতে বাংলাদেশ যেমন শরীরী হলো,

তেমনটি আর কারো কবিতায় হলো না। এই সব উল্লেখে গ্রামবাংলা জ্যান্ত হয়ে উঠেছে—লাল শাক, নারকোল নাড়ু, কচি তালশাঁস, শসালতা, সজিনার ফুল, ফেনসাভাত, ধুন্দুললতা, মুথাঘাস, ডাঁসা আম, ভেরেণ্ডা ও কামরাঙা ফুল, বাবলা, বৈচি, হোগলা, কাশ। আর এই সব দেশজ শব্দ যা জীবনানন্দের অনর্গল—ফোঁপরা, ছেঁড়াফাড়া, সোহাগ, ব্যাং, ন্যাড়া, নিঙড়ানো, ফেঁসে যাওয়া, ধলা, ছিরি, ফিক করে হাসা, বিয়োবার, কুঁড়েমি, আইবুড়, রগড়। পরিচিত জগতের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যেই তিনি নিশ্চয় এই সব নিত্যব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু এই বর্ণাঢ্য বস্তুজাগতিক বর্ণনায় আস্থা ঈষৎ টলে যায় যখন মাঝে মাঝেই মিলতে থাকে অন্য ধরনের কিছু শব্দ, কিছু বাক্যাংশ। সেই শব্দ বা বাক্যাংশ স্থিতাবস্থার বাইরে থেকে আসা। হঠাৎ হঠাৎ পেয়ে যাই 'বেদনার গন্ধ', 'আকাঙ্ক্ষার রক্ত অপরাধ'-এর কথা, 'আকাঙ্ক্ষার উদ্ঘাটন', 'উদ্ভাসিত স্বর' এবং 'গাঢ় বিষণ্ণতা'র কথা। তাই জীবনানন্দের কবিতা সম্বন্ধে অমিয় চক্রবর্তীর কথা ('প্রসন্ন বেদনায় কোমল উজ্জ্বল') হয়তো পুরো মেনে নেওয়া যায় না। কেননা শ্যামল বাংলা নিসর্গের কথায় বারবার এসে যায় 'রুক্ষ প্রশ্ন', 'রূঢ় কথা', 'রূঢ় মনুমেন্ট' এবং 'রূঢ় কোলাহল'-এর কথা। কোমল-প্রসন্ন বেদনার মধ্যে এই রূঢ়তা-রুক্ষতার ঘা খেয়ে খুঁজলে, একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদ পেয়ে যাই আমরা। সেই সংবাদ হলো রূপসী বাংলার স্বর্গোদ্যানে শয়তান প্রবেশ করেছে। শুধু এই নয় যে, শ্যামলসুন্দর বঙ্গ-প্রকৃতির এই চেহারা থাকবে না, তার চেয়েও বড়, অস্তিত্বের অনিবার্য পরিণাম একটা স্থায়ী অনিত্যতার ভাবনা আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই শ্মশান, শবদেহ, চিতার অনুষঙ্গ আসে অবিরল।[১]

১ যেইখানে কঙ্কাপেড়ে শাড়ি পরে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দনচিতায় চড়ে…।

২ রূপসীরা আজ আর আসে নাকো, পাট শুধু পচে অবিরল,
সেইখানে কলমীর দামে বেঁধে প্রেতিনীর মতন কেবল
কাঁদিবে সে মায়ারাও,—দেখিবে কখন কারা এসে আমকাঠে
সাজায়ে রেখেছে চিতা···।

৩ হৃদয়ে প্রেমের দিন কখন যে শেষ হয়—চিতা শুধু পড়ে থাকে তার···

৪ কবে যেন তারে আমি দেখিয়াছি—কবে যেন রাখিয়াছে হাতে
তার হাত—কবে যেন তারপর শ্মশানচিতায় তার হাড়
ঝরে গেছে, কবে যেন···।

মৃত্যুর এই অনিবারণীয়তার কথা পাচ্ছি 'বনলতা সেন' সংকলনেও। যেদিন 'খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—গান গায়—গান গায়/এই দুপুরের বাতাস', যখন 'একটা ধবল চিতল হরিণের ছায়া/আতার ধূসর ক্ষীরে গড়া মূর্তির মতো/নদীর জলে/সমস্ত বিকেল ধরে/স্থির।' তখন,

মাঝে মাঝে অনেক দূর থেকে শ্মশানের চন্দন কাঠের চিতার গন্ধ,
আগুনে ঘিয়ের ঘ্রাণ...। (আমাকে তুমি)

'শঙ্খমালা'-র 'স্তন তার /করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র' কিন্তু 'কড়ির মতন শাদা মুখ তার,/দুইখানি হাত তার হিম ;/চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম / চিতা জ্বলে ; দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়/সে আগুনে হায়।'

(যদিও প্রথম অধ্যায়েই জীবনানন্দ একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'মৃত্যুরে কে মনে রাখে ?' কিন্তু দেখা যাচ্ছে মৃত্যুচৈতন্য সব সময় জাগরূক, কারণ 'শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছ'। বাস্তবিকের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় তিনি যে সুখী হতে পারছেন না, তাঁর ইন্দ্রিয়োপলব্ধির আড়াল থেকে জেগে উঠছে এক ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধি, এক তৃতীয় চক্ষু—তারই আভাস আছে এই সব বর্ণনায়। তৃতীয় চক্ষুর অস্বাভাবিক দ্যুতি দিয়েই তিনি দেখেন, 'অনেক কুকুর আজ পথেঘাটে নড়াচড়া করে / তবুও আঁধারে ঢের মৃত কুকুরের মুখ—মৃত বিড়ালের ছায়া ভাসে···।' তাহলে, এক অধ্যায় শেষ হয়ে এলো।)

'পৃথিবী ক্রমশ তার আগেকার ছবি বদলায়ে ফেলে দিয়ে তবুও পৃথিবী'

'মনে হয় / কারা যেন বড় বড় কপাট খুলছে, / বন্ধ করে ফেলছে আবার ; / কোনো দূর—নীরব—আকাশরেখার সীমানায়' (শ্রাবণরাত)। সেই সব বড় বড় কপাট খুলে-খুলে, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জগতের পর্দা সরিয়ে-সরিয়ে 'তুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মতো' জীবনানন্দ প্রবেশ করলেন অন্য জগতে, বাস্তবের পিছনে বাস্তবের চেয়ে বেশি অতিবাস্তব জগতে।

> কারা এসে বলে গেল : 'নেই
> গাছ নেই—রোদ নেই—মেঘ নেই—তারা নেই—আকাশ তোমার
> তরে নয় !' (নদীরা)

তাই তুই চোখে দেখা বস্তুপৃথিবী নয়, গাছ নয়, রোদ নয়, মেঘতারা নয় ; তৃতীয় নেত্র দিয়ে দেখা সুররিয়াল জগৎ এলো জীবনানন্দ-কাব্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তেই অন্তশ্চক্ষুর অধিকারী কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন, 'কেউ যাহা জানে নাই— / কোনো এক বাণী— / আমি বহে আনি ; / একদিন শুনেছ যে-সুর— / ফুরায়েছে—পুরানো তা—কোনো এক নতুন কিছুর আছে প্রয়োজন, / তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন / আর নাই কেউ' (কয়েকটি লাইন)। কিন্তু নতুন কিছুর চাহিদা পূরণের জন্যেই শুধু তিনি এসেছেন একথা মানা যায় না ; এই পরাদৃষ্টির উন্মেষ ভিতর থেকেই হয়েছে অনিবার্য অন্তর্গত তাড়নায়, কোনো বাইরের দাবীতে নয়। কবির নিজেরই স্বীকৃতি আছে অন্য কবিতায়—

> আমারে দিয়েছ তুমি হৃদয়ের যে এক ক্ষমতা
> ওগো শক্তি,—তার বেগে পৃথিবীর পিপাসার ভার

বাধা পায়, জেনে লয় নক্ষত্রের মতন স্বচ্ছতা।
আমারে করেছ তুমি অসহিষ্ণু—ব্যর্থ—চমৎকার!
জীবনের পার থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,
কবর খুলেছে মুখ বারবার যার ইশারায়,···। (অনেক আকাশ)

বিখ্যাত 'বোধ' কবিতায় সেই চৈতন্যের কথা বলেছেন যার প্রভাবে চেনাজগৎ অচেনা হয়ে যায়—অ্যাবসার্ড হয়ে যায়—জগৎসংসারের সঙ্গে পরিচয়সূত্রগুলো খসে খসে যায়।

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়,—কোন্ এক বোধ কাজ করে!
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে;
সব কাজ তুচ্ছ মনে হয়,—পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়
শূন্য মনে হয়।

সেই তৃতীয় চক্ষুর সম্বন্ধবন্ধনগুলো খুলে যায়, পীড়িত হতে হয় বিচ্ছিন্নতাবোধে—'সকল লোকের মাঝে বসে / আমার নিজের মুদ্রাদোষে / আমি একা হতেছি আলাদা?' বিচ্ছিন্ন; কেন না সাধারণ মানুষ যখন জগতের স্থূলবাস্তব চেহারা দেখে তখন কবির পরাবাস্তব দৃষ্টিতে জগৎ হারিয়ে ফেলে তার স্থূলতা। 'বোধ' কবিতার নায়ক অন্য সব মানুষের মতো বালটিতে জল টেনেছে, কাস্তে হাতে মাঠে গিয়েছে, 'মেছোদের মতো আমি কত নদীঘাটে/ঘুরিয়াছি'—তবুও সে আলাদা;—ঐ বোধের জন্যেই আলাদা, ঐ বোধের জন্যেই 'অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়? / কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ / পাবে নাকি?

পাবে না আহ্লাদ / মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন ! / মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন ! / শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন !'

(একজন অস্তিবাদী মনে করেন জগৎ যে অ্যাবসার্ড তার প্রমাণ আত্মহত্যায়; জগতের অ্যাবসার্ড চেহারা যখন স্পষ্ট হয়ে যায় তখন একমাত্র আত্মহত্যাতেই নিস্তার। জীবনানন্দের কাছে অনিত্যতা এবং নশ্বরতাই সব চেয়ে বড় প্রমাণ যে জগৎ অ্যাবসার্ড। যে জগতের অনুপুঙ্খ সমাবেশে তাঁর জন্তুর মতো ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ ছিল, এক অপূর্বশ্রুত বোধের তীব্রতায় সেই জগতের চেহারা অপরিচিত হয়ে গেল। সমস্ত আপতিক দৃশ্যের মধ্যে তিনি অনিবার্য নশ্বরতাকে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন। 'বরফের কুচির মতন / সেই জল-মেয়েদের স্তন ! / মুখ বুক ভিজে, / ফেনার শেমিজে / শরীর পিছল !') কিন্তু সেই বোধের তৃতীয় নেত্র দিয়ে তাকানো মাত্র 'চেয়ে দেখি,—দুটো হাত, ক'খানা আঙুল / একবার চুপে তুলে ধরি ;/ চোখ দুটো চূণ-চূণ,—মুখ খড়ি-খড়ি ! / থুতনিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি,—/ সব বাসি,—সব বাসি,—একেবারে মেকি' (পরস্পর)। অথবা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র অন্তর্গত 'জীবন' কবিতার কথাই ধরা যাক। নাম 'জীবন', কিন্তু সবই তো মৃত্যুর প্রসঙ্গ। কিন্তু এই অধ্যায়ে এই তো স্বাভাবিক—কারণ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তিনি আপতিককে এখন ভেদ করেছেন, দেখেছেন জীবনের মধ্যে মৃত্যুকে।

> যে-পাতা সবুজ ছিল—তবুও হলুদ হতে হয়—,
> শীতের হাড়ের হাত আজো তারে যায় নাই ছুঁয়ে ;—
> যে-মুখ যুবার ছিল,—তবু যার হয়ে যায় ক্ষয়,
> হেমন্ত রাতের আগে ঝরে যায়, পড়ে যায় নুয়ে ; ..। (জীবন)

চারিদিকে প্রেতের আনাগোনা—'আকাঙ্ক্ষার ভূত লয়ে খেলা', 'ভূত হয়ে করি ঘোরাঘুরি', 'আমরাও চরি-ফিরি কবরের ভূতের মতন', 'বাসিপাতা ভূতের মতন উড়ে আসে'। মৃত্যুর অনুষঙ্গ আসে বারবার—'আমাদের রক্তের ভিতর/বরফের মতো শীত', 'কাশের রোগীর মতো পৃথিবীর শ্বাস',

'মড়ার চোখের রঙে সকল পৃথিবী থাকে ভরে'। চোখ এখন অ-সুস্থ, অস্বভাবী—'অসুস্থ চোখের পরে অনিদ্রার মতন অসুখ ; / তাই আমি প্রিয়তম ;—প্রিয়া বলে জড়ায়েছি বুক…' (জীবন)। হাড়ে-হাড়ে মজ্জায়-মজ্জায় প্রত্যেক মিনিটে মৃত্যু উপস্থিত—'শুধু পীড়া,—শুধু পীড়া !—মুকুলে-মুকুলে / শুধু কীট' (পিপাসার গান), 'চারিদিকে বিচ্ছেদের ঘ্রাণ লেগে রয় / পৃথিবীতে' (পাখি), 'শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের' (হাজার বছর শুধু খেলা করে)। মানুষেরই পক্ষে মাত্র সেই অ-সুস্থ দৃষ্টি সম্ভব যাতে বাস্তবের আড়ালে পরাবাস্তবকে দেখা যায় ; মানুষেরই মধ্যে সেই 'বোধ', সেই 'বিপন্ন বিস্ময়' উদ্ভাসিত হতে পারে যার ফলে জগৎচরাচরকে মনে হয় নিতান্ত অ্যাবসার্ড। এই অভিজ্ঞতা দেবতাদের নেই, কীটপতঙ্গেরও নেই।

শুনেছে কে ইহাদের মুখে কোনো অন্ধকার কথা ?
সকল সংকল্প চিন্তা রক্ত আনে ব্যথা আনে—মানুষের জীবনের
এই বীভৎসতা
ইহাদের ছোঁয় নাকো ;—
ব্যুবনিক প্লেগের মতন
সকল আচ্ছন্ন শান্ত স্নিগ্ধভাবে নষ্ট করে ফেলিতেছে মানুষের মন !
(এই নিদ্রা)

সব মানুষের মনে হয়তো সম্ভাবনা থাকে, তবু সব মানুষের মনে এই 'বোধ' জন্মায় না, জন্মায় 'আটবছর আগের একদিন'-এর নায়কের মতো মানুষের মনে। যার 'বধূ শুয়ে ছিল পাশে—শিশুটিও ছিল ;/ প্রেম ছিল, আশা ছিল', অথচ যে জ্যোৎস্নায় ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে, সেই রকম মানুষের মনেই দেখা দেয় এই অ্যাবসার্ড-বোধ। এই নায়ক—

নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,…
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে

এ জীবন কোনো দিন কেঁপে ওঠে নাই ;
তাই
লাশকাটা ঘরে।
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে।

মারাত্মক এই বিচ্ছিন্ন 'তাই' অব্যয়ের ব্যবহার। কোনো কারণ নেই, 'তাই' কার্য ঘটেছে। এই 'তাই' ব্যবহারে যেন কার্যকারণ-পরম্পরাকে ভেঙে দেওয়া হল ; লজিকের মতো, জ্যামিতির মতো সিদ্ধান্ত সাজানো হয়েছে, কিন্তু এ-লজিক তো লজিক উল্টে-দেবার লজিক। ভেঙে গেল ন্যায়শৃঙ্খল, পারম্পর্য-সূত্রের বন্ধন। একটি অব্যয়ের আশ্চর্য ব্যবহারে জীবনানন্দ খুলে দিলেন স্থূলপৃথিবীর জোড়গুলোকে।)

এই পরাবাস্তবদৃষ্টির এক বেদনাভারাতুর নিদর্শন সিগনেট সংস্করণ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে সংযোজিত 'মেয়ে' কবিতায় আছে। কবি দেখেন 'আমার প্রথম মেয়ে' মৃত মেয়েকে। তখন 'হাতখানা ধরে তার : ধোঁয়া শুধু/কাপড়ের মতো শাদা মুখখানি কেন !'

বলিল সে : 'আমারে চেয়েছ তাই ছোট বোনটিরে—
তোমার সে ছোট-ছোট মেয়েটিরে এসেছি ঘাসের নিচে রেখে
সেখানে ছিলাম আমি অন্ধকারে এতদিন
ঘুমাতেছিলাম আমি'—ভয় পেয়ে থেমে গেল মেয়ে,
বলিলাম : 'আবার ঘুমাও গিয়ে
ছোট বোনটিরে তুমি দিয়ে যাও ডেকে।'

এই কথায় 'ব্যথা পেল সেই প্রাণ' ; যেই সেই মৃত মেয়ে ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল, কবি দেখলেন তাঁর ছোট মেয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে—'আর কেউ নেই'। দুঃস্বপ্ন থেকে তিনি ফিরে এলেন পরিচিত চতুষ্পার্শ্বে, পরাবাস্তব থেকে বাস্তবে। এই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আক্রান্ত হওয়ায় এসে যায় অন্য কোনো অতিবাস্তব, যেন স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্নের উৎস থেকে, যেন কাফ্‌কার জগৎ থেকে উঠে আসে এইসব অপার্থিব ছবি।

১ হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফ্‌রান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;
তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনল সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল। (বেড়াল)

২ মহীনের ঘোড়াগুলি ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে,
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন,—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে।···
চায়ের পেয়ালা কটা বেড়ালছানার মতো

ঘুমে-ঘেয়ো কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হয়ে নড়ে গেল ও পাশের পাইস রেস্তরাঁতে ;
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেলে গোল আস্তাবলে সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে ;
এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে। (ঘোড়া)

সরোজিনী চলে যায় 'সপ্তক' কবিতায় 'সিঁড়ি ছাড়া—পাখিদের মতো পাখা বিনা' এবং চলে গিয়েও সে থেকে যায় 'লুপ্ত বেড়ালের মতো ; শূন্য চাতুরির মূঢ় হাসি নিয়ে জেগে'—লিউস ক্যারলের বিখ্যাত চেশায়ার বিড়ালের মতো।

ইন্দ্রিয়মদিরতার আচ্ছন্ন দিনে যাঁর ইচ্ছে হয়েছিল 'এই ঘাসের শরীর ছানি', ইচ্ছে হয়েছিল 'ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই', অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি খুলে গেলে তাঁর চোখে ধরা পড়ে 'বাতাসের ওপারে বাতাস,—/আকাশের ওপারে আকাশ' (আকাশলীনা), আর তখন তিনি উপলব্ধি করেন 'সুরঞ্জনা, / তোমার হৃদয় আজ ঘাস'। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দৃষ্টি তাঁর স্বতন্ত্র, জগতের চেহারাও পৃথক ;—এই দৃষ্টি পুরোনো অনুপুঙ্খময় জগতের চেহারাকে অলীক করে দিয়েছে।

এতদিন বসে পুরোনো বীজগণিতের শেষ পাতা শেষ না করতেই
সমস্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল ;
কোন্ এক গভীরে নতুন বীজগণিত যেন
পরিহাসের চোখ নিয়ে অপেক্ষা করছে ;—
আবার মিথ্যা প্রমাণিত হবে বলে ? (আজকের এক মুহূর্ত)

গভীর নতুন এক বীজগণিত দিয়ে জীবনানন্দ দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৃথিবীকে বুঝতে চেয়েছিলেন। আর বুঝে, প্রগাঢ় ভাবে বিচলিত হয়েছিলেন তিনি।

'অট্টহাসির ভিতর একটা বিরাট তিমির মৃতদেহ'

যাকে তৃতীয় নেত্র বলেছি তার দৃষ্টিপাত রঞ্জনরশ্মির মতো বহিরাবরণ উন্মোচিত করে দেয়। চেনা জগতের ছবির ভিতরে ফুটে ওঠে অচেনা আর এক দ্বিতীয় ভুবনের চেহারা। যাকে মনে হয়েছিল সুশ্রী কমনীয়, প্রসন্ন কোমল, তার মধ্যে রুক্ষতা-রূঢ়তার চিহ্ন ফুটে ওঠে—লাবণ্যের আড়ালে হাড় ধরা পড়ে যায়। যাকে সত্য মনে হয়েছিল সে আসলে মেকি প্রমাণ হয়ে যায়। অন্তর্ভেদী নজরে যখন বাস্তবের ভিতরে পরাবাস্তবের মানচিত্র ধরা পড়ে তখন সত্য আর প্রতীয়মানের মধ্যে ব্যবধান জানাজানি হয়ে যায়। প্রতীয়মানের পর্দাকে সরিয়ে দিতেই যে বিশ্বসংসারকে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল দৃঢ় এবং স্থিতিশীল তার চেহারা অন্য রকম হয়ে গেল—'দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে; /গ্রামপতনের শব্দ হয়; / মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,/দেয়ালে তাদের ছায়া তবু /ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,/বিহ্বলতা বলে মনে হয়' (পৃথিবীলোক)।

> চারিদিকে নবীন যত্নর বংশ ধ্বসে
> কেবলই পড়িতে আছে ; সঙ্গীতের নতুনত্ব সংক্রামক ধূয়া
> নষ্ট করে দিয়ে যায় ;—
> স্মৃতির ভিতর থেকে জন্ম লয়, এই সব গভীর অসূয়া।
>
> (আমিষাশী তরবার)

ক্ষুরধার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাচ্ছে মূল্যবোধের বিরুদ্ধে অবক্ষয়ের ষড়যন্ত্র, সভ্যতাবিনাশের চক্রান্ত। এক-একবার মনে হচ্ছে মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বভাবের মধ্যেই নিহিত আছে রক্তপাতের কারণ—

'মানুষকে স্থির—স্থিরতর হতে দেবে না সময় ;/সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত নদী' (শ্যামলী)।) 'অদ্ভুত আঁধার এক' পৃথিবীতে ইদানীং নেমে এসেছে ; শঠতা, অন্যায়, দ্বেষ,—বিশেষ করে দ্বেষই যেন আজ চালিকাশক্তি। 'আমরা খারিজ হয়ে দোটানার/অন্ধকারে তবুও তো/চক্ষু স্থির রেখে/গণিকাকে দেখায়েছি ফাঁদ ;/প্রেমিকাকে শেখায়েছি ফাঁকির কৌশল' (সূর্যপ্রতিম)। 'দলিলে না মরে' তবু মানুষ ভিতরে-ভিতরে আজ মৃত ; ইতিহাসে না মরে তবু জাতি ও সভ্যতা ভিতরে-ভিতরে বিনষ্ট।

(আপাত-স্থিতাবস্থার আড়ালে এই ভাঙন দেখে, প্রতীয়মানের পিছনে সত্যের এই মারাত্মক চেহারা দেখে দুই রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে কবির। প্রথম প্রতিক্রিয়া, ব্যঙ্গের, পরিহাসের, অট্টহাসির। সত্য প্রতীয়মানের ভেদ দেখে তিনি হেসে উঠেছেন। জীবনানন্দকে যাঁরা চিনতেন তাঁরা সবাই লিখেছেন কী এক অদম্য কৌতুকবোধে স্থানকাল বিবেচনা না করে তিনি অনেক সময় হাসিতে ফেটে পড়তেন। যে বিসঙ্গতিবোধ তাঁকে কৌতুকবিহ্বল করতো ব্যক্তিগত জীবনে, সেই পরিহাসবোধেরই তিনি আশ্রয় নিয়েছেন কবিতায় যখনই সত্য ও আপতিকের বিসঙ্গতি ধরা পড়ে গেছে তাঁর তৃতীয় নেত্রের আলোকসম্পাতে। এই অসঙ্গতি যে সময় থেকে তাঁর কবিতায় ধরা পড়ে যাচ্ছে, সেই সময়ের কবিতায় তাঁর ব্যবহৃত বিশেষণ-বিশেষ্যের মধ্যে এক বৈপরীত্যধর্ম দেখা যায়। বিশেষ্য-বিশেষণ যেন পরস্পরকে নাকচ করছে ; একটি যদি বলে আপতিকের কথা, অন্যটি যেন বলে গূঢ় পরিস্থিতির কথা। দুই বিপরীতের সংঘাতের সময় যেন কবির প্রচ্ছন্ন হাসিটিও ধরা পড়ে যায়। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে বিশেষ্য-বিশেষণের পাশাপাশি অবস্থানের মধ্য দিয়ে জীবনের বিসঙ্গতি কী ভাবে তিনি রূপায়িত করেছেন—'মসলিন যুবারা', 'বিমর্ষ প্রসব', 'ভূতকে নিরস্ত করে প্রশান্ত সরিষা', 'কামানের স্থবির গর্জন', 'দিনের বিশ্রুত আলো',

'অমায়িক কুটুম্বিনী', 'নিটোল সারস', 'নির্মল ভিটামিন', 'সচ্ছল কঙ্কাল' 'ফিচেল বাতাস', 'সপ্রতিভ আঘাত' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই পরিহাসবোধের প্রথম ইশারা পাওয়া গেল 'অবসরের গান' কবিতায়। সেখানে 'পাড়াগাঁ-র এই সব ভাঁড়'-দের সঙ্গে আমাদের দেখা হল, শোনা গেল যোদ্ধা জয়ী সম্রাট ও সেই সব ভাঁড়ের 'খুলির অট্টহাসি'। তারপর প্রায়ই দেখছি আকাশও 'কৌতুকী', 'নক্ষত্র চুপে হেসে' যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে এক অদম্য কৌতুকবোধ তাঁর মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল। সংসারে, অস্তিত্বের গভীরে সব জায়গায় তাঁর চোখে ধরা পড়ছিল হাস্যকর সব পরিস্থিতি।

১ একটি বিপ্লবী তার সোনা রুপো ভালোবেসেছিলো ;
একটি বণিক আত্মহত্যা করেছিল পরবর্তী জীবনের লোভে ;
একটি প্রেমিক তার মহিলাকে ভালোবেসেছিলো ;
তবুও মহিলা প্রীত হয়েছিল দশজন মূর্খের বিক্ষোভে। (ও. কে.)

২ ...জড়ায়েছে ঘিয়ের রঙের মতো শাড়ি
ভালো করে দেখে নিলে মনে হয় অতীব চতুর দক্ষিণরাঢ়ী
দিব্য মহিলা এক ;
জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক মিলে আমাদের দুদিকের কান
টানে বলে বেঁচে থাকি—ত্রিবেদীকে বেশী জোরে দিয়েছিল টান।
(অনুপম ত্রিবেদী)

কখনো এই পরিহাস গ্রোটেস্‌ক 'সুবিনয় মুস্তফী'-র মতো—'সুবিনয় মুস্তফীর কথা মনে পড়ে এই হেমন্তের রাতে।/এক সাথে বেরাল ও বেরালের-মুখে-ধরা-ইঁদুর হাসাতে /এমন আশ্চর্য শক্তি ছিলো ভূয়োদর্শী যুবার।' আবার কখনো সেই ব্যঙ্গ ভয়ংকরভাবে বীভৎস, যেমন যেখানে তিনি 'সমারূঢ়' কবিতায় 'আরূঢ় ভনিতা' সমালোচকের 'অক্ষম পিচুটি'-কে আক্রমণ করেছেন। 'মহাপৃথিবী' এবং 'সাতটি তারার তিমির' বইতে অজস্রবার পরিহাসবাচক শব্দ পাই আমরা। প্রথম উদাহরণগুলো 'মহাপৃথিবী' থেকে—'হো হো করে হেসে উঠল', 'চারিদিককার অট্টহাসি', 'পরিহাসের চোখ', 'রক্তচ্ছটা রঞ্জিত ভাঁড়',

'বৈহাসিক', 'জীবনকে টিটকারি', 'উচ্চস্বরে হেসে ওঠে', 'বেদম হেসে খিল ধরে যেত', 'হেসে খুন হতো', 'কৌতুকে', 'শকুনি মামার সাথে হেসে', 'সেই থেকে হাসায়', 'বিদূষক', 'পৃথিবীর প্রথম তামাসা'। 'সাতটি তারার তিমির' থেকে দিচ্ছি পরের নিদর্শনগুলো—'নৃমুণ্ডের হেঁয়ালি', 'লঘু হাস্য', 'লোল হাস্য', 'তামাসার প্রগলভতা', 'পরিহাসে', 'লোল নিগ্রো হাসে', আবহমানের 'ভাঁড়', 'চোখ ধার', 'হেঁয়ালি', 'সোনালি হেঁয়ালি', 'ফিচেল', 'ঠোনা দিয়ে', 'নির্দোষ আমোদ' ইত্যাদি।

এই পরিহাসকে কবিতায় শরীরী করার জন্যে আর একটা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন জীবনানন্দ। সেই কৌশল প্রবাদ-প্রবচনের ঈষৎ বিকৃত ব্যবহার। কয়েকটা নিদর্শন দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। যেমন, 'কেননা যুগের গালে কালি আর চূণ' (সমিতিতে), 'বাতাসে ধর্মের কল নড়ে ওঠে—নড়ে চলে ধীরে' (মনোসরণি)। আরো কয়েকটা উদাহরণ—'ভারে কাটে—তথাপিও ধারে কাটে বলে' (উন্মেষ), 'অব্যয় শিল্পীরা সব : মেঘ না চাইতে এই জল ভালোবাসে' (জুহু), 'সূর্যের চেয়েও বেশি বালির উত্তাপে' (লোকসামান্য), 'পরের ক্ষেতের ধানে মই দিয়ে উঁচু করে নক্ষত্রে লাগানো/সুকঠিন নয় আজ' (সৌরকরোজ্জ্বল), 'রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়/চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয়?' (বিভিন্ন কোরাস), 'আদার ব্যাপারী হয়ে এই সব জাহাজের কথা/ না ভেবে মানুষ কাজ করে যায় শুধু ভয়াবহ ভাবে অনায়াসে' (মহিলা)। তাছাড়া (প্রথম অধ্যায়ে জীবনানন্দ খাঁটি দিশি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন অনুপুঙ্খের সমাবেশে বস্তুবিশ্বকে বিশ্বাস্য করে তোলার জন্যে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি ব্যবহার করলেন শহুরে অপশব্দ, স্ল্যাং। এবার অভিপ্রায় অন্য। সত্য ও প্রতীয়মানের প্রভেদ জেনে তাঁর ব্যঙ্গপ্রখর মনের বিতৃষ্ণাকেই সাকার করে তোলার জন্যে এই সব অপশব্দের ব্যবহার—মরখুটে, খিঁচড়ে ওঠে, গুনেছি টায় টায়, খচ্চর,

মিহিন কামিজ, টেঁসে যায়, ভারিক্কে, ও.কে., হুররে, গাড়ল। এবং এই রকম আরো।

বিশ্বসংসারের চেহারা দেখে ব্যঙ্গপরিহাসের এই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এক সময় রূপান্তরিত হয় ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ায়—ঘৃণায়; জাগতিক বীভৎসতা দেখে মর্মান্তিক ঘৃণায়। হাস্যকর বিসঙ্গতিবোধ থেকে জন্মায় অপ্রতিরোধ্যভাবে এই মারাত্মক ঘৃণা।

> প্রেমিকেরা সারা দিন কাটায়েছে গণিকার বারে;
> সভাকবি দিয়ে গেছে বাক্‌বিভূতিকে গালাগাল…
> তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি ঘায়ে। (সৃষ্টির তীরে)

আর একটা অংশ তুলে দিচ্ছি—

> পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
> স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে
> ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
> আগুন বাতাস জল: আদিম দেবতারা হো হো করে হেসে উঠল:
> 'ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শূয়ারের মাংস হয়ে যায়?'
> হো হো করে হেসে উঠলাম আমি!—
> চারিদিককার অট্টহাসির ভিতর একটি বিরাট তিমির মৃতদেহ নিয়ে
> অন্ধকার সমুদ্র স্ফীত হয়ে উঠল যেন;
> পৃথিবীর সমস্ত রূপ অমেয় তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মতো, …।
>
> (আদিম দেবতারা)

পরিহাস পরিণত হলো, বুদ্ধদেব বসু যেমন বলেছেন, সেই 'সংক্ষুব্ধ বিবমিষা'-য়। 'হো হো করে হাসি' যেন মাঝপথে থেমে গেল বীভৎসায়—'শূয়ারের মাংস' আর 'তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধে' জেগে উঠলো বমনের ইচ্ছা।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই সব বীভৎসতার ইমেজের সঙ্গে প্রায় সব সময় জড়িয়ে আছে জীবজন্তুর অনুষঙ্গ যারা বেশির ভাগই শোভন-সুন্দর নয়; এমন সব প্রাণী যাদের সংসর্গ মানুষ এড়িয়ে চলে। রাতের ট্রামলাইনকে মনে হয় 'কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো'।

একটা বীভৎসতার জুগুপ্সিত ছবির মধ্যে এসে যায় নানা ধরনের কতো জৈবিক সমাবেশ !

> বিশুষ্ক—ধূসর—
> ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকার কৃমিদের স্তর
> যেন তারা ;—অপ্সরা—উর্বশী
> তোমার আকৃষ্ট মেঘে ছিল নাকি বসি ?
> ডাইনীর মাংসের মতন
> আজ তার জঙ্ঘা আর স্তন ,
> বাদুড়ের খাদ্যের মতন
> একদিন হয়ে যাবে ;
> যে সব মাছিরা কালো মাংস খায়—তারে ছিঁড়ে খাবে। (মনোবীজ)

অনর্গল এসে যায় কালো বিড়াল, বানরবানরী, ব্যাং, ইঁদুর, ফড়িং, শেয়াল, শকুন, বেবুন, পেঁচা, ছাগল, হাঙর এই সব প্রাণীর প্রসঙ্গ। সমুদ্রতীরে রোদ পোহানো শ্বেতাঙ্গদম্পতিকে দেখে মনে হয় 'সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো'। তিনজন আধ-আইবুড়ো ভিখারী যখন একজন শাঁকচুন্নিকে নিয়ে 'গোল হয়ে বসে গেল তিন মগ চায়ে' তখন—'তাহারা গণনা করে গেল এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যায় ; /চুলের এঁটেলি মেরে গুণে গেল অন্যায় ন্যায়···' (লঘু মুহূর্ত)। জগৎ কবির কাছে যখন জীর্ণ প্রাসাদ তখন 'অনেক ফাটল নোনা আরসোলা কৃকলাস দেয়ালের পর/ফ্রেমের ভিতরে ছবি খেয়ে ফেলে অনুরাধাপুর—ইলোরার···' (অবরোধ)। জুগুপ্সা জাগায় স্পর্শ-অশুচি এই সব প্রাণী। এই সব প্রাণীর ইমেজ আবার অবয়ব দেয় ঘৃণ্যবীভৎস চরাচরকে। সব চেয়ে বেশি ক্লেদপঙ্কে লিপ্ত শূয়োর, সংখ্যায় না হোক, অন্তত বিস্ফোরক ব্যবহারে। যেমন—

> ১ হায়, সোনালি বাঘ-প্রেত,
> তোমাদের জন্য শূয়ারের মাংস
> শূয়ারের মাংস শুধু ;

মৃত্যু তোমাদের ফেলে দিয়েছে
অন্ধকারে অচল অভ্যাসের ভিতর। (হঠাৎ-মৃত)
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত শত শূকরের চিৎকার যেখানে,
শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর,
এই সব ভয়াবহ আরতি! (অন্ধকার)

জীবনানন্দকাব্যের তৃতীয় অধ্যায়ে সংসার বাস্তবিক ভয়াবহ। এখানে 'মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম', 'সব কাথ বাথরুমে ফেলে' ক্লেদাক্ত মলিন, সূর্যাস্তও এই মৃত-মুমূর্ষু পৃথিবীতে 'বেহেড আত্মার মতো'। প্রেমহীন চরাচরে 'চীনে বাদামের মতো' বিশুষ্ক বাতাস, নগরীর রাত্রি শ্বাপদসংকুল লিবিয়ার জঙ্গলের মতো। (জীবনানন্দের এই বিবমিষার সঙ্গে মনে হয় যেন সুইফ্‌টের 'disgust obsession'-এর সাদৃশ্য আছে। মিডলটন মারে সুইফ্‌টের রচনায় যে 'Excremental Vision' দেখেছিলেন, সেই বীভৎস-ক্লেদময়তার ছবি যেন এখানেও মেলে। আর জগতের প্রতি বিরূপ বিতৃষ্ণায় এখানেও সেই 'Peculiar emotional intensity' আছে, যা সুইফ্‌টের রচনায় লাভিস্‌ লক্ষ্য করেছিলেন।)

এই ঘৃণার্হ জগতে প্রেমহীনতার সঙ্গে আছে অন্নহীনতা, দারিদ্র্য। ভিখারীকে দেখি, 'ধূসর বাতাস খেয়ে একগাল—রাস্তার পাশে/ধূসর বাতাস দিয়ে করে নিল মুখ আচমন।' অন্যত্র পাচ্ছি—'অন্ন নেই। হৃদয়হীনভাবে আজ / মৈত্রেয়ী ভূমার চেয়ে অন্নলোভাতুর।/ রক্তের সমুদ্র চারিদিকে ;/ কলকাতা থেকে দূর/গ্রীসের অলিভ-বন/অন্ধকার' (দীপ্তি)। এই বীভৎসতার মানচিত্র দেখে দেখে এক দুরপনেয় হতাশা এই দ্রষ্টাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যে সময়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে-হয়ে ক্লিশে হয়ে গেছে, সেই সময়ে বসে সম্পূর্ণ ক্লিশে-মুক্ত ভাষায় সেই বৈষম্যের অসহায়তা আঁকলেন জীবনানন্দ

—'নিলেমের ঘরবাড়ি আসবাব—অথবা যা নিলেমের নয়/ সে-সব জিনিস/বহুকে বঞ্চিত করে দুজন কি একজন কিনে নিতে পারে।/ পৃথিবীতে সুদ খাটে : সকলের জন্যে নয়।/ অনির্বচনীয় হুণ্ডি একজন দুজনের হাতে।/ পৃথিবীর এই সব উঁচু লোকেদের দাবি এসে/সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।' আর এই বৈষম্যের শিকার যারা সেই ইয়াসিন হানিফ মকবুল করিম আজিজ গগন বিপিন শশী— 'পাথুরেঘাটার, মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রীটের, এনটালির'—তারা দুর্ভিক্ষ দাঙ্গায় বিপর্যস্ত হয়। 'জীবনের ইতর শ্রেণীর/ মানুষ তো এরা সব; ছেঁড়া জুতো পায়ে / বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে···' (১৯৪৬—৪৭)। 'এই সব দিনরাত্রি' নামক কবিতায় প্রেমহীন অন্নহীন মানুষের এই তমিস্রাগাঢ় নিয়তির রূপায়ণ পাই। মানুষের সত্তার অন্ধকার এবং মানুষের সামাজিক পরিস্থিতির অন্ধকার যুগপৎ শরীরী হয়েছে এই রচনায়।

> জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে;
> অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে।···
> যাদের আস্তানা ঘর তল্পিতল্লা নেই
> হাসপাতালের বেড হয়তো তাদের তরে নয়।···
> এ রকম ভাবে চলে দিন যদি রাত হয়, রাত যদি হয়ে যায় দিন,
> পদচিহ্নময় পথ হয় যদি দিকচিহ্নহীন,
> কেবলি পাথুরেঘাটা নিমতলা চিৎপুর—
> খালের এপার-ওপার রাজাবাজারের অস্পষ্ট নির্দেশে
> হাঘরে হাভাতেদের তরে
> অনেক বেডের প্রয়োজন;
> বিশ্রামের প্রয়োজন আছে;
> বিচিত্র মৃত্যুর আগে শান্তির কিছুটা প্রয়োজন।

এই তবে পরিণাম! 'প্রমত্ত কালো গণিকার উল্লোল সঙ্গীতে' সবই কি নরক শ্মশান হবে, শ্রাবণধারার মতো ক্লেদরক্ত চিরটাকাল কি নির্গলিতভাবে বর্ষিত হবে? এই অন্ধকার, বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়,

'মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর', যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রবিপ্লব, অপরিসীম লালসা, 'অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া'-র প্রিয়তম সাধ—এই কি অসংবরণীয় নিয়তি! সত্তার এই অসুখের কি কোনো চিকিৎসা নেই, শুশ্রূষা নেই, নিরাময় নেই? 'শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ'। সে রাষ্ট্র কি চিরকাল দূরেই থাকে, অথবা সেই রাষ্ট্র একদিন ভবিষ্যতে কাছে আসবে এই জেনে কবি কি রাত্রির চিত্রপরম্পরাই শুধু এঁকে যাবেন? স্বচক্ষে দেখা ভয়ঙ্কর জাগতিক চেহারায় শেষ পর্যন্ত শিউরে উঠেছিলেন জীবনানন্দ। চতুর্দিকের অন্ধকার থেকে উত্তরণের জন্যে তিনি আকুল হয়ে উঠেছিলেন।

> সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে
> ভয়াবহ ডাইনীর মতো নাচে—ভয় পাই--গুহায় লুকাই :
> লীন হতে চাই—লীন—ব্রহ্মশব্দে লীন হয়ে যেতে
> চাই। (ইতিহাসযান)

এই চাওয়া, এই আকুলতাই জীবনানন্দকাব্যের চতুর্থ অধ্যায়।

'পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা/সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।'

আমার এই জীবনের ভোরবেলা থেকে—/সে সব ভূখণ্ড ছিল চিরদিন কণ্ঠস্থ আমার; / একদিন অবশেষে টের পাওয়া গেল/ আমাদের দুজনার মতো দাঁড়াবার/তিল ধারণের স্থান তাহাদের বুকে/ আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে নেই' (ভাষিত)। কবিজীবনের ভোরবেলার বস্তুবিশ্ব 'কণ্ঠস্থ' ছিল, তারপর 'পরিচিত' পৃথিবী প্রথমে অপরিচিত মাত্র, পরে নিদারুণ বীভৎস হয়ে গেল। দিব্যদর্শিতার রঞ্জনরশ্মিতে ধরা পড়ে গেল পৃথিবীর এই যে গভীর গভীরতর অসুখ, এর কি কোনো সংশোধন নেই—এই জিজ্ঞাসা শেষ অধ্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দ বারবার করেছেন। 'এ রকম কেন হয়ে গেল তবে সব/ বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কলিক এসে দাঁড়াবার আগে।/ একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে/আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে (ভাষিত)?'

একবার শোণিত-মেশানো নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে তিনি সংশয়াপন্ন—

> নিসর্গের কাছ থেকে স্বচ্ছ জল পেয়ে তবু নদী মানুষের
> মূঢ় রক্তে ভরে যায়; সময় সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে, 'নদী
> নির্ঝরের থেকে নেমে এসেছো কি? মানুষের হৃদয়ের থেকে?'
> (এইখানে সূর্যের)

অন্য সময় আবার স্বচ্ছ উজ্জ্বল জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে অনাস্থা-সংশয়কে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি আস্থায় বিশ্বাসে আপ্লুত হয়ে যান।

> নিজের নুড়ির পরে সারা দিন নদী
> সূর্যের—সুরের বীথি,—তবু
> নিমেষে উপল নেই—জলও কোন্ অতীতে মরেছে;
> তবুও নবীন নুড়ি—নতুন উজ্জ্বল জল নিয়ে আসে নদী···। (জনান্তিকে)

যদিও এক সময় সোফোক্লিসের মতো মনে হয়েছিল 'মাটির পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,/না এলেই ভালো হত অনুভব করে', কিন্তু শিশির-শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে পরে মনে হয়েছে এক গভীরতর লাভ হল। যদিও 'দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়' তবুও প্রগাঢ় প্রত্যয় জন্মায় 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়' (সুচেতনা)।

কাব্যের চতুর্থ অধ্যায়ে জীবনানন্দ তিমিরবিনাশী, তিনি তিমিরহননে উৎসুক। অন্ধকারকে ভেদ করতে চান, অবিশ্বাসকে অতিক্রম করতে চান, বীভৎসতা ও জুগুপ্সার ক্লেদপঙ্ক মুছে অমলিন স্নিগ্ধতার সন্ধানী তিনি আজ। 'নব নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে' তিনি চলেছেন,

> সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
> চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষণ্ন হৃদয়;—
> জয়, অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়। (সময়ের কাছে)

পূর্বপরিকল্পনার খশড়া কেউ করেন না, তবু নিজের অজ্ঞাতসারে

একটা পূর্ণবৃত্ত বড় কবি রচনা করেন। তাই তৃতীয় থেকে চতুর্থ অধ্যায় জীবনানন্দের পক্ষে অনিবার্য ছিল, কারণ অপ্রধান কবির নিয়তি জীবনানন্দের নিয়তি নয়। তবে অনেক সময় প্রাক্তন অন্ধকার থেকে এই উত্তীর্ণ হওয়ার আস্থাকে জীবনানন্দ বিশ্বাস্য করে তুলতে পারেন নি। অনেক সময় বিশ্বাসের জন্য কবির আকুলতা যতো প্রবল মনে হয়, ততো নিবিড়ভাবে সেই আলোকে কবিতায় তিনি সব সময় অপ্রতিরোধ্য পরিণাম হিশেবে দেখাতে পারেন না। মাঝে-মাঝে অমোঘতার অভাব পীড়িত করে আমাদের। যেমন '১৯৪৬-৪৭' কবিতার তমিস্রার অসামান্য বর্ণনার শেষে বীতশোক স্নিগ্ধতার কথা, আস্থাবাচক সিদ্ধান্ত অনেকটা আরোপিত মনে হয়। হয়তো খানিকটা বেশি সময় পেলে শেষ অধ্যায়ের আলোকে তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের বীভৎসতার ভিত্তির উপর আরো অমোঘ এবং অনিবার্যভাবে স্থাপিত করতে পারতেন।

কিন্তু সে যাই হোক, কিসের অভাবে সব নির্দেশ ভুল হয়ে গেল? কী ফিরে এলে তবে আবার সব বিশুদ্ধ হতে পারে? জীবনানন্দ ইতিহাসের গতি সম্বন্ধে, সময়কালের রাজনীতি ও সমাজনীতির বিষয়ে খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন। প্রাথমিক ঋতুতে তিনি নির্জন কবি হলেও, তৃতীয়-চতুর্থ অধ্যায়ের জীবনানন্দ সম্বন্ধে নির্জনতার আখ্যা খুবই ভুল। কিন্তু সব জেনেও বিশুদ্ধতার ঔষধ কোনো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতবাদে তিনি খোঁজেন নি। তিনি জানতেন যে ইচ্ছাশক্তিতে নিরাময় হয় 'সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়, / আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়' (সুরঞ্জনা)। কবির চোখ দিয়ে তিনি বিপন্ন জগৎকে দেখেছেন, কবির ধরনেই তিনি ত্রাণের পথ খুঁজেছেন। খুঁজেছেন, প্রেমে। গাঢ় আত্মবিশ্বাসে শেষ পর্যন্ত তিনি উচ্চারণ করেছেন—'প্রেম / ক্রমায়াত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি' (অনেক নদীর জল)। প্রেমের অভাবেই

সব কিছু অন্ধ হাহাকারময় এই কথা কাব্যের চতুর্থ অধ্যায়ে বারবার মেলে। প্রেম নেই বলে সব ব্যর্থ, মানুষে-মানুষে দুরতিক্রম্য বিচ্ছিন্নতা—'মানুষের প্রাণে কোনো উজ্জ্বলতা নেই, / শক্তি আছে, শান্তি নেই, প্রতিভা রয়েছে ব্যবহার নেই, / প্রেম নেই, রক্তাক্ততা অবিরল…' (মহাত্মা গান্ধী)।

জনতার হৃদয়ের ভীতি
মেধা নয়—সেবা চায় ;—তাই ভেঙে ধ্বসে গেল অমোঘ সমিতি ;—
অস্বীক্ষায় উচ্চারণে রয় কি হাঁসের ডিম মৃত্তিকায় খাড়া ?…
…এই সব ঘাস, হরিতকী, সূর্য মনে হয় যেন প্লিওসিন
হাড়গোড়ে পড়ে আছে নিরুত্তেজ মানুষের প্রেমের অভাবে।

(১৩৩৬-৩৮ স্মরণে)

পৃথিবীর ভরাট বাজারভরা লোকসান, লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত আমিষগন্ধ ঠেলে 'আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই—প্রেমে।' শুধু কর্মিষ্ঠতা কিছু নয়, শুধু জ্ঞান বন্ধ্যা, 'জ্ঞান চায় প্রেম'। কেননা, 'রেললাইনের মতো পাতা জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্তহীন কার্যকারিতায় / সুখ আছে, সৃষ্টি নেই। অনেক প্রবাদ আছে প্রেম নেই' (এইখানে সূর্যের)। যেখানে প্রেম নেই, সেখানে প্রতিভা কৌশল মাত্র। জীবনানন্দ অনুভব করেছিলেন প্রেমহীনতা আর অস্তিত্বহীন শূন্যতা সমার্থক।

এই বিমূর্ত প্রেম প্রতিমা নিয়েছে, যেমন নেয়, নারীর মধ্যে শূন্যের মধ্যে সে-ই জ্যোতিই পদ্মের মতো আত্মস্থ সুষমায় বিরাজমান।

আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যের মতো অপার অন্ধকারে মাইলের পর মাইল।…
সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, নারি,
অবাক হলাম না।
হতবাক হবার কী আছে ?
তুমি যে মর্ত্যনারকী ধাতুর সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠেছ নীল
স্বর্গীয় শিখার মতো…। (সময়ের তীরে)

প্রেমের প্রতিমা এই নারী পবিত্র শিখার মতো শুধু আলো দেয় তাই নয়, অস্তিত্বের বীভৎসতা-কেও সহনীয় করে তোলে। 'মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালোবেসে / বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে' (তোমাকে)। জ্যোতির উৎস নারীকে তাই, অন্ধকার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি পবিত্র প্রার্থনার স্বরে, আবাহন করে বলেন 'হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে / তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে' (মকরসংক্রান্তির রাতে)।

শেষে কোনো নির্বিশেষ নারীও নয়। আলো এসে সংহত হল এক জায়গায়--নির্বিশেষ নারী থেকে গুটিয়ে এনে বিশেষ। 'তবুও নারীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষায় জল, সূর্য মানে আলো ;/এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো' (মিতভাষণ)। নারীত্বের সারবত্তা এই 'তুমি'তেই কবির পরম বিশ্বাস, প্রগাঢ় আস্থা।

> তোমার বুকের পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল ,
> তোমার বুকের পরে আমাদের বিকেলের রক্তিম বিন্যাস ;
> তোমার বুকের পরে আমাদের পৃথিবীর রাত ,
> নদীর সাপিনী, লতা, বিলীন বিশ্বাস। (তোমাকে)

যে নারকীয় বীভৎসতার মানচিত্র জীবনানন্দ এঁকেছেন তৃতীয় অধ্যায়ে, তা কবির মনে জাগিয়েছিল অদম্য বিবমিষা। তার থেকে তিনি উদ্ধার চেয়েছেন আলোয়, পবিত্র নির্মল জলধারায়—আর সেই আলোর দ্যুতি আর জলের শুশ্রূষা যার মধ্যে সাকার সেই নারীর মধ্যে।

> ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি
> ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
> শত জলঝর্ণার ধ্বনি। (হে হৃদয়)

নারীর মধ্যে সেই জলঝর্ণার ধ্বনি আর মালিন্যমুক্ত পবিত্র দুর্ঘটনা ঘটার সময় পর্যন্ত, সেই আলো ও পবিত্রতার অসমাপ্ত অধ্যায় রচনায় জীবনানন্দ ব্যস্ত ছিলেন।

'নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা' সুধীন্দ্রনাথ

সুধীন্দ্রনাথ সভ্যতার, কবি। ব্যক্তিগত অনুভূতি তাঁর কবিতায় বিশ্ববেদনায় স্তম্ভিত হয়ে গেছে। যদিও তিনি 'জনসংঘের বিভীষিকায়' 'জনতার জঘন্য মিতালি'-তে চিরকাল জুগুপ্সা বোধ করেছেন, তবু তিনি আত্মনিমগ্ন নির্জনতার কবি ছিলেন না, কারণ তিনি জানতেন সভ্যতার বাইরে ব্যক্তিসত্তার কোনো অস্তিত্ব বা মুক্তি নেই। তাঁর সমগ্র কাব্য এক বন্ধ্য নায়কের হাহাকার, সভ্যতার মর্মেই সেই হাহাকারের উৎস। 'সংবর্ত' কবিতায় তিনি বলেছেন 'কিন্তু মানবেতিহাসে মাঝে মাঝে আসে মলমাস', সুধীন্দ্রনাথের সব কবিতাই মানবসভ্যতার বর্তমান মলমাসের প্রতিচ্ছবি।

বন্ধ্যাত্ব, অক্ষমতা, নিষ্ফলতাবোধ সুধীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান কথা। সেই কারণে এই কবিতার প্রকৃতি শীত ও হেমন্তের প্রকৃতি। রাজা যেমন পুরুষত্বহীন, রাজ্যও তেমনি বন্ধ্যা। ব্যক্তিগত প্রেম নিরঙ্কুশ মিলনে ফলবতী হয় না, সভ্যতাও আজ শুভ ও মঙ্গলের জন্ম দিতে অপারগ। তাই নষ্ট ভ্রষ্ট সভ্যতাকে পশ্চাৎপটে রেখে ধূমায়িত রিক্তমাঠে, হেমন্তলোহিত গিরিতটে, রূপজীবী জরতীর মতো হেমন্তসন্ধ্যায় এই কাব্যের নায়ক-নায়িকা ভ্রমণ করে এবং তাদের চারিদিকে অঘ্রানের অত্যাচারে পাকা পাতা ক্রমাগত ঝরে পড়ে। এলিয়টের বন্ধ্যাভূমি সুধীন্দ্রনাথের মরুতে, এবং এলিয়টের 'cactus land' সুধীন্দ্রনাথের ফণিমনসায় প্রতিফলিত। বারবার সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় সেই এক ছবি—'ধূ ধূ করে মরুভূমি ;/ ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।' 'ফণিমনসায় ঘেরা উপহাস্য মরুমায়া', 'বন্ধ্যা ফণিমনসা' এবং 'শত শ্রেয় মরুভূমি—সম্মার্জিত সন্তপ্ত সিমূমে ;/বন্ধ্যা ফণিমনসায় কণ্টকিত, বিষাক্ত ধূসর।' এলিয়টের কবিতায় শুনি 'London Bridge is

falling down falling down falling down' এবং অন্যত্র এলিয়ট বলেছেন মরুভূমি কোনো গ্রীষ্মমণ্ডলে নেই, মরুভূমি আছে টিউবট্রেনে তোমারই পাশে, তোমার ভাইয়েরই হৃদয়ে। 'যযাতি'-তে যুগপৎ সুধীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন 'তাই ভগ্ন সেতু নদীতে নদীতে/ মরু নগরে নগরে…।' এই মরুভূমির আকণ্ঠ পিপাসার মধ্যে, শুদ্ধি ও মঙ্গলের প্রতীক অঞ্জলিবদ্ধ পবিত্র জলের কোনো সাক্ষাৎ বা সম্ভাবনা নেই। যে বৃষ্টিধারায় স্নিগ্ধ শুদ্ধ হয়ে নতজানু মানুষ ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়, বন্ধ্যা সভ্যতার জমিতে সেই বৃষ্টিপতন আর হয় না। হপকিন্সের নিজেকে মনে হয়েছিল সৃষ্টি-ক্ষমতাহীন 'Time's eunuch'; তিনি প্রার্থনা করেছিলেন 'Mine, O Thou lord of life, send my roots rain.'। এলিয়টের বন্ধ্যা পৃথিবীতে শুধুই পাথর, জল নেই। সুধীন্দ্রনাথও সেই একই পিপাসায় জর্জরিত— 'ভ্রাতৃরক্তে সিক্ত মাটি, তবু ক্ষয়/এবং পিপাসা এখানে সর্বতোব্যাপী।'

আসলে সুধীন্দ্রনাথ সেই নরকের অধিবাসী, যার প্রথম বাসিন্দা ছিলেন বোদলেয়ার। গ্যেটের মানবতাবাদ ও মঙ্গলধর্মে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে যেমন বোদলেয়ারের শয়তানধর্মের নারকীয় আবির্ভাব, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মঙ্গল ও শুভবাদে অটল আস্থার বিরুদ্ধে সুধীন্দ্রনাথের নেতিবাদী শূন্যবাদী ঘোষণা। 'দশমী' পর্যন্ত পৌঁছিয়েও তিনি ঐ নেতিবাদে শূন্যবাদে আত্মস্থ—

> অবশ্য অপ্রতিকার্য অন্তিম কুম্ভক :
> অনুত্তার্য নাস্তির কিনারা ;
> বৈকল্যের ষড়যন্ত্রে তুল্যমূল্য তুঙ্গী ধ্রুবতারা
> ও মগ্ন চুম্বক। (নৌকাডুবি)

এই নাস্তির নরক রোগগ্রস্ত, পচনশীল শবে পরিপূর্ণ, পূতিগন্ধময় বেশ্যায় ভরপুর। সুধীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, পিশাচের উপজীব্য হওয়াই জীবনের সার কথা, শবের সংসর্গ ও শিবার সদ্ভাব এড়িয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব এবং মানসীর দিব্য আবির্ভাব একমাত্র স্বপ্নেই

সম্ভব, জাগরণে আমরা একাকী। দান্তের মতো তিনি নরকে ক্ষণকালের পরিদর্শক ছিলেন না, তিনি সেখানে বোদলেয়ারের মতো স্থায়ী বাসিন্দা। আর এই পরিবেশে দীর্ঘ বসবাস তাঁকে 'সর্বান্তক বিনাশে' বিশ্বাসী করে তুলেছিল।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের নায়ক যৌবন অতিক্রম করে প্রৌঢ়িতে পা দিয়েছে, বার্ধক্য দূরে নয় আর। বার্ধক্যে বা জরায় যে উপেক্ষিত আগুন শরীরের ভস্মের আড়ালে চাপা পড়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন সাপের জিভের মতো তীব্র বিষে লকলক করে ওঠে, সেই বিধ্বংসী বিষাক্ততাও তার মধ্যে নেই। বাইবেলের 'জোবে', শেকসপীয়রের 'লিয়ারে', ইয়েটসের কবিতায় লুপ্তশক্তি বার্ধক্যের যে দাহদীপ্র বহ্নি দেখেছি, সুধীন্দ্রনাথের নায়কে তাব কোনো আভাস নেই ; সে রাগতে জানে না, বিশ্বচরাচরকে অভিশাপ দিতে জানে না। তার শুধু বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতা এবং নির্বেদ। অচরিতার্থ প্রেম নিয়ে সে নিরাসক্তভাবে নায়িকাকে বলে 'আমারে তুমি ভালোবাসো না বলে/দুঃখ আমি অবশ্যই পাই ;/কিন্তু তাতে বিষাদই শুধু আছে,/তাছাড়া কোনো যাতনা জ্বালা নাই' (নিরুক্তি)। প্রৌঢ় সভ্যতার পরিপেক্ষিতে প্রৌঢ় নায়ক যৌবনের সমস্ত জ্বালা বুকে নিয়ে বন্ধ্যা বিষাদে আত্মবীক্ষায় রত।

কিয়ের্কেগার্ড যাকে 'anguish of isolation' বলেছিলেন সেই মর্মান্তিক অনুভূতি সুধীন্দ্রনাথের প্রত্যেক চরণে যেন জাজ্বল্যমান। যৌবনে, যেন অর্ধবিস্মৃত গতজন্মে দেহময় প্রেমের দাক্ষিণ্য এই নায়কের জীবনে অকস্মাৎ একদিন এসেছিল, 'নশ্বর আশ্লেষে তার নিমেষের বিশ্ববিস্মরণ'-এর সেই তীব্র স্মৃতি আজও জাগরূক।

> সনাতন অন্ধকারে মিশে
> নিঃসঙ্কোচ জৈবধর্মে করেছিল মোরে সম্প্রদান
> অনির্বচনীয় তনু। (ব্যবধান)

সঙ্গমের চূড়ান্ত মুহূর্তে ভুলে গিয়েছিল বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা, মুহূর্তের জন্য তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সর্বচরাচরের সঙ্গে। কিন্তু সে অমর্ত্য ঘটনা আজ জন্মান্তরের স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত, রুগ্ন গোলাপের বুক সেই স্মৃতির কীট আজ শুধু কুরে কুরে খায়। উন্মার্গগামী সভ্যতার থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এই বিষণ্ণ নায়ক। বারবার বিশ্বাসের বিনাশ সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে পুরাণপাখির মতো শুভ ও শান্তি জন্ম নেবে। 'সংবর্ত'-এর '১৯৪৫' কবিতায় বলেন সেই বিশ্বাস চুরমার হয়ে গেছে—'এরই আয়োজন অর্ধশতক ধরে, / দু-দুটো যুদ্ধ একাধিক বিপ্লবে ; / কোটি কোটি শব পচে অগভীর গোরে, / মেদিনী মুখর একনায়কের স্তবে।' এবং 'যযাতি' কবিতায় বললেন আরো স্পষ্টভাবে—

> জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
> বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
> নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
> যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।

এই সভ্যতা-সচেতন মানুষ সভ্যতার বিনষ্টি দেখে নিঃসঙ্গ একাকীত্ব ছাড়া, ব্যক্তিপুরুষের কেন্দ্র ছাড়া আর কোথায় আশ্রয় পেতে পারে, যদিও সে আশ্রয় নিরাশ্রয়ের নামান্তর। সুধীন্দ্রনাথ জেনে গেছেন 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'।

এই একাকীত্ব, এই নিঃসঙ্গতা, ইতিহাসের বিস্তীর্ণ দেশকালের প্রেক্ষাপটে প্রতিফলিত বলেই এতোটা মারাত্মক। বড় কবির লক্ষণ যে ইতিহাসচেতনা প্রথম থেকেই সুধীন্দ্রনাথে তা পাওয়া যায়। তিনিও সার্ত্রের প্রতিধ্বনি করে বলতে পারতেন 'Brutally reintegrated into history, we had no choice but to produce a literature of historicity' (Situation of the Writer in 1947)। মজ্জায়-মজ্জায়

ইতিহাসকে উপলব্ধি করে তিনি জেনে গেছেন কোনো স্থির কেন্দ্র বা 'gamma point' নেই, সবই আপেক্ষিক, নৈমিত্তিক। 'ঐতিহ্য ও টি. এস. এলিয়ট' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'প্লেটো-প্রবর্তিত অতিমর্ত্যলোক আমার চক্ষে যদিও সুন্দর ঠেকে, তবু তার স্বপ্নস্বচ্ছ অমরতা আমি কোনো মতে ভুলতে পারি নে।' এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও আশ্চর্য সাহসিকতা। ঈশ্বর বা অন্য কোনো অপরিবর্তনীয় ধ্রুবে বিশ্বাস না রেখেই তিনি বিরূপ বিশ্বের সম্মুখীন হয়েছেন। তাছাড়া নিজের চৈতন্য-অনুভূতিকে কালজ্ঞানী ইতিহাসের প্রচ্ছদে অর্পিত করা সহজ ক্ষমতার বা সহজাত ক্ষমতার কাজ নয়। এজন্য চাই কবির্মনীষার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের আভিজাত্য, যা সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল—সেই আভিজাত্য যা নিজের মহিমা ভোলে না, আবার নিজের সীমাও ভোলে না। ইতিহাসচেতনা বা কালজ্ঞান শেষ পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় নিয়তিবাদের রূপ নিয়েছে। এই নিয়তিবাদ হিন্দুশাস্ত্রের কর্মফলবাদ নয় যা জন্মান্তর ও সুকৃতির শেষে পুরুষকারের আশা দেয়; এই নিয়তিবাদ অন্ধ-যান্ত্রিক, ন্যায়-অন্যায় বিষয়ে নির্বিকার ও উদাসীন। সে মানুষের হাত থেকে পরম বিশ্বাসের সমস্ত আশ্রয় একে একে ছিনিয়ে শুধু এক নিরঙ্কুশ শূন্যতাকেই রেখে যায়। মানুষের স্বাভাবিক মমতার দুর্বলতায় এক-একবার মনে হয়—'তোমার মাভৈ শুনে হয়তো বা লজ্জিত নিয়তি / ফিরাবে, অভ্যাস ভুলে, ঐকান্তিক সময়ের গতি···' (দুঃসময়)। কিন্তু যে স্বচ্ছ চৈতন্য সমস্ত ভ্রান্তির প্রান্তে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে সে মোহগ্রস্ত হয় না—কারণ বিচারক্ষম নয় 'অন্ধ, অনাথ নিয়তি।' তাই এই নিয়তিবাদী মানুষ শূন্যতার উত্তরাধিকার হাতে নিয়ে 'ভবিতব্যভারাতুর' এবং 'এক রুদ্ধশ্বাস দুঃসহ বেদনাবোধে' আক্রান্ত এবং এই মনোভাব, বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'পেগান, অন্ধ, অধার্মিক, আধিভৌতিক, নির্মল, অনতিক্রম্য।'

বর্তমান অধঃপতিত হীনজীবী যুগে ভূষণ্ডী কাক সেই নির্মম কাল-জ্ঞানের প্রতীক ; আর সেই 'ভূষণ্ডী কাক রক্তপঙ্ক খোঁটে।' কেননা অতিক্রান্ত কাল থেকে আরম্ভ করে আগন্তুক কাল পর্যন্ত যেদিকে কবি দৃষ্টিক্ষেপ করেন সেই দিকেই বন্ধ্যাভূমি ভেজা, পবিত্র জলে নয়, পঙ্কিল রক্তে। তাই 'বিকারের উপরে কি বিনষ্টিও সৃষ্টির নিয়তি ?' —এই প্রশ্ন আসলে আর প্রশ্ন নয়। সেই কারণেই সভ্যতার শিয়রে নির্বাক বিবেকের মতো দণ্ডায়মান বেদনার্তমুখ যীশুর উদ্দেশে কবি জিজ্ঞাসা করেছেন 'সংবর্তে'-র 'উজ্জীবনী' কবিতায়—

> এই পরিণামের লোভে কি
> জন্মালে নারীর গর্ভে, আত্মবলি দিলে নরমেধে,
> কণ্টককিরীট পরে, বিনা ধনুর্বেদে
> হলে দুঃস্থ ধূলির সম্রাট··· ।

এই অবস্থায় পলায়নই তাহলে মুক্তি ? কিন্তু 'পলায়ন শশবৃত্তি'। তাছাড়া 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে ?' এই অবস্থায়, প্রথমত, আমরা মানুষের মহত্তম ঐতিহ্যে বিশ্বাস রাখতে পারি। 'মানবের অগ্রজেরা আমাদের মর্যাদা শেখাবে ; ছায়া দেবে বনস্পতি'—চতুস্পার্শ্বে ঘনায়মান অন্ধকারে তাই হয়তো আশ্রয়। কিন্তু চারিদিকের চক্রান্তকারী অবিশ্বাসী পরিবেশের মধ্যে শেষ পর্যন্ত আস্থা স্থাপন করা যায় মাত্র নিজের উপর। পরাজয় নিশ্চিত ও অনিবার্য জেনেও অবিচলিত ও বিনীত ধৈর্যে সিসিফাসের মতো ক্রমাগত ব্যক্তিগত দায়িত্বের ভারি পাথর ঠেলে উঁচুতে তোলার চেষ্টা করা যায়। যে পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে সার্ত্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন 'total responsibility in total solitude', সেই ধরনের পরিস্থিতির ব্যূহবেষ্টনে ক্ষণবাদী সুধীন্দ্রনাথ 'সংবর্ত'-এর ভূমিকায় বলেছেন বৌদ্ধদের মতো বৈনাশিক বলেই তিনি কর্মে আস্থাবান এবং তাঁর বিবেচনায় স্বাবলম্বী কর্তা জগৎ-সংসারের মূলাধার। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে জীবনানন্দ তাই বলেছিলেন 'অবিশ্বাস এখানে কপটতা করে

পথভ্রষ্ট হয় নি, নিজেকে বিশ্বাস করেছে' (উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য)। নেতির ভয়ঙ্কর খাদের কিনারে এসে আজ আপন চৈতন্যের ক্রিয়া ও গতিকে লক্ষ্য করা ছাড়া পথ নেই। ভালেরির কাব্যে মরুভূমির মতো বন্ধ্যাত্বে আত্মসচেতনতার একাকী পামগাছ যেমন আশ্রয়, তেমনি সুধীন্দ্রনাথ চৈতন্যের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন উপনিষদের সেই মহাবৃক্ষকে—

> ঊর্ধ্বমূল, অধঃশাখ, দুর্নিরীক্ষ্য সেই মহীরুহ,
> যাকে কেন্দ্র করে ছোটে দিগ্বিদিকে সমুদ্র—না মরু? (যযাতি)

স্বল্পপ্রাণ প্রমোদের কণা সংগ্রহ করে যে জন্মান্ধ ভূমাবিরচনা করে, সেই জন্মান্ধ হবার বিন্দুমাত্র বাসনা কবির নেই, গলিত শবের গন্ধ ঢাকার জন্য তিনি শ্মশানে রজনীগন্ধার গুল্ম রোপন করতে চান নি—তিনি একই সঙ্গে সত্যবাদী ও ক্ষণবাদী; তিনি জানেন আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও তার জের এই সংসারও নিমেষে তামাদি হয়ে যায়। সততাই সর্বশেষ সহায়; সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন 'চৈতন্য, বিশুদ্ধ চৈতন্য, আর সংকল্প, নিরহংকার সংকল্প, এই দুটি দুর্লভ গুণের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের পারিপার্শ্বিক নাস্তির মধ্যে কোনো রকমের শৃঙ্খলা আনা অসম্ভব' (কাব্যের মুক্তি)। তাই নিজের রচনার উপরও তিনি মমতা পোষণ করেন না, বৈরাগীর মতো বিশ্বাস করেন—'এবারেও যা গাহিব, যাযাবর কালের লুণ্ঠনে অনর্থক প্রলাপে তা অচিরাৎ হবে পরিণত' (মৌনব্রত)। ব্রহ্মাণ্ডের মূলে যদি কোনো মাঙ্গলিক নিয়ম নাও থাকে, তবু কবির পক্ষে এমন একটা নিয়মের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক যার সূত্রে আমাদের দিনানুদৈনিক খণ্ড অভিজ্ঞতাগুলো সার্থক ও সংগ্রথিত হতে পারে। সেই প্রয়োজন সুধীন্দ্রনাথ মিটিয়েছেন, ভালেরি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে বুদ্ধির সন্ন্যাস তারই সাহায্যে : এই বুদ্ধির সন্ন্যাসই তাঁকে নৈরাজ্যের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

রুগ্ন পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে, প্রতিষেধহীন ক্ষতচিহ্ন হৃদয়ে বহন করে, চৈতন্য ও ব্যক্তিস্বরূপকে আশ্রয় করে এই কাব্যের জন্ম। এই

কবিতাবলীর শক্তি, আধুনিক মানুষের কাছে তার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের উৎস আছে, রোগের ক্ষয়ের সৎ স্বীকৃতির মধ্যে। ফিলোকটেটস নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে এডমাণ্ড উইলসন দেখিয়েছেন মহত্তর সামর্থ্যের বোধ অন্য কোন অক্ষমতা বা অসামর্থ্যের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত। নির্জন দ্বীপে বন্ধুজনপরিত্যক্ত ফিলোকটেটস একাকী ক্ষতের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেছে বটে, তবু তারই কাছে আছে সেই অপরাজেয় ধনুক যার সাহায্য ব্যতিরেকে বিজয় অসম্ভব। ফন্দীবাজ অদেসিউস ভেবেছিল ক্ষতপ্রপীড়িত এই মানুষটিকে বাদ দিয়ে সরলমতি নিওপ্‌টলেমাসের সাহায্যে ধনুকটি সে বাগিয়ে নেবে। সে বোঝেনি যে ফিলোকটেটসের সামর্থ্যকে তার অসামর্থ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাওয়া যায় না—দুই ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। বরং বলা যায় পূতিগন্ধময় ক্ষতই তার শক্তির আসল উৎস। সুধীন্দ্রনাথও অসহ সভ্যতার মাঝখানে চৈতন্যের নির্জনদ্বীপে বসবাসকারী, নিঃসঙ্গ এবং একাকী; তিনিও ব্যর্থতার পীড়ায়, মর্মদাহে আর্তনাদ করেছেন বটে, কিন্তু স্বচ্ছচৈতন্যের আয়নায় প্রতিফলিত নেতিবাদকে বিসর্জন দিয়ে কোন সস্তা দামে স্থিতি কিনতে চান নি। তাঁরও শক্তির উৎস ঐ অন্তরদাহের তীব্রতায়।

অস্বাস্থ্যকর অজীর্ণতার মধ্যে বসবাস করে, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতায় পুরোমাত্রায় দায়িত্ব পালনের ব্রত নিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। সেই ব্রত তিনি পালন করেছিলেন কর্মী হিসেবে নয়, কবি হিসেবে। সভ্যতার জ্বালা ও ব্যক্তিগত অন্তরপীড়াকে রূপায়ণের ব্যাপারে শিল্পীর কবির দায়িত্ব অন্য রকম—কবি 'objectification of his neurosis'-এর সাহায্যে রোগ প্রতিষেধ করেন না, কিন্তু তাঁর স্বরূপ চিনিয়ে দেন অভ্রান্তভাবে। সেইটুকুও কবির কাজ। তাঁর পঞ্চম ও দশম এলিজি বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে এই কথাই রিলকে বলেছিলেন, আমাদের যন্ত্রণাকে আবেগভরে বহন করার কাজে, তার গূঢ়তর তাৎপর্য উপলব্ধির চেষ্টায় এবং তার যথাযোগ্য প্রকাশের উপায় উদ্ভাবনে, শিল্প কবিতা

প্রত্যেক মুহূর্ত নিরত থাকবে। সুধীন্দ্রনাথ যে ভালো ভাবে এই সত্য বুঝেছিলেন তার প্রমাণ আছে। 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন 'কবির ব্রত তাঁর স্বকীয় চৈতন্যের রসায়নে শুধু চৈতন্যের উদ্ভাবন।' 'অর্কেস্ট্রা'-র ভূমিকায় বলেছেন 'ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলাই কবিজীবনের পরম সার্থকতা।' তাঁর কাব্যে পূর্বাপর এই স্বেচ্ছানির্বাচিত দায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন অবিকল সংকল্পে। তাই তাঁর কাছে যে নিঃসঙ্গ নায়কের আর্তনাদ তার মধ্যে আমরা বিশ্বব্যাপী রৌরবের আর্তনাদ শুনতে পাই; তাঁর কাব্যে যে পিঙ্গল আলোর বিবর্ণতা তার মধ্যে বিশ্বব্যাপী কুম্ভীপাকের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাই। যে 'নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা' আধুনিক অনুভূতিপ্রবণ মানুষের উত্তরাধিকার, সুধীন্দ্রনাথ তাকে ধারণ করেছিলেন ব্যক্তিগত চৈতন্যে এবং রূপায়িত করে তুলেছিলেন বিশুদ্ধ চৈতন্যে, যা বিশেষরূপে দেখা দিয়েছিল তাই পরিণতি পেয়েছিল নির্বিশেষে সামান্যে।

ব্যক্তিগত বেদনাকে বিশ্ববেদনায়, একক ক্রন্দনকে ব্রহ্মাণ্ডের কান্নায় রূপান্তরিত করার দুরূহ শক্তি যে তাঁর ছিল, তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ 'সংবর্ত' কাব্যের অন্তর্গত নামকবিতা। 'সে এখনো বেঁচে আছে কিনা তা সুদ্ধ জানি না' এই ব্যক্তিগত বেদনা নৈর্ব্যক্তিক মহিমা পেয়েছে কারণ তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সভ্যতার পটভূমিকায়। সেই ভালেরি-কথিত 'that sense of a universe'-এর বোধ সামান্য সময়ের জন্যও শিথিল হয় নি। তাছাড়া বাক্‌বন্ধে শিল্পকর্মে ধ্রুপদী আভিজাত্য তীব্রতম বেদনার মুহূর্তেও আত্মসংযম ও সুমিতি হারায় নি। স্থানকে তিনি শুধু বিশ্বের তুলনায় দেখেন না, অব্যবহিত কালকেও দেখেন অতিক্রান্ত কালের পটভূমিতে। 'অর্কেস্ট্রা'-র নায়িকা বিংশ শতকের তরুণীর হাবেভাবে অভ্যস্ত হলেও তার পরণে নূপুরাদি প্রাচীন ভূষণের প্রাদুর্ভাব এবং তার আলাপে-আচরণে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রভাবের বাড়াবাড়ি দেখে কবি নিজে যদিও দুঃখপ্রকাশ

করেছিলেন, তবু সেই সমস্ত বহিরঙ্গ একদিকে যেমন তাঁর কাব্যকে ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করিয়ে দিয়েছে, তেমনি কাব্যের বাণীকে সর্বকালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করাতে সাহায্য করেছে। পুরাণ জীবন্ত সাময়িকের ছোঁয়ায় সপ্রাণ হয়েছে। কিছুতেই তাই সন্দেহ থাকে না যে এই ভোগক্লান্ত নায়ক-নায়িকা যেমন বর্তমান শতকের রুগ্নতায় জ্বরগ্রস্ত, তেমনি তারা সর্বকালের বেদনার উত্তরাধিকারী।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় অনেক ধ্রুপদী লক্ষণ চোখে পড়ে। পরিবেশের বিরুদ্ধতা রোম্যান্টিক কবির মতো তাঁকে বিদ্রোহী করেনি, তাঁর নায়ক শুধু নির্বেদের পাণ্ডুরোগে বিবর্ণ হয়েছে। বস্তুবাদী বলেই তিনি দেহবাদী এবং আদর্শবাদের সমস্ত রোম্যান্টিক ব্যাধি থেকে তিনি নিরাসক্তভাবে মুক্ত। শিল্পের আভিজাত্যবোধে তিনি কাব্যের রূপে অর্জন করেছেন সংযম ও সুমিতির দুরূহ গুণ। কালজ্ঞান ও ইতিহাস-চেতনাও আসলে ধ্রুপদী কাব্যের মৌলিক লক্ষণ। সামাজিক দায়িত্ববোধ তিনি অস্বীকার করেন নি; বুদ্ধিকে চৈতন্যকে তিনি মানুষের সব চেয়ে মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করতেন, দারুণ দুর্বিপাকেও তিনি তাকে বিসর্জন দিতে রাজী ছিলেন না। ধ্রুপদী কবির মতো এও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন 'inspiration is a mere hypothesis'; অনুপ্রেরণায় তাঁর এতটুকু আস্থা ছিল না। ধ্রুপদী আদর্শ অন্বিষ্ট ছিল বলেই তিনি ইংরেজ অগাস্টানদের শিক্ষানবীশী করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন তাঁর আঠারো মাত্রার পয়ার কেমন নিখুঁত ভারসাম্য রক্ষা করে চলে এবং পোপ ও ড্রাইডেনের অ্যান্টি-থিসিস-নির্ভর হিরোয়িক কাপলেটের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সংহতির সন্ধানে ড্রাইডেন প্রভৃতি যেমন ল্যাটিনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তেমনি সুধীন্দ্রনাথ সাহায্য নিয়েছিলেন সংস্কৃতের।

ধ্রুপদী কবি ভাষার উপর প্রভুত্ব করেন না, তিনি ভাষার ঐতিহ্যের সেবক হন। ভাষা তার নিজের আইন ও নিষেধ লেখকের উপর

আরোপ করে। সেই নিষেধাজ্ঞা মেনে নিয়েও তার মধ্যে শিল্পের সঙ্গত মুক্তি আবিষ্কার করেন একজন চরিত্রবান ধ্রুপদী লেখক। সুধীন্দ্রনাথও এই সব বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়েছিলেন ; তিনি জানতেন 'আসলে ভাষার সঙ্গত শাসন থেকে মুক্তি পাওয়া কাব্যের পক্ষে অসম্ভব', এবং জেনেই তিনি সেই শাসনের মধ্যে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলন। এই ঐতিহ্যপরায়ণ ধ্রুপদী কবি একদিনের জন্য নিয়মিত ছন্দ বর্জন করে গদ্যছন্দে কবিতা লেখেন নি। আবার সঙ্গীতগুণ ও চিত্রধর্ম অতিক্রম করে শব্দের অর্থবহতার উপর জোর দিয়েছেন তিনি চিরকাল। ধ্রুপদী কাব্যের মতো 'notion of the statement' প্রাধান্য পেয়েছে এই কাব্যে সব সময়। তাছাড়া তিনি চরণের মধ্যে প্রত্যেকটি শব্দকে মালার্মের মতো স্বতন্ত্র ওজন ও মর্যাদা দিতেন। ঠিক শব্দ নয়, বাক্য—'আমার আনন্দ বাক্যে' ; তাই মালার্মের মতো তাঁর কবিতা ব্লু-প্রিন্টের বা অঙ্কের পরম সুষমা পেয়েছে এতদূর বলা যায় না ; তবু শব্দব্যবহারে তিনি অতি সচেতন শিল্পী ছিলেন। তিনি নিজেই দাবি করেছেন তাঁর রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষা-রূপেই বিবেচ্য হোক, তাই 'কালের পুতুলে' বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'কথাকে তিনি ব্যবহার করেন, যেমন করে বাস্তুশিল্পী ব্যবহার করে ইষ্টক'।

মালার্মের কাব্যাদর্শের প্রতি সুধীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন মালার্মের আভিজাত্যবোধ ও উন্নাসিকতার জন্য, নেতিবাদ ও বিষণ্ণ জীবনাদর্শের এবং সব চেয়ে, সংহত ব্যঞ্জনাময় প্রকাশশৈলীর আকর্ষণে। মালার্মের তরীর প্রতীক 'দশমী'-র 'ভ্রষ্টতরী' ও 'নৌকাডুবি' কবিতায়, মরালের প্রতীক 'অর্কেস্ট্রা'-র 'হৈমন্তী' এবং 'উত্তরফাল্গুনীর'-র 'শর্বরী' কবিতায় প্রতিফলিত। মালার্মের ফনের মতো 'অর্কেস্ট্রা'-র নায়কও মধ্যবয়স্ক পুরুষ, শরীরের ক্ষুধানিবারণে অক্ষম অথচ প্রাক্তন রভস-মিলনের ইতিহাস স্মৃতির মাধ্যমে রোমন্থনে ব্যস্ত। কিন্তু প্রত্যক্ষ শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও ভালেরি বুঝেছিলেন মালার্মের সব আদর্শ মানা

সম্ভব নয়, বিশুদ্ধ কবিতা আয়ত্তের অতীত এক লক্ষ্যবস্তু ; বুদ্ধি এমন কি যুক্তিকেও কাব্য থেকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। সুধীন্দ্রনাথও যুক্তিবুদ্ধিকে মান্য করেছেন। শব্দকে সম্মান দিতে গিয়ে ব্যাকরণের বিপর্যয়, বাক্যের বিশৃঙ্খলা বা স্বেচ্ছাবৃত কূটত্ব ভালেরির মতো সুধীন্দ্রনাথেরও অপছন্দ। মালার্মে শাশ্বতে বিশ্বাসী, সুধীন্দ্রনাথ নন ; মালার্মের মিস্টিক অনুভূতিও সুধীন্দ্রনাথে নেই। সঙ্গীতধর্মের যে অনুচিত প্রাধান্য মালার্মে দিয়েছেন তাও সুধীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি।

মালার্মের উত্তরাধিকারী প্রতীকী কবিদের কলানৈপুণ্য তাঁকে আকৃষ্ট করলেও, অনেক প্রধান বিষয়েই তাঁদের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের মিল নেই। প্রতীকী কবিরা যেমন যত্নের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় এড়িয়ে চলেন, তেমন কোনো ছুঁৎমার্গের পরিচয় সুধীন্দ্রনাথ দেন নি। তাঁরা মনে করতেন সৌন্দর্যই তাঁদের ধ্যানের একমাত্র বিষয়, মনে করতেন কবিতার ঐক্য থাকে কবির মনে, বিষয়বস্তুতে নয়। এ সমস্ত মতে সুধীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল না। ফরাসী প্রতীকীদের মতো তিনি মনে করেন নি যে তিনি কোনো নতুন ধর্মরহস্যের প্রবক্তা, পুরাতন অমৃতনিকেতনের প্রতিহারী, অনাগত নরনারায়ণের অগ্রদূত। কোনো মহত্তর সুষমার পূজারী বলে তিনি নিজেকে গণ্য করেন নি, কবিতাকেও পরিণত করতে চান নি মন্ত্রে। প্রতীকীদের মতো তাঁর কবিতার ভাষাও অবশ্য রয়ে গেছে কথ্যরীতি থেকে অনেক দূরে, তবু অবোধ্য ভাষায় দুর্ভেদ্য কূটত্বের পরিখা নির্মাণ করে তিনি কবিতাকে নিতান্ত ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ধ্যানের ব্যাপার করে তোলেন নি বা তুচ্ছ প্রসাধন বা অলঙ্করণের সামগ্রীতে নামিয়ে নেন নি। প্রতীকী কাব্যের কারুর দিকটাই তাঁকে আকর্ষণ করেছিল, আঙ্গিকের দুর্গম পরিপূর্ণতার জন্য অহরহ চেষ্টা—যে লক্ষণ ধ্রুপদী কাব্যেরই লক্ষণ।

তবু সুধীন্দ্রনাথের কাব্য ধ্রুপদী কাব্য নয়। সে ধরনের কাব্য

রচনার জন্যে শুধু কবিপ্রতিভার প্রবণতাই যথেষ্ট নয়, অনুকূল পরিবেশ ও কালও চাই তার জন্যে। প্রতিকূল সময় ও পরিবেশের বিমুখতার জন্যেই সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বহিরঙ্গে ধ্রুপদী স্থাপত্য সত্ত্বেও তার ক্ষুধিত পাষাণে রোম্যান্টিক আর্তনাদের মুখরতা। বোদলেয়ারের মতো সুধীন্দ্রনাথও বহিরঙ্গে ধ্রুপদী ও অন্তরঙ্গে রোম্যান্টিকের দ্বিধায় দ্বিধাগ্রস্ত। ব্যক্তি ও সত্যতার যে সাযুজ্যে খাঁটি ধ্রুপদী শিল্প জন্মায়, এই সংশয়াপন্ন বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্ব-পীড়িত পরিবেশে তা জন্মাতে পারে না। ব্যক্তি ও সভ্যতার মধ্যে বিরোধ, আবার আঙ্গিক ও মর্মের দ্বিধাগ্রস্ততা—এই দ্বিধায় দোদুল্যমান কাব্য তার জন্মকালের উপযুক্তই হয়েছে। অনেক ধ্রুপদী গুণ থাকলেও এই সময়ের তাড়নাতেই সুধীন্দ্রনাথের কাব্য মজ্জায় মজ্জায় রোম্যান্টিক কাব্য। কারিগরির নবীশী করেছেন ধ্রুপদীদের বিদ্যালয়ে, স্বভাবধর্মেও তিনি ধ্রুপদী প্রবণতা পেয়েছেন, তবু তাঁর কাব্যের নায়ক আত্মস্থ সামাজিক আপোল্লোনিয়ান পুরুষ নয়, সে আত্মপীড়িত ডিয়োনিসিয়ান, বরং বলা যায় ফাউস্টিয়ান পুরুষ। কালের তাগিদেই বর্তমানের সাহিত্যসাধনা যে ধ্রুপদী পদবীর অযোগ্য তা সুধীন্দ্রনাথ নিজেই বুঝেছিলেন।

কারমোড The Romantic Image গ্রন্থে রোম্যান্টিকতার তিনটে মৌলিক লক্ষণের কথা বলেছেন। প্রথমত, রোম্যান্টিক কবি মনে করেন তিনি সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষ, একাকী মানুষ। দ্বিতীয়ত, কবির কল্পনাশক্তি তাঁকে পরাবাস্তব লোকে প্রবেশাধিকার দেয়, আর কবির সেই দিব্যদৃষ্টির বাহন হল ইমেজ, যাকে লেহ্ম্যান 'aesthetic monad' বলেছিলেন। তৃতীয়ত, কবিতার সংগঠন অঙ্কশাস্ত্রের বিন্যাসের মতো অথবা ঐতিহ্যগত উপাদানে নির্মিত স্থাপত্যের সংগঠনের মতো নয়; তার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি উদ্ভিদের মতো অন্ধ নিয়মে সম্পাদিত হয়। তিনটির মধ্যে প্রথম লক্ষণটি সুধীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে খাটে বলেই খাঁটি ধ্রুপদী কবি তিনি হতে পারেন নি। যদিও ইমেজের মাধ্যমে কোনো দিব্যদৃষ্টি তিনি মূর্ত করতে চাননি, যুক্তি-ন্যায়কে উপেক্ষা

করেন নি কোনোদিন, এবং যদিও তাঁর কবিতার সংগঠন স্থাপত্যধর্মী, উদ্ভিদের অন্ধ ও অচিন্তিতপূর্ব নিয়মে নয়।

যুক্তিবাদী হলেও বিশ শতাব্দীর ঘটনাবলী তিনি জানতেন বলে অযৌক্তিকের প্রবল সামর্থ্যের কথা তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যের তলায় অন্তঃশীল হিতবুদ্ধি হন্তারক আদিম পশুবৃত্তির বৈনাশিক শক্তি তিনি জানতেন, জানতেন সেই শক্তি, য়ুং-এর ভাষায় 'impulsive, uncontrolled, moody, irrational, primitive, archaic, indeed, like the feeling of a savage'। বৈদগ্ধ্যের অন্তরালে আদিম পশু বাস করে, অস্তিত্বের সহোদর আদিম ছায়াকে আমরা সঙ্গে নিয়ে চলি। সে সুমিতি সংযমে দিন কাটায় বটে, কিন্তু এক-একদিন বিরক্ত বাসুকীর মতো সে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে, তখন বুঝি প্রাক্তন তিমিরে মগ্ন, সেই আরণ্যক প্রবৃত্তিব শক্তি কতো দুর্নিবার। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের রোম্যান্টিকতা সভ্যতার অন্তরালশায়ী সেই দুরন্ত প্রবৃত্তিরই স্বীকৃতি। সুধীন্দ্রনাথের কবিতাতেও সেই প্রাথমিক রক্তের দাবি জ্বলে ওঠে। 'বাঁশির বর্বর কান্না, মৃদঙ্গের আদিম উচ্ছ্বাস' ধমণীর রক্তস্রোতকে উন্মাদ করে তোলে, শিষ্ট মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে প্রাক্তন পুরুষ। 'প্রাক্‌পুরাণিক বিকট পশুর/দায়ভাগ মোর শোণিতে নাচে' (প্রতিদান)। এই কারণেও ধ্রুপদী কাব্যের সংহত আত্মসংযমে তিনি নিজেকে একনিষ্ঠ রাখতে পারেন নি।

সুধীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত কবিতাই নাটকীয় স্বগতভাষণের ভঙ্গিতে উচ্চারিত। নায়ক বক্তা, নায়িকা কখনো নীরবে শ্রোত্রী, কখনো বাস্তবে অনুপস্থিত, বিরাজমান স্মৃতিলোকে। এই নায়িকার কল্পনাতেও রোম্যান্টিক কবিবৃত্তির জয়জয়কার। এই রমণী, বহুভোগিনী, বহুবল্লভা, নায়ক তার চিত্তে অল্পদিন স্থায়ী অতিথিমাত্র এবং নায়িকার সম্ভোগের বিচিত্র ইতিহাস সম্বন্ধে সে সচেতন। সে জানে তার অন্তর্ধানের পর 'বসন্ত অন্তরে তব আরম্ভিবে পুন চতুরালি', আর বৈরাগীর মতো বলে

'তোমারে ভুলিব আমি, তুমি মোরে ভুলিবে নিশ্চয় ; /মদনের চিতানলে অনঙ্গের হবে অবির্ভাব···' (ভবিতব্য)। নিষ্করুণ সুন্দরীকে লেখা কীটসের কবিতায় রোম্যান্টিক কবিকল্পনাজাত এই রমণী চিরন্তনত্ব পেয়েছে। সুধীন্দ্রনাথের নায়ককে অবশ্য সুন্দরী রমণীর পরাক্রান্ত কামনার অসহায়শিকার বলা চলে না, কারণ এই নায়কের মধ্যে একই পুরুষের সঙ্গে বায়রনী ধর্ষকাম ও বোদলেয়ারী পুরুষের মর্ষকাম একত্রে মিশে গেছে। অন্তত এ কথা তো ঠিক, মলয়ের ভ্রষ্ট অনুচর লাঞ্ছিত ভ্রমরের মতো নায়ক বৃথা যে-মধুরিক্ত কমলকে এতদিন প্রদক্ষিণ করল, সেই রমণী, নিঃসন্দেহে রোম্যান্টিক কল্পনার সৃষ্টি।

এই স্বগতভাষী কাব্যের কেন্দ্রে বিদেশিনী নায়িকা নীলিম নয়ন ও ধান্যসম কেলিপরায়ণ উড্ডীন কেশপাশ নিয়ে বর্তমান। সপ্তসিন্ধু পরপারে যে মিলন ঘটেছিল, তারই ক্ষুব্ধ স্মৃতিরোমন্থন এই স্বগত-ভাষণের বিষয়। এই সব কবিতায় শোনা যায়, এলিয়ট যাকে বলেছিলেন কবির দ্বিতীয় স্বর, তাই। নাট্যকাব্য না হয়েও এই কবিতায় নাটকীয়তা আছে। নায়ককে যদি কবি বলে ধরে নাও নিই, তবে এই নায়ক যে কবিরই পার্সোনা, কবিরই মুখোশ এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। নায়কের মুখোশ পরে, একটা অপরূপ নাটকীয় দূরত্ব সৃষ্টি করে, কবি নিজেই কথা বলেছেন। 'সংবর্ত'-এর কঞ্চুকী কবিতায় প্রথমে বলেছেন 'নাটকী নায়করূপে আজীবন দেখেছি নিজেকে,/ ভেবেছি আমার সঙ্গে অদৃষ্টের দ্বৈরথসমর।' কিন্তু ঐ কবিতাতেই পরে আবিষ্কার করলেন, 'নেপথ্যে আমার স্থান ; অন্ধকারে অধিকারী হাসে।' নিজের মুখোশকেই মঞ্চে নায়ক হিসেবে জায়গা দিয়ে কবি চলে গেলেন নেপথ্যের অন্ধকারে, কিন্তু যে স্বর শুনতে পেলাম সে নির্ভুলভাবে কবির। এই দ্বিতীয় স্বরের কবিতা সাকার করেছে এক মর্মান্তিক আত্মনাট্যকে।

সমস্ত নিবিড় নাট্যকে প্রেমিকার সঙ্গে দীর্ঘ অদর্শনের পর স্মৃতির মাধ্যমে দেখা হয়েছে। নায়িকার ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব মনে আছে, শুধু

অখণ্ড আননখানি সীমাশূন্য শূন্যে হারিয়ে গেছে। দেহমিলনের স্মৃতি ভাবতে গেলে দেহোন্মাদনার কথাই মনে পড়ে, স্মরণের প্রান্তে এসে করাঘাত করে প্রথম বাঙ্ময় রজনীর উগ্র উন্মাদনা। যদিও জানেন মৃত্যুমাত্র নিশ্চিত ভুবনে, তবু রিক্ত শয্যায় শুয়ে-শুয়ে মনে হয় সেই দেহধারিণী রমণীর কাছেই হয়তো আছে অমরার চাবি। সেই প্রেমিকার অনুপস্থিতি 'নিয়েছে হরণ করে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থ প্রমিতি' এবং সেই অনুপস্থিতির অসহ্য বেদনায় নায়ক আকুল প্রার্থনা করেছে, 'আনো মোরে মুখোমুখি নির্বাক নিশাতে/ক্ষীণপ্রাণ পার্থিবার বিশ্বম্ভর প্রণয়ের সাথে' (প্রলাপ)। মিলনের দিনে সেই প্রেম ছড়িয়ে পড়েছিল চরাচরে 'তোমারই কেশের প্রতিচ্ছায়ায়/গোধূলির মেঘ সোনা হয়ে যায়' (চপলা) এবং 'উপরন্তু ধরা/তোমার উপমা বলে, মোর চক্ষে এখনো সুন্দরা' (অনুষঙ্গ)। মিলনসঙ্গমের অলজ্জ তীব্রতাও সেদিন স্পর্শ করেছিল যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে; 'উত্তরফাল্গুনী'-র 'জন্মান্তর' থেকে তুলে দিচ্ছি—

> টুটিবে মেখলা, খসে যাবে তার কবরী,
> তীব্র পুলকে ঘুচিবে সকল লজ্জা;
> তুঙ্গী গ্রহেরা হবে বাসরের প্রহরী
> চ্যুত তারাদল বিরচিবে ফুলশয্যা।

সেই অভিজ্ঞতার জন্য নায়ক কৃতজ্ঞ ও ধন্য. কিন্তু সে সবই আজ স্মৃতি। বিদেশিনী সখা তার ললাটে ইন্দ্রত্বের টিকা এঁকে দিয়েছিল সে কথা নায়ক স্মরণ করে, আবার ক্ষণবাদী চৈতন্য তাকে অতিরিক্ত দাবি করতেও দেয় না। নিজেই সাবধান করে দেয়, 'অপ্রাকৃত নিষ্ঠার নিগড়ে তোমার দাক্ষিণ্য যেন বিষায়ে না উঠে' এবং নিজেও প্রতিশ্রুতি দেয় 'করিব না পুঁজি/প্রেমের সমাধিস্তূপে মমত্বের জঘন্য জঞ্জাল।'

এই আত্মনাট্যের নায়িকা একদিকে দেহধারিণী অন্যদিকে প্রতীক। আজ কোনো স্থিরকেন্দ্র নেই, কিন্তু একদিন যে-আদর্শবাদে কবি এবং কবির বিশ্ব বিশ্বাসী ছিল, সেই বিস্মৃত আদর্শবাদের সেই ভ্রষ্টনষ্ট

সৌন্দর্যপূজার প্রতীক এই নীলনয়না বিদেশিনী। আজ নায়ক ক্লান্ত, রুগ্ন, অবিশ্বাসী, তবু সে ঘরকাতুরে মন নিয়ে পিছনে ফিরে তাকায় যখন সন্নিধ্যে প্রেমিকা ছিল, আদর্শবাদে বিশ্বাস ছিল। আদর্শবাদের প্রতীক ঐ নায়িকা নেই বলেই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থ প্রমিতি আজ বিচ্যুত; অবিশ্বাসী কবি সমস্ত আদর্শবাদ, শাশ্বত প্রেমকে নিয়ে উপহাস বিদ্রূপ করেন। পুনঃপুনঃ যুদ্ধ ও রাষ্ট্রবিপ্লবে দেখা গিয়েছে সেই প্রাক্তন আদর্শবাদ কতোই ঠুনকো, পুনঃপুনঃ ভ্রমরের মধু আহরণের ফলে দেখা গিয়েছে সে প্রেমিকার প্রেম কী পরিমাণে মধুরিক্ত। যৌবনের সেই আদর্শবাদে আস্থা ফিরে পাবার সম্ভাবনা সামান্য এবং 'পুনর্মিলনের আশা? সে কেবল প্রেমার্ত কল্পনা'। আধুনিক অবিশ্বাসী আদর্শে বিশ্বাস করে না, অথচ মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতেও পারে না, আদর্শবাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘৃণা ও অনুরাগে মেশানো। নায়িকার সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের নায়কের সম্পর্কও সেই রকম।

দান্তে 'ভিতা নুওভা' কাব্যে চার্চে বিয়েত্রিচের সঙ্গে দূর থেকে তার সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন। শরীরিণী অথচ প্রতীক বিয়েত্রিচে উজ্জ্বল চক্ষুতারকার আলো নিক্ষেপ করলো, কবি নিজের অপ্রতিরোধ্য আবেগকে গোপন করার জন্য দ্বিতীয় এক রমণী 'la donna gentile'-র দিকে তাকালেন, সে হলো কবি আর প্রেমিকার মাঝখানে স্বেচ্ছামনোনীত অন্তরালের মতো। তারপর বিয়েত্রিচে মিলিয়ে গেল জনারণ্যে। সৌন্দর্য ও বিশ্বাসের প্রতিমা দেখামাত্র দিয়ে অন্তর্হিত হলো। ত্রয়োদশ শতকের কবি এই প্রতীকী কাহিনীকে যুগোপযোগী পরিবেশ দিয়েছেন উপাখ্যানকে ভজনালয়ে প্রতিষ্ঠা করে। সুধীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও সৌন্দর্যের প্রতিমাও দেখা দিয়ে হারিয়ে গেছে—হাহাকারসার কবি এখন শুধু সেই ভ্রষ্টলগ্নের স্মৃতিরোমন্থন করেন। বিশ শতকের এই কাহিনীও পেয়েছে যুগোপযোগী পরিবেশ, ঘটনা ঘটেছে সিনেমাহলে। সিনেমা ভাঙামাত্র ছড়িয়ে যাওয়া জনতায় ক্ষণকালের জন্য কবি দূর থেকে নায়িকাকে দেখেছেন, অনুসরণের

চেষ্টা করামাত্র বয়স্থ বিশাল বপুর ব্যবধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্থক্য এই যে এখানে অন্তরাল স্বেচ্ছানির্বাচিত নয়, কিন্তু এখানেও পরিণামে,

শুধু তুমি অন্তর্হিত ; ভ্রষ্টলগ্ন ; সমাপ্ত সুযোগ।
আবার নিষ্ফল হলো আজন্মের বিরাট উদ্যোগ। (সিনেমায়)

দান্তে টমিস্ট দর্শনকে মহৎ কাব্যে রূপান্তরিত করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের মনও দার্শনিকের ; তিনিও মানবের মধ্যে কবিত্বের আবেগ সঞ্চার করে অসাধ্য সাধন করেছেন। মেটাফিজিক্যাল কবিতার মৌলিক লক্ষণ যদি হয় 'emotional apprehension of thought' তবে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা নিঃসন্দেহে মেটাফিজিক্যাল। তিনিও তত্ত্বোপলব্ধিকে কাব্যের উপাদানে পরিণত করেছেন, বিশেষ ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতির মধ্যে প্রতীকের পরমার্থ ও নির্বিশেষের দ্যোতনা জাগিয়েছেন। চৈতন্যের জয়েই তার আনন্দ।

এই নিরাশাকরোজ্জ্বল কবি শেষ দিকে ঘোর নৈরাশ্যের সাধনা সমাপ্ত করে বিশুদ্ধ ঔজ্জ্বল্যের সাধনা করতেন কিনা সেটা নিতান্ত অনুমাননির্ভর অবান্তর প্রশ্ন। নতুন সংস্করণ 'স্বগত'-র 'পুনশ্চ' প্রবন্ধে জীবনের শেষ পর্যায়ে দেখি একদিকে তিনি নম্রকণ্ঠে বলছেন, 'দিনে দিনে নিজেকে যত চিনছি,তত বুঝছি যে জগৎ আমার বৈরী নয়, বহির্জগৎ সুন্দর ও অতিথিবৎসল।' অন্যদিকে 'দশমী'-তে পূর্বের অন্ধকার তেমনি নিরাশানিবিড় 'অমার সরিৎ পৃথিবী ডোবায়।' জীবনানন্দের শেষ পর্যায়ের কবিতার মতো তিনি তাঁর অন্তিম কবিতাবলীকে 'আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়' করে তোলেন নি। তবু মনে হয় সুদীর্ঘ জীবনের সমস্তটা তাৎপর্য ও মাধুর্যের ধ্যানে কাটিয়ে অন্তিমে নতুন পদাবলী রচনার জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন, যাতে তাঁর পরিণততম উপলব্ধি প্রকাশ পাবে। কিন্তু এই কালজ্ঞানী কবি যে মহাকালের আশ্রিত ছিলেন, শেষ পর্যন্ত সেই মহাকালই নিজের কোনো রহস্যময় প্রয়োজনে তাঁকে সেই সুযোগ আর দিল না।

'রূপকারী বিবেক' : সুধীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠান্তর

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যসংগ্রহের ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, 'তিনি (অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথ) প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন…যে কবিতা লেখা ব্যাপারটা আসলে জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম, ভাবনার সঙ্গে ভাষার, ভাষার সঙ্গে ছন্দ, মিল ও ধ্বনি-মাধুর্যের এক বিরামহীন মল্লযুদ্ধ।' কবি সুধীন্দ্রনাথের এই বিরামরহিত মল্লযুদ্ধের কিছু প্রমাণ আছে তাঁর কবিতাবলীর পৌনঃপুনিক পাঠান্তরে। এই দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ কবি ইয়েটসের সগোত্র। ইয়েটসের মতো তিনিও আদমের অভিশাপ, মাথার ঘাম পায়ে ফেলার, কবিতা লেখার জন্যে পরিশ্রমের, আবশ্যিক সর্ত সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং ইয়েটসের মতোই তিনি সেই সর্ত পরম নিষ্ঠায় কবিজীবনে পালন করে গেছেন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠান্তর-সমূহের আলোচনা করলে, তিনি সার্থকতার সন্ধানে কী ধৈর্য কী শ্রমের সঙ্গে কবিতার বাক্যাংশ শব্দ মিল নিয়ে বারবার 'Stitching and unstitching' করতেন তার বিস্ময়কর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইয়েটসের 'A line will take us hours may be', এই উক্তির সমর্থন পাই সুধীন্দ্রনাথের কবিজীবনে, যখন তাঁর নিজের বিবৃতি থেকে জানি একদা তিনি 'উড়ে চলে গেছে' এই অপরিচ্ছন্ন ক্রিয়ার 'উড্ডীন' বিশেষণে রূপান্তরের চেষ্টায় সারা সন্ধ্যা ব্যয় করে রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস বিস্ময় জাগিয়েছিলেন। শব্দপুঞ্জের মধ্যে ধ্বনিমাধুর্যের উচ্চারণ জাগাতে গেলে, তার লক্ষ্যকে অব্যর্থ করতে হলে যে শারীরিক শ্রমের চেয়ে বেশি পরিশ্রম ও প্রযত্নের মূল্য দিতে হয় একথা ইয়েটসের মতো সুধীন্দ্রনাথও জানতেন।

'অর্কেস্ট্রা'-র দ্বিতীয় সংস্করণ তৈরির সময় প্রথম সংস্করণের পাঠের

উপর সুধীন্দ্রনাথ অনেক কলম চালিয়েছিলেন। তাতেও তাঁর সংস্কার ও সংশোধন-প্রবণতা ক্ষান্তি মানে নি। 'তৃতীয় সংস্করণের জন্য সুধীন্দ্রনাথ স্থানে-স্থানে অর্কেস্ট্রা-র পরিমার্জনা করছিলেন, বর্তমান কাব্যসংগ্রহে সেই সব পরিমার্জিত পাঠই গৃহীত হয়েছে।' 'ক্রন্দসী' সম্বন্ধেও কাব্যসংগ্রহের প্রকাশক জানিয়েছেন 'দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য সুধীন্দ্রনাথ ক্রন্দসীর পরিমার্জনা আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। সন্ধান ও জাতুঘর কবিতা দুটির আদ্যন্ত এবং সৃষ্টিরহস্য, প্রত্যাখ্যান ও বর্ষপঞ্চকের আংশিক পরিমার্জনা সম্পূর্ণ হয়েছিল।' এই আত্মছিদ্রসন্ধানী ও আত্মসংশোধনে তৎপর লেখনীর হাত থেকে 'সংবর্ত' নামক কাব্যগ্রন্থটিও সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পায় নি। 'সংবর্ত' গ্রন্থের সঙ্গে একত্র প্রকাশিত প্রাক্তনী পর্যায়ের কৈশোরক কবিতাগুলি তো আদ্যোপান্ত পুনর্লিখিত। এক-আধটা বাদ দিলে 'প্রতিধ্বনি'-র প্রতিটি অনুবাদ কবিতায় আদি রচনা ও পরিমার্জনার তারিখ দেওয়া আছে এবং দুই তারিখের মধ্যে দশ থেকে বিশ বৎসরের ব্যবধান। এই এক বা দুই দশক ধরে সুধীন্দ্রনাথের সক্ষম লেখনী যে আদি রচনার তারিখ থেকে কত সংস্কার পরিমার্জনা, ও পর্যায়ের পর পর্যায় সংশোধনের মধ্য দিয়ে শেষ তারিখের সার্থকতায় কবিতা-গুলিকে উত্তীর্ণ করেছিল সে শুধু আমরা অনুমান করতে পারি। সুপরিচিত 'শাশ্বতী' কবিতার কয়েকটির চরণের পরিবর্তন-পর্যায় লক্ষ্য করলে এই দীর্ঘ শ্রম ও ধৈর্যসাধ্য প্রক্রিয়ার কিছুটা আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। কাব্যসংগ্রহের সঙ্গে প্রকাশিত 'শাশ্বতী' কবিতার পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি থেকে আমরা আলোচ্য চার চরণের তিনটি পরিবর্তিত রূপ পাই।

প্রথম রূপ— একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা
মৃন্ময় দীপে জ্বেলে দিল ধ্রুবতারা
একটি বিদায় রচিল যে শূন্যতা
লক্ষ সাহারা গোবি তাহে দিশাহারা।

দ্বিতীয় রূপ—মুমূর্ষু দীপে জ্বেলে দিল ধ্রুবতারা
একটি অমিত বিদায় ক্ষিপ্ত পণে
বিধাতা স্বয়ং নাস্তিতে হল হারা
একটি হিয়ার অবল বিস্মরণে।

তৃতীয় রূপ—একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধরে
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ দিল অবারিত করে।

এই শেষ রূপই গৃহীত হয়েছিল 'অর্কেস্ট্রা'র প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে। কিন্তু কাব্যসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় সংস্করণে আরো একটা পরিবর্তন আমরা পাই।

একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধরে
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে।

এই ক্রমাগত পরিবর্তন পরিমার্জনা ও সংস্কার কখনো একটি শব্দের, কখনো একটি বাক্য বা স্তবকের, কোনো বিরলক্ষেত্রে এমন কি সম্পূর্ণ কবিতার—এই কাজে সুধীন্দ্রনাথকে উৎসাহ দিয়েছে, তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁর বিবেক। এই অনলস সংস্কারসাধনের সপক্ষে সুধীন্দ্রনাথ বিবেকের দোহাই দিয়েছেন, একবার নয়, বারংবার। 'সংবর্তে'র মুখবন্ধে তিনি জানিয়েছেন 'সংস্কারসাধ্য জেনে, কোনো রচনাকে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আকার দিতে আমার বিবেকে বাধে।' অথচ বিবেকের বশে কবিতার সার্থকতাই একমাত্র অন্বিষ্ট হলে, এবং যেখানে সার্থকতা অর্জিত একমাত্র সেই কবিতাই স্থায়ীরূপ পেলে কবির পরিণতি-সাপেক্ষ যে ব্যক্তিত্ব তার বিবর্তন-ইতিহাসের স্বাক্ষর থাকে না এবং তাহলে কবির ভাবনা ও ভাষার বিবর্তন ও

ক্রমপরিণতি নিয়ে সমালোচনার যে ব্যস্ততা তাও নিতান্ত নিরর্থক হয়ে পড়ে। এই ব্যাসকূট যে সুধীন্দ্রনাথ জানতেন না তা নয়।

কিন্তু পরিণতির ইতিহাস কাব্যশরীরে বজায় রাখার চেয়ে এই বিবেক-পীড়িত কবি যা 'আদ্যন্ত অনবদ্য' তার সন্ধানে একনিষ্ঠতাকে বেশি মূল্য দিয়েছিলেন, যদিও তিনি জানতেন মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিও অসম্পূর্ণ এবং এমন শিল্পসামগ্রী বিরল যার শ্রীবৃদ্ধি অভাবনীয়। সেই আদ্যন্ত অনবদ্যের যথাসাধ্য নিকটে পৌঁছানোর দুরূহ সাধনায় তিনি ব্রতী ছিলেন বলে 'সংবর্তে'-র মুখবন্ধে তিনি স্পষ্ট লিখেছিলেন 'কবিতাবিশেষের জন্মকালে পাঠকের প্রয়োজন নেই, তার পরিচ্ছন্নরূপই সাধারণের বিচার্য। সুধীন্দ্রনাথের মানসিক প্রবণতা কোন দিকে তা এই সূত্র থেকে এবং তাঁর ক্রমাগত সংস্কার প্রচেষ্টা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। তবু সুধীন্দ্রনাথ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কবি-ব্যক্তিত্বের বিবর্তনইতিহাস বজায় রাখার দাবি সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেন নি। সেইজন্যই বোধহয় কবিতাবিশেষের জন্মকালে পাঠকের প্রয়োজন নেই এবং 'পদ্যরচনায় তারিখের উল্লেখ আমার চক্ষে আত্মশ্লাঘার হাস্যকর প্রয়াসমাত্র' ইত্যাদি উক্তি করা, এবং তদনুযায়ী অনেকগুলি কাব্যের পূর্বসংস্করণের রচনা তারিখ উহ্য রাখা সত্ত্বেও, কাব্যসংগ্রহে রচনা-তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। হয়তো তা সম্ভব হয়েছে কবির অনুপস্থিতির জন্যে। অবশ্য কবি-ব্যক্তিত্বের এই বিবর্তন-ইতিহাস বজায় রাখার দায়িত্ব, জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রামে কোন কালে কবি কতটা জয়ী হয়েছেন সেই বিজয়-ইতিহাস তৎকালীন কাব্যশরীরে রক্ষা করার এই দায়িত্ব অন্যত্র সুধীন্দ্রনাথ নিজেও আংশিকভাবে স্বীকার করেছেন। যারা পরিণতির স্বাক্ষর রক্ষা করার দোহাই দিয়ে পৌনঃপুনিক সংস্কারের প্রতিবাদ করেন সুধীন্দ্রনাথ তাদের 'সমর্থনে এই পর্যন্ত মানতে প্রস্তুত যে অতীত বৈকল্যের অস্বীকার, শুধু অপলাপ নয়, স্বাবমাননারও চূড়ান্ত। কারণ ব্যক্তিস্বরূপ পরিণতি-সাপেক্ষ···আপন পরিপূর্ণতার ধ্যানে ডুবে গেলে,

কবিপ্রতিভার সর্বনাশ অনিবার্য' (অর্কেস্ট্রা-র ভূমিকা)। সুতরাং 'অর্কেস্ট্রা-র স্খলন-পতন-ত্রুটি আমার কাছে যতই লজ্জাকর ঠেকুক না কেন, তদন্তর্গত কবিতাবলীর পুনর্মুদ্রণে বাধা দিলে,...অমূলক আত্মমর্যাদাই প্রকাশ পেত'—কারণ পরিণতি-ইতিহাসের দাবি অগ্রাহ্য করা যায় না. কারণ যা আদ্যন্ত অনবদ্য, নিরঞ্জন সার্থকতায় মণ্ডিত, একমাত্র সেই কবিতাই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের অনেক রচনাও অপ্রকাশিত থেকে যেতো। এই পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথ মেনে নিতে প্রস্তুত. কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিবেকতাড়িত কবি বলেন, এই কবিতাগুলির পুনর্মুদ্রণে অরাজী হওয়া যেমন অন্যায় হতো, 'এগুলোর সংস্কারসাধনে বিরত থাকলে. তেমনি সূচিত হতো রূপকারী বিবেকের অভাব, তথা পাঠকের প্রতি অবজ্ঞা।' কোনো এক সময়ে তোমার সাধ্যে কতোদূর সম্ভব হয়েছে, সেই তারিখে সেইটুকুই সম্ভব ছিল জেনে এই রূপকারী বিবেক নিস্তার বা অব্যাহতি দেয় না; সে বলে, পুনঃ পুনঃ আক্রমণে, প্রযত্ন ও নিষ্ঠায় সর্বোত্তমের সন্নিকটে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এই সদাজাগ্রত বিবেকের জন্যেই 'অহঙ্কার যেই অতীতে তাকায়, অমনিই বেরিয়ে পড়ে পুরাতন রচনাবলীর সংস্কার-সাধ্য দোষ।' সেই কারণে বিনা সংশোধনে কবিতাবলীর পুনর্মুদ্রণ কবির বিবেকে বাধে।

বুদ্ধদেব বসু সুধীন্দ্রনাথের কাব্যসংগ্রহের ভূমিকায় লিখেছেন 'জীবনের শেষ দুই দশকে সুধীন্দ্রনাথ কবিতা বেশি রচনা করেন নি, কিন্তু অনবরত নতুন করে রচনা করেছেন নিজেকে এবং সেটাও কবিকৃত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। পুরোনো রচনার তৃপ্তিহীন পরিবর্তন ও পরিমার্জনা তাঁর—যা বন্ধুমহলে মাঝে মাঝে সরোষ প্রতিবাদ জাগালেও অনেক স্মরণীয় পঙ্‌ক্তি প্রসব করেছে।' বন্ধুভক্তদের সরোষ প্রতিবাদেই সম্ভবত সুধীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন ব্যক্তিস্বরূপ যেহেতু পরিণতি-সাপেক্ষ, সেই কারণে পরিণতির ইতিহাস রক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি রূপকারী বিবেকের তাড়নায়

পরিবর্তন করে গেছেন। সুধীন্দ্রনাথ আত্মপক্ষ সমর্থনে ইয়েটসের নজির নিজেই দিয়েছেন। বাস্তবিক ইয়েটসের কবিতাবলীর পাঠান্তর-সম্বলিত সংস্করণ দেখলে তবেই বোঝা যায় কতো পরিবর্তন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতাবলী ভাস্কর্যের মতো অমর ও অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য অর্জন করেছে। নানা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যে সব কবিতার পুরাতন পাঠ জনপ্রিয় হয়েছে, এমন কি সেগুলোকে পর্যন্ত রূপকারী বিবেকের দায়ে সংশোধন করতে ইয়েটসের বাধেনি। ইয়েটসের এই সংস্কারপ্রবণতাও নিশ্চয়ই তাঁর 'বন্ধুমহলে মাঝে মাঝে সরোষ প্রতিবাদ' জাগিয়েছিল, এবং সেই কারণে সম্ভবত ইয়েটস তাঁর এই সংস্কারচর্চার সপক্ষে এই কয়টি লাইন লিখেছেন—'They that hold I do wrong/Whenever I remake a song/Should recollect what is at stake/It is myself that I remake.' এই শেষ চরণের বক্তব্যটি বুদ্ধদেব বসু সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ব্যবহার করেছেন, সুধীন্দ্রনাথ 'অনবরত নতুন করে রচনা করেছেন নিজেকে।' কিন্তু ইয়েটসের নিজেকে পুনর্নির্মাণ এবং সুধীন্দ্রনাথের নিজেকে নতুন করে রচনার মধ্যে পার্থক্য আছে। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের বক্তা আপাতত ও বস্তুত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই জন—একজন মানুষের রোম্যান্টিক বেদনা ধ্রুপদী ভাষায় পূর্বাপর প্রকাশ পেয়েছে—সুধীন্দ্রনাথে ইয়েটসের মতো ব্যক্তিত্বের পুনর্নির্মাণ নেই, তিনি নতুন নতুন মুখোশ পরেন নি। ইয়েটস নিজের জটিল ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্যে পূর্বাপর বস্তুত এক থেকেও, সন্ত বা মাতাল, সৈনিক বা শিল্পী রাজনীতিক বা উন্মাদ, শয়নকক্ষের দাসী বা পাগলি জেনের মুখোশ পরে যেমন ব্যক্তিস্বরূপের পুনর্নির্মাণ করেছেন, সেই জাতীয় পুনর্নির্মাণ সুধীন্দ্রনাথে নেই। ইয়েটসের ভাষাগত পরিবর্তন,—ভাষায় মেদহীনতা, কাঠিন্য, পৌরুষ, বাক্যবন্ধের জটিলতা, আপাত সঙ্গীতদৈন্য—আসলে তাঁর নাটকীয় ব্যক্তিত্বের রূপান্তরের, নানা চরিত্রধারণের বাহ্য লক্ষণ। নিজেকে তিনি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন

বলেই তিনি কবিতার ভাষার ক্রমাগত সংস্কার করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব শেষ পর্যন্ত এক, কোনো মুখোশনাট্যের মেলায় তিনি বিচিত্র মুখোশ পরেন নি—তাঁর কবিতার পরিবর্তন ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন-জনিত নয়, তা শুধু ভাষাগত। পূর্বযুগের বাংলা কবিতার উত্তরাধিকার হিসাবে যে সব দুর্বলতা তাঁর কবিতায় বর্তেছিল বলে তাঁর মনে হয়েছে,—গঠনগত তরলতা, অতি-পেলবতা, সর্বজাতীয় শৈথিল্য ও ভাষাগত মুদ্রাদোষ—সেগুলোকে তিনি পরিমার্জনা ও সংশোধনের দ্বারা পরিহার করতে চেয়েছিলেন।

কী কী সেই দুর্বলতা যা তিনি দূর করতে যত্নবান ছিলেন, তাঁর কয়েকটি উক্তি উদ্ধার করলেই তা বোঝা যাবে। 'অর্কেস্ট্রা'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ প্রথম সংস্করণ 'অর্কেস্ট্রা' সম্বন্ধে বলেছেন, 'সাধু ও প্রাকৃতের মধ্যবর্তী যে সান্ধ্যভাষায় সেকালের অধিকাংশ বাংলা কবিতা লেখা হত, তাই এ-গ্রন্থের বাহন। তা ছাড়া অন্ত্যানুপ্রাসের চাহিদায় তথা ছন্দোরক্ষার প্রয়োজনে, শব্দের বিকৃতি, পাদপূরণের জন্য ক্রিয়াপদের গ্রাম্যরূপ অথবা বর্ণসংকোচ ও বৃদ্ধি, হওয়া ও করা ধাতুর পৌনঃপুন্য, সম্বোধনের অনাবশ্যক বাহুল্য ইত্যাদি বাংলা পদের সুপ্রচলিত স্বেচ্ছাচার অর্কেস্ট্রার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল···।' 'সেই জন্যে বিনা সংশোধনে অর্কেস্ট্রার পুনর্মুদ্রণ আমার বিবেকে বাধলো।' অতন্দ্র প্রযত্নে কী কী শ্রেণীর দুর্বলতা তিনি উৎখাতে উৎসাহী ছিলেন তার আর একটা তালিকা পাই 'সংবর্তে'-র মুখবন্ধে—'আমি যদিও জ্ঞানত গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চাই, তবু এখনো আমার সাধ ও সাধ্য মাঝে মাঝে পরস্পরের বাধ সাধে। ফলত ছন্দোরক্ষার খাতিরে অথবা মিলের গরজে সাধু ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণ, নামধাতুর বাহুল্য, বিভক্তি-বিপর্যয়, ইত্যাদি বাংলা কাব্যের অনেক অভ্যাসদোষ একাধিক কবিতায় রয়ে গেল।' এ ছাড়াও আছে 'পাদপূরণের গরজে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সাধুরূপ গ্রহণ ও বর্জন', 'যেখানে মাত্রাসংখ্যা কম পড়েছিল সেখানে অগত্যা পুনরুক্তি বা

বিশেষণবাহুল্যের শরণ' এবং 'ছন্দের শৈথিল্য, শব্দের অপপ্রয়োগ, বাক্যের জড়তা, চিত্রকল্পের অসঙ্গতি'।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতাবলীর কিছু পাঠান্তর পাশাপাশি রেখে আলোচনা করলে তঁর পরিমার্জনা-প্রক্রিয়া বাস্তবক্ষেত্রে কী ভাবে কাজ করেছে তা দেখানো সহজ হয় এবং প্রসঙ্গত, এই সংশোধন সর্বত্রই সঙ্গত হয়েছে কিনা এ প্রশ্নেরও বিবেচনা করা চলে।

'শাশ্বতী' : (অর্কেস্ট্রা)

দ্বিতীয় সংস্করণ	প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণ
একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে	একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
বাসা বেঁধেছিল সাতটি অমরাবতী···	ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী···

সুধীন্দ্রনাথ তৃতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠ আবার নিয়েছেন। করা ধাতুর পৌনঃপুন্য দূর করার জন্যে হয়তো তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে বাঁধা ধাতু ব্যবহার করেছিলেন এবং ফলে 'বাসা' এসেছিল। কিন্তু পরে কবি চিত্রকল্পের সঙ্গতির প্রয়োজনে (দ্বিধাথর-থর চূড়ে দীর্ঘকালের বাসা বাঁধা যায় না, ক্ষণকাল ভর করা যায় মাত্র) এবং অনুপ্রাসের দাবিতে পূর্বপাঠেই ফিরে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ	তৃতীয় সংস্করণ
আজি সে কেবল আর কারে ভালবাসে।	কিন্তু সে আজ আর কারে ভালবাসে।

প্রথম পাঠের এলিয়ে-যাওয়া শিথিল চরণটিকে দ্বিতীয় পাঠে সুধীন্দ্রনাথ শোধরাবার চেষ্টা করেছেন। একটিমাত্র যুক্তাক্ষরের যোগে শুধু যে শিথিল পঙক্তি সটান হয়েছে তাই নয়, এই সুযোগে কবি পদ্যে ব্যবহৃত 'আজি' বর্জন করে 'আজ' ব্যবহার করতে পেরেছেন। অবশ্য পদ্যে ব্যবহৃত সর্বনাম 'কারে' রয়েই গেল। এ ছাড়া অপ্রয়োজনীয় 'কেবল' শব্দটিকেও কবি বহিষ্কার করতে পেরেছেন।

'মার্জনা' : (অর্কেস্ট্রা)

প্রথম সংস্করণ	তৃতীয় সংস্করণ
তাই বারে বারে	তাই বারে বারে
ব্যাজজীবী স্মরণের লুব্ধ অত্যাচারে	ব্যাজজীবী স্মরণের লুব্ধ অত্যাচারে

প্রথম সংস্করণ	তৃতীয় সংস্করণ
আত্মারে গচ্ছিত রেখে, আপনারে ভাবো চিরঋণী, অয়ি মোর ক্ষমাভিখারিণী।	আত্মারে গচ্ছিত রেখে, আপনারে ভাবো চিরঋণী, ক্ষমাভিখারিণী।

সম্বোধনের অকারণ বাহুল্য ও শিষ্ট সর্বনাম বর্জনের প্রয়োজনে এই পাঠান্তর। এখানেও কিন্তু পদ্যসর্বনাম 'আপনারে' রয়েই গেল।

'অর্কেস্ট্রা' : (অর্কেস্ট্রা)

দ্বিতীয় সংস্করণ	তৃতীয় সংস্করণ
সচেতন প্রতিবেশিনীর পিঙ্গল কুন্তল থেকে নামহীন রতিপরিমল, পরদেশী সঙ্গীতের/মুগ্ধ সমর্থনে মোর চিত্তে সহসা জাগায়ে দিল/অতিক্রান্ত উৎসবের নিরাকার সম্মোহ আবার।	সচেতন প্রতিবেশিনীর ক্ষৌম কেশে উচ্চকিত রতিপরিমল, পরদেশী সঙ্গীতের ঐকতান সমর্থনে যেন পুনরায় উদ্বুদ্ধ করিল চিত্তে অতিক্রান্ত উৎসবের বিক্ষুব্ধ ও বিক্ষিপ্ত সম্মোহ।

এই রূপান্তর অনেক কারণেই অস্বস্তিকর। অবশ্য 'পিঙ্গল কুন্তল'-এর চেয়ে 'ক্ষৌম কেশ' সুরূপা বিদেশিনীর সৌন্দর্য বেশি প্রকাশ করে, তাছাড়া দ্বিতীয় পাঠটি ব্যবহারে-ব্যবহারে নষ্ট হয়েছে কম। ভালোই হয়েছে পাদপূরণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত অতিপ্রচলিত বিশেষণ 'নামহীন' সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু শূন্যস্থান পূরণের জন্যে 'উচ্চকিত' ও 'ঐকতানে'র, বিশেষ করে 'উচ্চকিত' শব্দের ব্যবহার ভালো হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। মাত্রামেলানোর গরজে ব্যবহৃত অপ্রয়োজনীয় বিশেষণ 'মুগ্ধ', সাধু-চলিতের ভাষা-সংকরত্ব নিরসনের প্রয়োজনে সাধুসর্বনাম 'মোর' বহিষ্কৃত হয়েছে রূপান্তরে। অপ্রয়োজনীয় ক্রিয়াবিশেষণ 'সহসা'-ও বিদায় নিল এবং অনুষঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 'পুনরায়' এল তার জায়গায়। হয়তো যুগ্মক্রিয়াপদজনিত শৈথিল্য দূর করার উদ্দেশ্যেই সুধীন্দ্রনাথ 'জাগায়ে দিল'-র জায়গায় পাঠান্তরে 'উদ্বুদ্ধ করিল' ব্যবহার করেছিলেন। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি, বরং যুক্তাক্ষরে-যুক্তাক্ষরে হোঁচট খেয়ে কাব্যসঙ্গীত ক্ষতিগ্রস্ত

হয়েছে। আরো দুটি পরিমার্জনা একেবারেই সমর্থন করা যায় না। অব্যয় 'যেন'-র ব্যবহার ভাবগত ও সঙ্গীতগত দুই কারণেই দুর্বলতা সৃষ্টি করেছে, স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে বাক্যেও এসেছে জড়তাদোষ। এই অব্যয় ব্যবহারে যে দ্বিধা এসেছে তার ফলে বক্তব্য জোরালো হয় নি, আবার সঙ্গীতপ্রবাহও এখানে এসে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আরো গুরুতর আপত্তি শেষ চরণের পাঠান্তর বিষয়ে। পয়ার-মহাপয়ারের প্রখ্যাত শোষণক্ষমতাও 'বিক্ষুব্ধ ও বিক্ষিপ্ত সম্মোহ'-র কাছে হার মানে। সমস্ত শব্দভাবসঙ্গীত স্পন্দনবিস্তারের মধ্য দিয়ে প্রথম পাঠে যুক্তাক্ষর-বর্জিত 'আবার'-এ এসে যেন শমে পৌঁছেছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পাঠে কাব্যসঙ্গীত শেষ চরণের পৌনঃপুনিক যুক্তাক্ষরের মধ্য দিয়ে 'সম্মোহ'-য় এসে প্রত্যাশিত শম খুঁজে পায় না, বরং মনে হয় যেন তানকর্তবের মাঝখানে সঙ্গীত হঠাৎ থেমে গেল—গুরুভার 'সম্মোহ' শব্দটি যেন হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে শব্দসঙ্গীতের প্রবাহকে স্তব্ধ করিয়ে দিল।

'সন্ধান' : (ক্রন্দসী)

সুধীন্দ্রনাথ 'ক্রন্দসী' কাব্যগ্রন্থের 'সন্ধান' ও 'জাদুঘর' কবিতা দুটোর আদ্যন্ত পরিমার্জনা করেছিলেন। 'সন্ধান' কবিতার পরিমার্জনাকে অবশ্য ভাষাগত বলা চলে না, বরং বলা চলে দ্বিতীয় পাঠে ভাবই বিস্তার ও প্রসার পেয়েছে।

প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
তাহার শরীর বুদ্ধি, মনীষা মনন	মননে ও মনীষায়, দেহে ও বুদ্ধিতে
শিল্প-উপাদান-সম অখণ্ডতা করে	···একান্ত সে ; বিসংবাদী উপাদান
বিরচন···।	শিল্পের শুদ্ধিতে
	যেমন নিষ্ফল, সেও তেমনি সঙ্গত।···

বোঝা যায় এখানে পরিবর্তন শুধু ভাষাগত নয়, বিষয়গত—বস্তুত বিষয়গত পরিবর্তনের জন্যেই ভাষাগত রূপান্তরের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। প্রথম পাঠের,

> অবিকল, সিদ্ধ, স্বয়ংবশ,
> নিঃশঙ্ক সে অপমানে, অন্বেষণ করে না সে যশ···

চরণদুটো স্থানচ্যুত হয়ে বহু চরণ পরে দ্বিতীয় পাঠে এই পরিবর্তিত চেহারা পেয়েছে,

শাঠের প্রেরণা যোগায় না শঠ,
মজে না সে প্রশংসায়, পায় না লোকাপবাদে ভয়…।

প্রথম সংস্করণে ছিল,

সে কেবল নির্লিপ্ত অয়নে
পূর্ণ করে ভগ্নবৃত্ত ; নিরাসক্ত বিভাবিকিরণে
জানায় দিকের বার্তা অমাগ্রস্ত নিঃসঙ্গ তরীরে ;
রূপসীরে
নিষ্কাম উদ্দীপ্তি তার করে পূজারতি,
কুরূপার কুৎসিত বসতি
মায়াপুরী হয়ে ওঠে নৈর্ব্যক্তিক তার অনুরাগে।

দ্বিতীয় পাঠে ভগ্নবৃত্ত পূর্ণ করার ব্রাউনিং-বক্তব্য ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ব্যাপকতা পেয়ে হয়েছে,

দেবযানে
উদ্গাতা জ্যোতিষ্ক যেন বৃত্তির নিজস্বে পূর্ণ করে
অসম্পৃক্ত অয়নাংশ ·।

'নিঃসঙ্গ তরীর' চিত্রকল্প মিল, অনুপ্রাসের অনুরোধে হয়েছে,

তরায় বন্দরে
নিশাক্রান্ত তরণীরে নিরুদ্দিষ্ট তার আশীর্বাদ ,

রূপসী ও কুরূপার মধ্যে সমদৃষ্টি দুই চরণে সংহতি পেয়েছে,

ব্যক্তিনিরপেক্ষ তার প্রচুর প্রমাণ
রূপসীর অহঙ্কারে, কুরূপার কৌস্তুভে স্বরাট্…।

এতদ্ব্যতীত এসেছে বহু নতুন চরণ বা বাক্যাংশ প্রথম পাঠে যার আভাসমাত্রও ছিল না। সেই কারণেই আরো বোঝা যায়, শুধু ভাষাগত শোধনের জন্যে নয়, এমন পূর্বপাঠের বিষয়ের স্পষ্টতার জন্যেও নয়, প্রধানত বিষয় ও ভাবের বিস্তারের জন্যেই এই কবিতাটির আদ্যন্ত পরিমার্জনা প্রয়োজন হয়েছিল।

'সৃষ্টিরহস্য' : (ক্রন্দসী)

প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
সম্মুখে নিখিল নাস্তি ; পাছে মোর মৌন নীরবতা	সম্মুখে নিখিল নাস্তি ; পৃষ্ঠদেশে মৌন নীরবতা

'সাধু ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণ'-এর দোষ দূর করা ও সাধুসর্বনামের উৎখাতের প্রয়োজনে এই সংস্কার।

'প্রত্যাখ্যান' : (ক্রন্দসী)

প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
অধোমুখ আকাশের পানপাত্র থেকে	অধোমুখ আকাশের পানপাত্র থেকে
আবার ঝরিছে শিরে নীলারুণ সন্ধ্যার মাধুরী।	আবার মাথায় ঝরে নীলারুণ সন্ধ্যার মাধুরী।

ছন্দের প্রয়োজনে ক্রিয়ার শিষ্টরূপ 'করিতেছে' সংকোচনের ফলে 'ঝরিছে' হয়েছিল। সংকোচন ও শিষ্টরূপ বর্জন করে প্রাকৃতরূপ 'ঝরছে' করলে ছন্দপতনের এবং সুষমাহীনতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। পাঠান্তরে 'ঝরিছে শিরে'-র পরিবর্তে 'মাথায় ঝরে' ব্যবহার করায় ক্রিয়াপদের শিষ্টরূপের ব্যবহার ও বর্ণসংকোচ করার দায় থেকে মুক্তি পাওয়া গেল, তাছাড়া সুভদ্র 'শিরে'-র পরিবর্তে এলো প্রাকৃত 'মাথা'।

'জাদুঘব' : (ক্রন্দসী)

'ক্রন্দসী'-র 'জাদুঘর' কবিতাটিরও কবি আদ্যন্ত সংস্কার করেছেন, এখানে সংস্কার 'সন্ধান' কবিতার মতো ভাবের প্রয়োজনে নয়, আদিরূপের স্পষ্টতাসাধন ও ভাষাগত দুর্বলতা নিরাকরণের প্রয়োজনে। কবিতাটির অংশ ধরে ধরে আলোচনা করছি।

প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
উপবাসী কবি এক অপলাপী-উনিশ শতকে	এক উপবাসী কবি নাটকীয় উনিশ শতকে
মুদ্রিত পুঁথির পাতে করেছিল নাটকী ঘোষণা	অপণ্য গ্রন্থের মৌনে বলেছিল, সাক্ষী অন্তর্যামী

প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
রুদ্ধ রাজ অন্তঃপুরে আমি ব্যর্থ ফোয়ারা হব না ;	রাজন্যের কেলিকুঞ্জে শিল্পজাত উৎস নই আমি ;
হেরিবে না মুখচ্ছবি পুরনারী এ-চিত্তফলকে।	হেরিবে না মুখচ্ছবি রঙ্গিণীরা এ-চিত্তফলকে।

'এক উপবাসী কবি' কথ্যরীতির বেশি অনুগত। মাত্রাপূরণের ব্যবহৃত 'অপলাপী' 'রুদ্ধ' ইত্যাদি বিশেষণবাহুল্য দ্বিতীয় পাঠে বর্জিত হয়েছে। স্থানান্তরের সুযোগে বর্ণসংকোচ-দুষ্ট 'নাটকী' 'নাটকীয়'-তে স্বাভাবিক হয়েছে। পদ্যগন্ধী 'পুঁথি'-র বদলে এসেছে 'গ্রন্থ' ; মাত্রারক্ষার গরজে প্রথম পাঠে পাতায় না লিখে 'পাতে' লিখতে হয়েছিল, পাঠান্তরে কবি সেই বর্ণসংকোচের আশ্রয় নেন নি। করা-ধাতুর জায়গায় দ্বিতীয় পাঠে এসেছে বলা-ধাতু। 'রাজ-অন্তঃপুরে'র বদলে 'কেলিকুঞ্জ', 'ব্যর্থ ফোয়ারা' ও 'পুরনারী'র পরিবর্তে যথাক্রমে 'শিল্পজাত উৎস' ও 'রঙ্গিণীরা' অনেক বেশি সমীচীন ; বিলাসব্যসন-কৌতুকের ও কৃত্রিমতার অভিপ্রেত অনুষঙ্গ প্রথম পাঠের শব্দগুলোয় ছিল না। কিন্তু বাংলা কবিতায় দীর্ঘকাল থেকে যে সংস্কার চলে আসছে, রূপসীরা আয়নায় মুখ দেখেন না, মুখ হেরেন. সেই সংস্কারের ছোঁয়াচ থেকে সচেতন সুধীন্দ্রনাথও রেহাই পান নি।

প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
আমি অব্যাহত নদ, চিরঞ্জীব প্রবাহে আমার	আমি অব্যাহত নদ, পিপাসার্ত পশুদের ক্ষুরে
তৃষার্ত পশুর ক্ষুর, সঞ্চারিবে সার্থ আবিলতা	যদিও আবিল, তবু চরিতার্থ আমার প্রবাহ,
দিনান্তে কর্মের ক্লেদ প্রক্ষালিবে গ্রাম্য শুচিব্রতা ;	ঘুচায় কর্মের ক্লেদ পল্লীস্ত্রীর সান্ধ্য অবগাহ,
গৃহার্থী চাষীর ভিড়ে পুণ্য হবে খেয়ার দুপার।	চাষীরা গৃহাভিমুখী, খেয়ামাঝি তটস্থ সবুরে।

প্রথম পাঠে প্রকাশের দোষে আবিলতা সঞ্চারের উপর ঝোঁক পড়েছে বেশি, যা কবির আদৌ অভিপ্রেত ছিল না; পাঠান্তরে তাই অব্যাহত নদের প্রবাহের চরিতার্থতার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। পদ্যগন্ধী এবং বর্ণসংকোচন-তুষ্ট 'তৃষার্ত' হয়েছে 'পিপাসার্ত' নতুন পাঠে ব্যবহৃত 'চরিতার্থ' শব্দের সঙ্গে ঘটেছে চমৎকার মধ্যমিল। 'সঞ্চারিবে' আর 'প্রক্ষালিবে' নামধাতু বিদায় নিয়েছে, দ্বিতীয়টির জায়গায় এসেছে প্রাকৃত 'ঘুচায়'। এই সুযোগে, রবীন্দ্রনাথকে সহজেই মনে পড়িয়ে দেয় যে 'দিনান্ত' শব্দটি তাকেও অপসারিত করা সম্ভব হয়েছে। 'গ্রাম্য শুচিব্রতা'-র অবয়বত্ব বা মূর্ততার অভাব দূর হয়েছে 'পল্লীস্ত্রী' ব্যবহারে। গৃহার্থী চাষীর ভিড়ে খেয়ার দুপার কেন 'পুণ্য হবে' সে কথা অস্পষ্ট ছিল প্রথম পাঠে, পাঠান্তরে 'পুণ্য' হওয়ার প্রশ্ন পরিত্যাগ করে কবি চিত্রকল্পটিকেই বেশি উজ্জ্বল করে তুলেছেন—এতে কবিতার সন্দেহাতীত উন্নতি হয়েছে।

প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
সে-নির্গুণ দৈন্যবাদে হেসেছিনু সেদিন বিদ্রূপে।	সেদিন হাসায়েছিল দুর্গতের রিক্ত দৈন্যবাদ।
অন্ধকার অবরোধে বিষায়িত আজি প্রাণবায়ু;	অন্ধকার অবরোধে বিষায়িত আজি প্রাণবায়ু;
আকাশ কুসুমগুলি পচে গেছে গুপ্ত অশ্রুকূপে;	আকাশ-কুসুম পচে বাড়ে শুধু অশ্রুকূপে গাদ;
উন্মূল উৎকর্ষ মোর এ-নির্জনে হয় নি চিরায়ু।	আমার উৎকর্ষ হায়, মূলাভাবে হয়নি চিরায়ু।
মিসরী সমাধিসম মরুগ্রস্ত এই জাদুঘরে নিঃস্ব রোমন্থক কাল আপনারে পরিপাক করে।	মিসরী সমাধিসম মরুগ্রস্ত এই জাদুঘরে রোমন্থক মহাকাল আপনারে পরিপাক করে।

'হেসেছিনু' এই গ্রাম্যক্রিয়াপদকে উৎখাত করে পরিবর্তে এসেছে কথ্যক্রিয়াপদের অনুগামী 'হাসায়েছিল'। ফলে, এবং 'আকাশকুসুম-গুলি'-র অদরকারি বহুবচনচিহ্ন বর্জিত হওয়ায় চরণের মাত্রাসংখ্যার

যে তারতম্য হয়েছে তারই পরিণাম হিসাবে আমরা 'বিদ্রূপে/অশ্রুকূপে' এই মিলের বদলে 'দৈন্যবাদ/গাদ' এই শ্রুতিকটু মিল পাই। পঞ্চম চরণের মতো দ্বিতীয় চরণ 'আজি' সুদ্ধ অপরিবর্তিত। সাধুসর্বনাম 'মোর' দূর করে পাঠান্তরে 'আমরা' সর্বনামের স্বাভাবিকত্বে কবি ফিরে এসেছেন বটে, কিন্তু মাত্রাল্পতা দূর করার জন্যে 'হায়' অব্যয় ব্যবহার করেছেন—এক দুর্বলতা দূর করেছেন অন্য দুর্বলতার বিনিময়ে। অপ্রয়োজনীয় বিশেষণ 'নিঃস্ব' নির্বাসিত করেছেন, তাই পাদ পূরণের জন্য 'কাল' হয়েছে 'মহাকাল'।

প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
পঞ্চবর্ষ গত হল। আলোড়িয়া মরুপথধূলি	পঞ্চবর্ষ অতিক্রান্ত। মরুপথ ধূলায় আকুলি
সহসা অদৃশ্য হল। জীবনের শ্রেষ্ঠবর্ষগুলি	অচিরাৎ অন্তর্হিত জীবনের শ্রেষ্ঠ বর্ষগুলি
দৃষ্টির দিগন্তপারে···।	দৃষ্টির দিগন্তপারে···।

'অতিক্রান্ত' এবং 'অন্তর্হিত' বিশেষণের ব্যবহারে হওয়া-ধাতুর পৌনঃপুন্যজনিত দুর্বলতা এখানে দূর করা হয়েছে। 'আলোড়িয়া' নামধাতুর বদলে আর এক নামধাতু 'আকুলি' ব্যবহৃত হয়েছে বটে, কিন্তু 'ধূলি' অন্তত প্রাকৃত 'ধূলায়' নেমে এসেছে।

কিন্তু এই কবিতার যেখানে প্রধান পাঠান্তর, সেখানে পাঠান্তর মাত্র ভাষাগত নয়, সেখানে পরিবর্তন এসেছে ভাবের পরিবর্তন থেকে।

প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
একদা যে পঞ্চবর্ষ অমিতির নিশ্চিন্ত অয়নে	একদা যে পঞ্চবর্ষ অধুনার সূচীমুখ দ্বারে
ব্যূহবদ্ধশরীরের ঘনঘোর ছায়াপাত করি	অঙ্গাঙ্গি ঐক্যের ব্যূহ বেঁধেছিল, ভবিতব্য যাতে
দীপ্র ভবিতব্যতারে রেখেছিল সম্পূর্ণ আবরি	যাযাবরবৃত্তি ভুলে ক্ষণমাত্র শিবির না পাতে
আমার নয়ন হতে, স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল ব্যেপে	দুর্গের ধ্বংসাবশেষে, প্রত্যক্ষের পরীণাহ মেপে
যে মন্থর পঞ্চবর্ষ জগদ্দল প্রতি পদক্ষেপে	

প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
সুপ্রতিষ্ঠ শতাব্দীরে করে যেত হেলায় নিষ্পেষ ;	যাদের সংসারযাত্রা, ভূমিকম্প প্রতি পদক্ষেপে
সীমাশূন্য শূন্যতায় তারাও কি হল নিরুদ্দেশ ?	জুড়েছিল অসম্পূর্ণ শতাব্দীর প্রশস্ত সোপান ;
	সে-স্থাবর পঞ্চবর্ষ, তারাও কি শূন্যে ধাবমান ?

ছন্দোরক্ষার প্রয়োজনে অদরকারি বিশেষণ 'দীপ্র' ও 'সীমাশূন্য শূন্যতায়' এই পুনরুক্তিদোষ বর্জন ব্যতীত এখানে অন্য পাঠান্তরের কারণ বিষয়ের, ভাবের ও চিত্রকল্পের পরিবর্তন। পূর্বে ছিল 'সুপ্রতিষ্ঠ' শতাব্দী, পরে হয়েছে 'অসম্পূর্ণ' শতাব্দী। 'ভবিতব্য যাতে/যাযাবরবৃত্তি ভুলে ক্ষণমাত্র শিবির না পাতে/দুর্গের ধ্বংসাবশেষে' এই ইমেজের আভাসওআদিপাঠে ছিল না এবং চিত্রকল্পের এই সুস্পষ্টতাও ছিল না।

'নান্দীমুখ' : (সংবর্ত)

প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
ছায়াপ্রচ্ছদে যাতায়াত করে কারা ?	প্রচ্ছদে ওই ছায়াপাত করে কারা ?

এখানে পরিমার্জনার উদ্দেশ্য চিত্রকল্পের সঙ্গতি আনা। 'ছায়াপ্রচ্ছদে যাতায়াত'-এর তুলনায় প্রচ্ছদে ছায়াপাত শুধু সঙ্গততর নয়, বেশি সুস্পষ্টও বটে।

'সংক্রাম' : (সংবর্ত)

দ্বিতীয় সংস্করণ	তৃতীয় সংস্করণ
তোমার আমার মাঝে বিরহের বাহিনী বহে না ;	বিরহের খাতে সেতু, অভিসার আজ পারঙ্গম ,
কবিতা-প্রভব ক্রৌঞ্চ আমাদের উপমান নয় ;	বিয়োগান্ত ক্রৌঞ্চ আর আমাদের উপমান নয় ;
সম্প্রতি সঙ্গমে আর ভূষণেরও ব্যবধি রহে না,	তুমি আমি একাকার ; বীতহার সাষ্টাঙ্গ সঙ্গম ;
বিশ্রম্ভের ব্যাকরণ, নিরব্যয় আদ্যন্ত সান্বয়।	বিশ্রম্ভের ব্যাকরণ নিরব্যয়, আদ্যন্ত সান্বয়।

প্রথম পাঠের 'তোমার-আমার মাঝে বিরহের বাহিনী বহে না' এই চরণ দ্বিতীয় পাঠে অর্ধচরণে সংহত ও সুস্পষ্ট হয়েছে 'বিরহের খাতে সেতু' এবং তৃতীয় চরণ 'সম্প্রতি সঙ্গমে আর ভূষণেরও ব্যবধি রহে না' সংহতি ও সুস্পষ্টতা লাভ করেছে 'বীতহার সাষ্টাঙ্গ সঙ্গম' এই অর্ধচরণে।

এতে শুধু যে সংহতির বা মূর্ততার সৎগুণ অর্জিত হয়েছে তাই নয়, অতিরিক্ত অর্ধচরণ 'অভিসার আজ পারঙ্গম' প্রথম পঙ্‌ক্তিতে এবং 'তুমি, আমি একবার' তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে যোগ করার সুযোগ পাওয়ায় এই পদাবলীতে অগাস্টান হিরোইক কাপলেটের ভারসাম্য এসেছে। 'কবিতা-প্রভব ক্রৌঞ্চ' 'বিয়োগান্ত ক্রৌঞ্চ' হয়েছে বোঝাই যায় অর্থসঙ্গতির প্রয়োজনে; প্রথম বাক্যাংশে বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার ছবি ফুটে ওঠে নি, তাই এই পরিবর্তন।

এই অতন্দ্র রূপকারী বিবেক, আমার বিবেচনায়, প্রায় সব সময়েই এই পদাবলীকে আরো বেশি উৎকর্ষের কাছে নিয়ে গিয়েছে। এ সম্বন্ধে অবশ্য পাঠকে-পাঠকে মতভেদ থাকতেই পারে, অনেকের মনেই অনেক পাঠান্তর জাগাতে পারে সরোষ প্রতিবাদ। কিন্তু যেটা বড় কথা, সেটা হল এই পাঠান্তর-তালিকা থেকে কবির কাব্যাদর্শ কী ভাবে বাস্তবে কাজ করে তার একটা চমৎকার হদিস পাই; কবির মানসক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, বুঝতে পারি রচনার পিছনে ক্রিয়াবান কবির অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যকে। উত্তরকালের পাঠক যখন কবিমনের পরিণতি চাইবেন তখন এই ক্রমান্বয় পাঠপরিবর্তনের কথা তাঁকে হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে। উপরন্তু মনে রাখা দরকার, এই রূপকারী বিবেকের কথা সুধীন্দ্রনাথ স্পষ্টাস্পষ্টি বললেও, এই বিবেক সমস্ত আধুনিক কবির মধ্যেই বিশেষভাবে ক্রিয়াবান। এই জন্যেই আধুনিক ক.ব বিশেষভাবে সচেতন কবি।

অমিয় চক্রবর্তী : 'হাওয়া' থেকে আবহাওয়া

অমিয় চক্রবর্তীর 'অভিজ্ঞান-বসন্ত' বইয়ে 'হাওয়া' নামে একটি কবিতা আছে। এই প্রবন্ধে ঐ কবিতাটির আমি বিশ্লেষণ করতে চাই। আমার উদ্দেশ্য ঐ কবিতার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা—অর্থাৎ, 'হাওয়া' থেকে পুরো আবহাওয়া। কবিতাটি আমি তুলে দিচ্ছি।

হাওয়ার জোর। বড়ো বড়ো হাওয়া
গাছ ওপড়ায়, সমুদ্র ঝাঁকায়, যাতায়াত
করে দৈত্য তবু দেখা যায় না। আশ্চর্য।
কম বহু দূর হাঁটে না শূন্যে। আবার ছোটো হাওয়া
নিশ্বাসে ; জুঁইফুলের চারধারে,
কচি কুঁড়ি নাড়ে, মোমবাতির আলো ঠেলে,
প্রাণ দিয়ে প্রাণের বাহিরে যায় , রাঙা তরঙ্গ,
দাবানলে তার নৃত্য। শুনি বাঁশিতে। আশ্চর্য।
হাওয়াকে কাজে বাঁধি, বিদ্যুৎ পাখায়,
শীতদেশে করি তপ্ত, জমাই বরফের শ্বাসে,
আমাদের বন্দী। স্বেচ্ছাবন্দী দেহে প্রাণবায়ু।
তবু দেখো আমাদের চেয়ে বেশি, ব্যাপ্ত অনাদ্যন্ত।
শূন্য আর হাওয়ার সম্বন্ধ
তাই নিয়ে জীবন আজীবন মাটির তারায় ;
মুহূর্তে মুহূর্তে হাওয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ আজীবন।
বহে যায় মরুর শিমূম রৌদ্ররাগী ;
কখনো গহন গাছের মর্মরে অনুলাপে ;
পৌছয় হিমকৈলাসে, নামে গঙ্গামাতৃক লোকালয়ে
আশ্বিনের দরজায়। শুভ্র শঙ্খের হাওয়া। শ্লোকোত্তরা।
প্রাণপ্রকাশের আকাশ। এবং ছন্দ। এবং গতি। আশ্চর্য॥

যেমন এলিয়ট 'ফোর কোয়ার্টেট'-এ সচেতনভাবে করেছেন, তেমনি ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চভূত নিয়ে অমিয় চক্রবর্তীর কোনো কবিতাপর্যায় রচনার পরিকল্পনা ছিল কিনা জানি না। হয়তো ছিল, কারণ 'অভিজ্ঞান-বসন্তে' পঞ্চভূতের মধ্যে তিনটির বিষয়ে কবিতা আছে ; আমাদের আলোচ্য 'হাওয়া', ঠিক তার আগে 'জল' এবং আরো আগে 'বসুধা'। কিন্তু এগুলো এক সুতোয় গাঁথা নয়, তিনটে কবিতার মধ্যে একই পরিকল্পনার সাধারণ অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি না। তবু 'হাওয়া'-র সঙ্গে এই দুটো কবিতার প্রতিতুলনা করলে দেখা যায় কবিতা তিনটের ভাববস্তু এক। 'জলে'ও আছে 'তৃপ্তির চমক', সেই আশ্চর্য হওয়া, আর সেই প্রাণের কথা—'কাঙালি চিত্তমাটি রোমে রোমে/তোমার সঞ্চয়ে/শিকড়ে শিকড়ে লুকানো রুপোলি ধারা বহে।' 'বসুধা' কবিতাতেও সেই সঞ্জীবনীমন্ত্রের কথা, সেই প্রাণের কথা—'চাষের লাঙল, কাদায় সৃষ্টি/চায় বীজের সংস্পর্শ,/শিকড়ের সংঘর্ষ। /প্রাত্যহিক অফুরন্ত,/— বাড়ন্ত প্রাণবন্ত—/খোলা চোখের দৃশ্যে। /ধারিণী বিশ্বে।'

বর্তমান কবিতাটিতে হাওয়ার কার্যকলাপ বর্ণনা করেছেন কবি। প্রথমেই 'বড়ো বড়ো হাওয়ার' জোরের বর্ণনা রয়েছে। তার কাজ গাছ ওপড়ানো, সমুদ্রের ঢেউকে ঝুঁটি ধরে ঝাঁকানো। 'যাতায়াত করে দৈত্য তবু দেখা যায় না' এবং 'কম বহু দূর হাঁটে না শূন্যে'—এই দুটো বাক্যের মধ্য দিয়ে দেখা-না-যাওয়া বাতাসদৈত্যের চলাচল অবয়ব পেয়েছে, অদৃশ্য হয়েছে দৃষ্টিগোচর। বিপরীতের মধ্য দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখার তাগিদে তারপর 'ছোট হাওয়ার' কার্যকলাপ বর্ণনা—জুঁইফুল ফোটায়, মোমবাতির আলোকে জ্বালিয়ে রাখে। রাঙা তরঙ্গ দাবানলে যার নাচ, বাঁশিতে তার গান। হাওয়াকে মানুষের দরকারে কী ভাবে ব্যবহার করা হয় তারপরে তার বিবরণ পাই--পাখা চলে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হয়। মাঝে মাঝে এই বিপরীতের অবতারণা প্রসঙ্গকে প্রখরতীব্র করে তোলে এবং বৈপরীত্যের ভারসাম্য সমস্ত

কবিতাটির গঠনকে পেশী এবং মেরুদণ্ড দেয়। ব্যবহারে বাতাস ক্রীতদাসের মতো 'আমাদের বন্দী'। কিন্তু দেহে সেই যখন প্রাণবায়ু তখন 'স্বেচ্ছাবন্দী'। 'বন্দী' হোক আর 'স্বেচ্ছাবন্দী' হোক, তবু হাওয়া 'আমাদের চেয়ে বেশি, ব্যাপ্ত অনাদ্যন্ত'। এলো হাওয়ার সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধের কথা—'আজীবন মাটির তারায়' অচেতন পৃথিবীতে যে 'জীবন' আবির্ভূত হয়েছে তার 'হাওয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ' আজীবন। একদিকে বৃক্ষহীন রৌদ্ররাগী মরু, অন্যদিকে 'গহন গাছের মর্মর'; বাতাস একবার ওঠে 'হিমকৈলাসে', আবার নামে 'গঙ্গামাতৃক লোকালয়ে'। কবিতার শেষে আত্মিকতার স্তরে উন্নয়ন—'সব চেয়ে আধ্যাত্মিক কবি অমিয় চক্রবর্তী' চলে গেলেন স্বভাবসিদ্ধ পথে, 'হিমকৈলাস' 'গঙ্গা' 'শঙ্খ' 'আশ্বিন' 'শ্লোক' ইত্যাদি শব্দের মালায় পূজার অনুষঙ্গ রচনা করে। বিশেষ করে বাঙালীর শারদীয় দুর্গাপূজার অনুষঙ্গ তৈরি করলেন এই বিষম বাঙালী কবি—কারণ হিমকৈলাস থেকেই দুর্গা বছরে একবার 'গঙ্গামাতৃক লোকালয়ে আশ্বিনের দরজায়' নামেন। ছোট কাজে, বড়ো কাজে, প্রাণে পূজায়, কবিতার ছন্দে, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র যে রীদম্ তারই প্রতিরূপ হাওয়া, আর তার প্রেক্ষাপটে 'প্রাণপ্রকাশের আকাশ'।

(অনেকে বলেছেন অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা টুকরো-টুকরো ছবি দিয়ে গাঁথা, তাতে স্টিল লাইফের স্বাদ পাওয়া যায়। একথা কোনো কোনো কবিতা সম্বন্ধে সত্য হলেও এর উল্টো কথাই আরো বেশি সত্য যে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার বিষয় সচল, সক্রিয়, সজীব; তাঁর কবিতার বাক্যগুলির মধ্যে ক্রিয়াপদই প্রধানপদ, কর্তা প্রায়ই অপ্রধান, তাই অনেক ক্ষেত্রে উহ্য।) আলোচ্য কবিতার কথাই ধরা যাক—'ওপড়ায়', 'ঝাঁকায়', 'যাতায়াত করে', 'হাঁটে', 'কুড়ি নাড়ে', 'আলো ঠেলে', 'বাহিরে যায়', 'পৌঁছয়', 'নামে' এবং আরো ক্রিয়াপদ ব্যবহারে সমস্ত কবিতাটি সক্রিয় চলমান, কিছু সেখানে থেমে নেই। হাওয়াই শুধু 'এবং ছন্দ। এবং গতি' নয়, (অমিয় চক্রবর্তীর সমস্ত

কবিতাই ছন্দ-স্পন্দিত এবং গতিশীল।) এই বই থেকেই 'ইরাণ' কবিতার অংশ তুলছি,

পাহাড়ি ইরাণী গ্রাম,
মোটরে যাচ্ছিলাম
আফিমের খেতের বুকে মোটর থাম্‌ল,
ফুলে ফুলে নাম্‌ল
খস্‌খসে রঙিন আকাশ
তপ্ত মৃদু শ্বাস।...
চাকার তলে
দলে যাই চলে
পেট্রলের গন্ধে হাওয়া গুঁড়িয়ে
অভাবনীয় নিরালা যুগ ধুলোয় উড়িয়ে
প্রগতির এক বাঙালী।

এখানেও ক্রিয়াপদের প্রাধান্য লক্ষ্য করার মতো। আর একটা কথা, উদ্ধৃত অংশের 'নাম্‌ল' 'থাম্‌ল' ক্রিয়াপদে হস্‌চিহ্ন মূল মুদ্রণে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ইশারা থেকে আমরা আর একটা সূত্র পেতে পারি। (অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার ছন্দ পরিকল্পনায় ঝোঁক বা বলাঘাতের ব্যবহার কোনো আঙ্গিকগত খেয়ালের ফল নয়, কবিতার বাক্যে ক্রিয়াপদকে প্রাধান্য দেওয়ার, কবিতার বিষয়কে সক্রিয় চলমান করার প্রয়োজনে এই ঝোঁকের ব্যবহার অনিবার্য ছিল এবং এই ঝোঁক ব্যবহারের প্রয়োজন আবার কবিকে তাঁর বিশিষ্ট ছন্দ উদ্ভাবনে বাধ্য করেছিল।) সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

এই সচল সক্রিয় 'হাওয়ার' কবিতাটিতে কোনো দৃশ্যগোচর স্তবকবিভাগ নেই। কিন্তু তিনবার হাওয়ার ক্রিয়াকলাপের গতিমান এই বর্ণনাকে কবি একটি মন্তব্যের উচ্চারণে থামিয়ে দিয়েছেন— গতিস্রোত মুহূর্তকালের জন্য স্তম্ভিত হয়েছে এবং নতুন উদ্যমে চলতে

শুরু করলে আবার সেই গতি স্তব্ধ হয়েছে এই মন্তব্যের পুনরুচ্চারণে। তৃতীয় চরণের শেষে একটিমাত্র শব্দ সমন্বিত মন্তব্যময় বাক্য, 'আশ্চর্য'। অষ্টম চরণের শেষে আবার 'আশ্চর্য'। এবং কবিতার সর্বশেষ চরণে তৃতীয়বার 'আশ্চর্য'। বড়ো হাওয়ার দৈত্যপনা, ছোট হাওয়ার কুঁড়ি নাড়া আলো ঠেলা, এবং অবশেষে হাওয়ার সঙ্গে প্রাণের ও আত্মার সম্বন্ধ জেনে কবি বারবার তিনবার আশ্চর্য হয়েছেন। তিনবার এই মন্তব্য উচ্চারণে কবিতাটা যেন তিন স্তবকে ভাগ হয়ে গেছে এবং তিন জাতীয় কাজে একই হাওয়াকে লিপ্ত দেখে এই 'আশ্চর্য' উচ্চারণে কবিতাটি আবার ঐক্যও পেয়েছে। কবিতাটির ভাবের কথাও রয়েছে এই বিস্ময়াভিভূত মন্তব্যের মধ্যে। (শুধু 'হাওয়া' নয়, অমিয় চক্রবর্তীর পূর্বাপর সব কবিতাই 'আশ্চর্য' হওয়ার কবিতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'আমি আনন্দিত' এবং সেই আনন্দের প্রকাশ নির্ঝরই তাঁর কবিতার ধারা। রবীন্দ্রশিষ্য অমিয় চক্রবর্তী বলেন, আমি আশ্চর্যান্বিত। কবিতা কী? তাঁর মতে, আমি যে আশ্চর্য হয়েছি তার প্রকাশই কবিতা। 'পৃথিবীতে এসে যা দেখা গেল তার বিমিশ্র সহজ একটি আক্ষরিক পরিচয়, সাক্ষীর বিমুগ্ধ আত্মভাষায় স্বীকৃতি। কিছু আপত্তি, কিন্তু সব বিরুদ্ধতা ভুলিয়ে দেওয়া আশ্চর্য সংসারের স্রোতোধ্বনি, আশ্চর্য, রঙিন কাহিনী যা দেখা শোনা যায় না।' (ছন্দ ও কবিতা))

(এই অনুভূতি থেকেই এসেছে অমিয় চক্রবর্তীর বিশিষ্ট মরমীয়াবাদ। এই আশ্চর্যানুভূতিই কবির আধ্যাত্মিকতার উৎস। এই অনুভূতি কবিকে শুধু বিশ্বের দৃশ্যে বিমুগ্ধ করে না, কম্পমান যবনিকার অন্তরালে কোনো পরমসত্তার সন্ধানে তাঁর মিস্টিকমানসকে উৎকণ্ঠিত করে। মিষ্টিসিজমের প্রান্তে এসে পৌঁছয় যে অমিয় চক্রবর্তীর আধ্যাত্মিকতা তাকে একজন যথার্থভাবে 'বৈজ্ঞানিক মরমীয়াবাদ' নাম দিয়েছেন। 'জয় জয়শ্রী হিমালয়', 'দৈবলীন তরঙ্গ'-ময় বঙ্গোপসাগর, 'পাহাড়ের পাশে ইয়াকৃঘণ্টা', 'মেহগনির ঘন তটে-ঘেরা ইরাবতী কলস্বরা', এই

সব নৈসর্গিক দেখেশুনে মুগ্ধ কবি সংগতি-বিধায়ক 'তিনি'-কে সন্ধান করেন। (প্রিয়তম সন্ধানের মতো, অথচ তিনি আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের সঙ্গে এই প্রকৃতির বিরোধ স্বীকার করেন না, যেমন করেন অনেক সমসাময়িক। বরং প্রকৃতি যেমন সংগতিময়, তেমনি বিজ্ঞানের আবিষ্কার ব্যবহার, প্রকৃতির সঙ্গে পরমের সঙ্গে অবিরোধ সংগতিতে বর্তমান। যিনি ঝোড়ো হাওয়া আর 'পোড়ো বাড়িটার / ঐ ভাঙা দরজাটা' মেলাবেন, তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যেও মিল ঘটাবেন। তাই অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় এল্‌ম্‌ গাছ এবং রাইনের গির্জেচুড়ো গ্রামের পাশে সমঞ্জসভাবে স্থান পায়---

পেরিয়ে সাম্রাজ্যদর্পী জাহাজের উঁচু নাক,
স্টীমার, মাস্তুল, জেটির জটলা,
সাইপ্রাস থেকে সওদাভরা নৌকো, তেলের ট্যাঙ্ক,
প্রকাণ্ড ক্রেনে মাল-তোলা···। (হাইফা))

পরে 'পারাপার'-এর সময় তিনি প্লেনকক্ষে দৃষ্টি মেলে গাঢ় রাত্রিতে দেখেন—'চেতনার অস্পর্শ শরীর/ছায়া ফেলে ওড়ে/মগ্ন পৃথিবীর বুকে স্পন্দিত একাকী' (রাত্তির প্লেনে)। এবং প্লেন নামে 'অস্তিত্বের টানে ফের পুরনো দাবির পৃথিবীতে/চাকা ছোঁয় পাথুরে উঠোন' (প্রত্যাবর্তন)) 'হাওয়া' কবিতাটি লেখার সময়েও কবির আশ্চর্যান্বিত মুগ্ধ মনে এই বৈজ্ঞানিক মরমীয়াবাদ ক্রিয়াবান ছিল বলে, যে হাওয়া সমুদ্র ঝাঁকায়, বাঁশি বাজায়, রাঙা তরঙ্গ দাবানল নাচায় আর যে হাওয়া বিদ্যুৎপাখায় ঘোরে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কখনো তপ্ত, কখনো জমে বরফের শ্বাসে, এবং যা প্রাণবায়ু হয়ে দেহে স্বেচ্ছাবন্দী, তাদের মধ্যে কোনো ভেদ করেন নি। প্রকৃতির হাওয়া, বিজ্ঞানের ব্যাবহারিক হাওয়া এবং দেহ আত্মার সঙ্গে 'সম্বন্ধ আজীবন' হাওয়া—তিন হাওয়াই তাঁর কাছে এক হাওয়া এবং এক হাওয়ার তিন রূপ দেখেই তিনি আশ্চর্য হয়েছেন।

(কেউ কেউ, যেমন বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'অমিয় চক্রবর্তীর

কবিতায় একটি আশ্চর্য বৈদেহিকতা ব্যাপ্ত হয়ে আছে···।' কী অর্থে বৈদেহিকতা? এই কবিতাবলী কি রূপ, বস্তুর শরীর সম্বন্ধে নিরাসক্ত? অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা কি বিমূর্ততায় স্বধর্মভ্রষ্ট? বুদ্ধদেব বসুর মতে কোন অর্থে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা বৈদেহিকতায় ব্যাপ্ত তা আলোচনার পরের অংশ থেকে বোঝা যায়—'রক্তমাংসের আক্রমণ সেখানে সব চেয়ে কম' এবং 'এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও 'পবিত্র' তার রচনা: আলোচ্য কবিতাবলীতেও ভালবাসার দৈহিক উপাদানের নামগন্ধ নেই।' একথা ঠিক অমিয় চক্রবর্তী কখনো বলেন না জগতের অনুকারে শরীরের রূপরেখা আমাদের অনন্য সম্বল, তাঁর কবিতায় নারীদেহের কোনো কাব্যপ্রসিদ্ধ প্রত্যঙ্গের উল্লেখ নেই। এই অর্থে তাঁর কবিতা বৈদেহিক হলেও, আর এক দিক থেকে তাঁর কবিতা দেহবাদী। এই বহির্মুখী কবি বিমূর্ত ভাব নয়, মূর্ততার প্রকাশে, বাক্‌প্রতিমা রচনায় সতত সানন্দ, সুস্পষ্ট রেখায় তাঁর কবিতাবলী চিত্রল, তাঁর কবিতায় বর্ণনীয় একটি ভাষারেখার টানে রূপ পায়, সশরীরী হয়ে ওঠে—ভারতভূখণ্ড হয় 'ভারত মৃৎ-সমুদ্রের ওঙ্কৃত দূর দূরান্তর'। 'হাওয়া' কবিতাটা বিশ্লেষণ করিলেই দেখি, এখানে অদৃশ্য দৃশ্যমান, নিরবয়ব হয়েছে অবয়বময়। দৈত্যাকার হওয়াকে দেখতে পাই, বিশ্ব জুড়ে গাছ উপড়িয়ে সমুদ্র ঝাঁকিয়ে চলে; দেখি প্রদীপে সলতে উসকে দেবার মতো ছোট হাওয়ার আঙুল মোমবাতির আলো ঠেলছে; দাবানলে হাওয়া নাচছে।

অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে হপকিন্‌সের মিলের কথা অনেক সমালোচক বলেছেন, বাস্তবিক মিল আছেও, বিশেষ করে প্রকরণগত আঙ্গিকগত দিক থেকে। সে আলোচনা স্থগিত রেখে লক্ষ্য করি, এই দুই আধ্যাত্মিক কবি, একজন বৈজ্ঞানিক মরমীয়া আর মানবতাবাদী, অন্যজন রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান ধর্মভুক্ত সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের একজন যাজক, দুজনের রচনায় মানবদেহ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়া। সোসাইটি অব জিজাস সম্প্রদায়ভুক্ত হপকিন্‌সের পক্ষে দারপরিগ্রহ

করা, জনকের পরিতৃপ্তি লাভ সম্ভব ছিল না ('not breed one work that wakes') ; তাই বোধহয় তাঁর কবিতায় নারীদেহরেখা অনুপস্থিত। অথচ তিনি বস্তুময় বিশ্বকে, আবেগানুভূতিকে শরীর দিয়েছেন, আকার দিয়েছেন অমিয় চক্রবর্তীর মতোই। কিন্তু নরনারীনির্বিশেষে মানবদেহ মাত্রকেই অমিয় চক্রবর্তী যেমন প্রচ্ছন্ন রেখেছেন, হপকিন্‌স তেমন নন। বরং সমকামীর মতো উল্লসিত আকর্ষণে তিনি পুরুষদেহকে বন্দনা করেছেন, তাঁর বয়স্কজীবন পুরুষ সাহচর্যে কেটেছিল এইটিই কারণ কিনা তা অবশ্য জানি না। তিনি বিউগল-বাদক বালকের 'limber liquid youth'—কে অভিনন্দিত করেন, 'big boned and hardy handsome'। ফেলিকস্ রানডালের মৃত্যু নিয়ে কবিতা লেখেন, হ্যারি নামক সুপেশী কৃষকের 'the rack of ribs ; the scooped flank ; lank/ Rope-Over thigh ; knee-knave ; and barrelled shank' -এর কথা সানন্দে বর্ণনা করেন।

এই পার্থক্য এবং আরো কিছু মৌলিক পার্থক্যের অস্তিত্ব সত্ত্বেও দুই কবির মধ্যে মিলের জায়গা কম নয়। এই সব মিল-অমিলের প্রমাণ পাই যখন আমরা আলোচ্য 'হাওয়া' কবিতাকে হপকিন্‌সের 'The Blessed Virgin Compared to the Air We Breathe' কবিতার পাশে রেখে তুলনা করি। হপকিন্‌সের এই কবিতার প্রথম দিকের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার বিশেষ কোনো দূরত্ব নেই। সেই অংশ তুলে দিচ্ছি,

> Wild air, world-mothering air,
> Nestling me everywhere,
> That each eyelash or hair
> Girdles ; goes home betwixt
> The fleeciest, frailest-flixed
> Snow flake ; that's fairly mixed
> With, riddles, and is rife
> In every least thing's life ;

This needful, never spent,
And nursing element ;
My more than meat and drink,
My meal at every wink ;
This air, which, by life's law,
My lung must draw and darw
Now but to breathe its praise,
Minds me in many ways
Of her……

উদ্ধৃত অংশের শেষ দুতিন চরণে দুই কবির মধ্যে ব্যবধান দেখা দিয়েছে। সর্বত্র বিরাজমান পাগল বাতাস, যে-'হাওয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ আজীবন' ('rife/In every least thing's life'), যে-বাতাসকে জীবনের আইনে আমরা ফুসফুসে টানতে বাধ্য, সেই বাতাস হপকিন্‌সকে মনে পড়িয়ে দেয় মেরিমাতার কথা। বিশ্বপ্রকৃতিতে বহমান বাতাসের মধ্যে ধার্মিক খ্রীস্টান হপকিন্‌স দেখেছেন যিশুমাতার প্রতিচ্ছায়া, তাই তাঁর কবিতা এখান থেকে স্বতন্ত্র পথে এগিয়ে পরিণামের স্বতন্ত্র প্রার্থনায় সমাপ্ত হয়েছে ; 'Be thou then, O thou dear/ Mother, my atmosphere ; ……World-mothering air, air wild/, Wound with thee, in thee isled,/Fold home, fast fold thy child.'

'হাওয়া' কবিতায় পূজার অনুষঙ্গপূর্ণ শব্দাবলী ব্যবহারে অমিয় চক্রবর্তী বিষয়কে আধ্যাত্মিক আভায় মণ্ডিত করেছেন বটে, কিন্তু ধর্মাতুর হপকিন্‌সের আর্ত প্রার্থনা, ঈশ্বর-আকুলতা তার মধ্যে নেই। এই মানবতাবাদী কবির স্যেকুলার আধ্যাত্মিকতায় কাব্যের চারিদিকে একটা জ্যোতিশ্চক্র বা প্রচ্ছায়া রচিত হয় বটে, কিন্তু ধর্মের তত্ত্বগত মেধা অনুস্যূত থাকলে ধর্মকাব্যে যে অধ্যাত্মগভীর উপলব্ধি প্রকাশ পায় তা অমিয় চক্রবর্তীতে নেই। তাঁর আধ্যাত্মিকতা সর্বজীবজগতের প্রতি মমতার নামান্তর, তাঁরই শ্রদ্ধেয় সোয়াইট্‌জারের ভাষায় 'reverence for life'। এবং এই আধ্যাত্মিকতা ব্যক্তিগত। ধর্মতত্ত্বের

দীর্ঘকালগত ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে হপকিন্সের ব্যক্তিগত তীব্র আধ্যাত্মিক সমস্যা গভীরতা ও সমুন্নতি পেয়েছে। তাই তাঁর কাব্যে বিশেষ ধর্মতত্ত্বের ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও তা অন্য ধর্মাবলম্বী রসিকের মনে সাড়া জাগাতে পারে—অন্য মানুষকে করে নিতে পারে তাঁর আত্মিক সংকটের অংশীদার। অমিয় চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতা বিশেষ ধর্মমতের পটভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে না। তাই অমিয় চক্রবর্তীর 'হাওয়া' 'আশ্বিনের দরজায়' পৌঁছয়, 'শুধু শঙ্খের হাওয়া' হয়, কিন্তু তার বেশি এগোয় না।

ভাবের দিক থেকে হপকিন্সের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর এই দূরত্ব মানতেই হবে, যেমন মানতে হবে জীবনানন্দের কথা 'আঙ্গিকের ইশারা তিনি পেয়েছেন হপকিন্সের কাছে।' অমিয় চক্রবর্তী কথ্যরীতি দিয়ে প্রচলিত ছন্দশাস্ত্রের সমমাত্রিক পর্বের বাধ্যতা অতিক্রম করে যান। হপকিন্স তাঁর স্প্রাং রীদম্ ব্যবহার কালেও ছন্দকে নিয়মিত সিলেব্ল-এর অভ্যাস থেকে মুক্ত করেছিলেন; ঝোঁক বা বলাঘাত ব্যবহার করেছিলেন ছন্দের তন্দ্রাচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে দেবার জন্যে। হপকিন্সের মতো অমিয় চক্রবর্তীও চলিত বাক্‌স্পন্দের বৈচিত্র্য ও স্থিতিস্থাপকতা এনেছিলেন তাঁর ছন্দে হলন্ত শব্দে বলাঘাত ব্যবহার করে অথচ কেন্দ্রীয় সংযমের ব্যাপারে এতটুকু শৈথিল্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে। দুজনেরই 'semantic rhythm (the rhythm of thought, meaning) breaks across the metrical pattern'।

> আলো-নীল,/চূর্ণ সবুজ-সাদা,/মেঘ-ছোঁওয়া,
>
> কালো,/বাঁকা-চন্দ্রিত,
>
> রৌদ্র তরঙ্গ-চূড়,/উদ্‌ভ্রান্ত
>
> কখনো মাধ্যাহ্নিক/শান্তি
>
> তরল দৈগন্তিক ;/হে সমুদ্র। (অয়ন)

এই অংশের স্পন্দন নিয়মিত ছন্দকে ছুঁয়ে, ছুঁয়ে গেছে; প্রায়

প্রত্যেকটি হলন্ত শব্দে এক-একটি বলের আঘাত নিয়মিত ছন্দের অভ্যাসকে এড়িয়ে গেছে আবার পর্ববিভাগ করতে হয়েছে নিঃশ্বাসপতনের তালে-তালে নয়, অর্থ বা ভাবের ভিত্তিতে। ভিতর থেকে ভাবের আবেগ, বাহিরে থেকে ঝোঁকের আঘাত ছন্দের নিয়মিত ছক্ অতিক্রম করে বৈচিত্র্য ও স্থিতিস্থাপকতা দিয়েছে ; আবার নিয়মিত ছন্দ থেকে এতদূরে সরে যায় নি যাতে কবিতায় কেন্দ্রীয় স্থাপত্যের সংযম ভ্রষ্ট হতে পারে।

ছন্দের ব্যবহারে এই বিধি ও অবিধির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে অমিয় চক্রবর্তী হপকিন্‌স ছাড়া আর এক জায়গায় শিক্ষানবীশী করেছিলেন। কবি 'সাম্প্রতিক' বইয়ে নিজেই বলেছেন, 'অবশ্য ফরাসী vers libre-এর এলাকায় বারে-বারে নেমেছি। আটপৌরে গদ্যের ঈষৎ ছন্দমিশ্রিত চালচলন (যেমন Whitman-এর free verse-এ) আমার কাব্যসাধনার একান্ত পরিপন্থী। আমার নিজের দিক থেকে বলবো, ঢের বেশি তৃপ্তি পাই অন্তর্লীন ঝঙ্কৃত এবং সংহত Vers libre-এর রাজ্যে' (ছন্দ ও কবিতা)। ফরাসীরা দুই জাতীয় ছন্দের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে ; Vers libre যার জন্ম নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায়, আর Vers libere যা পূর্বনির্দিষ্ট কোনো ছন্দের ছক্ থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রথমটি হুইটম্যান ব্যবহার করেছেন, রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দে তারই অনুসরণ করেছেন। গ্রাহাম হাউ তাঁর 'Image and Experimce' গ্রন্থে এই জাতীয় ছন্দের স্বাতন্ত্র্য চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। Vers libre যাকে বলা যায় free verse বা গদ্যছন্দ তার সঙ্গে প্রথাগত ছন্দোরীতির কোনো সম্পর্ক নেই। হাউসাহেব লরেন্সের 'The Snare' কবিতা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সেটি এই প্রথম রীতিতে লেখা। অপরপক্ষে এলিয়টের 'Love song of J. Alfred Prufrock' দ্বিতীয় রীতির, Vers libere-এর উদাহরণ। কারণ এই কবিতার ছন্দ প্রথম রীতির মতো বন্ধনহীন নয়। এই কবিতার মূল ভিত্তি iambic decasyllable

এবং কবিতার পর্ব এবং চরণ কখনো কখনো ছন্দের মূল ছককে অতিক্রম করে বটে, কিন্তু বারে-বারে মূল ছকে ফিরে আসে। তাই অমিয় চক্রবর্তী যখন ফরাসী Vers libre বলেন তখন তিনি আসলে বলতে চান Vers libere ; Vers libere-এই তাঁর আদর্শ, যেখানে নিয়মের ও নিয়মভাঙার এক অপরূপ সামঞ্জস্য। তার মধ্যে নিয়মিত ছন্দের তন্দ্রাচ্ছন্ন অভ্যাস নেই, আবার গদ্যছন্দের নামে 'genenal sloppiness' (পাউণ্ড)-এর অনাচার অনুপস্থিত। 'হাওয়া' কবিতার ছন্দোলিপি করলেই এই ছন্দের প্রকৃতি এবং অমিয় চক্রবর্তী কী ভাবে তাকে ব্যবহার করেছেন তা বোঝা যাবে।

> হাওয়ার জোর।/বড়ো বড়ো হাওয়া।
> গাছ ওপড়ায়,/সমুদ্র ঝাঁকায়, যাতায়াত
> করে দৈত্য তবু দেখা যায় না। আশ্চর্য।
> কম বহু দূর হাঁটে না শূন্যে। আবার ছোটো হাওয়া
> নিঃশ্বাসে ; জুঁইফুলের/চারধারে,
> কচি কুঁড়ি নাড়ে, মোম/বাতির আলো ঠেলে,
> প্রাণ দিয়ে/প্রাণের বাহিরে যায় : রাঙা তরঙ্গ,
> দাবানলে তার নৃত্য।/শুনি বাঁশিতে। আশ্চর্য।

অপূর্ণ ও অতিপূর্ণ মাত্রার পর্ব বাদ দিলেও কয়েকটা অনিয়মিত পর্বের উপস্থিতি ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে ছন্দের গাণিতিক হিসাবকে লঙ্ঘন করে বৈচিত্র্য ও স্থিতিস্থাপকতা এনেছে। কিন্তু এই অংশের বেশির ভাগ পর্বই আট মাত্রার। তাই কবিতাটি শৈথিল্যে এলিয়ে পড়েনি, গদ্যছন্দে যেমন সচরাচর হয়। অমিয় চক্রবর্তী যে Vers libere-এর আদর্শ ব্যবহার করেছেন তাঁর অধিকাংশ কবিতার ছন্দে, এ কথা বুদ্ধদেব বসু খানিকটা অন্ধকারে হাতড়ানোর মতো অনুমান করতে পেরেছিলেন 'কালের পুতুলের' লেখায়। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'ভাঙা পয়ারই তাঁর সব চেয়ে প্রিয়, পদ্যের সঙ্গে গদ্যের

মিশ্রণ করে তিনি আনন্দ পান ; যখন তিনি গদ্যে কবিতা লেখেন, সে-গদ্য পদ্যের ধ্বনিকে দখল করতে সচেষ্ট হয়')(অমিয় চক্রবর্তী : খসড়া)। আর এক জায়গায়, 'অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা অভিনব গন্থছন্দে লেখা যাতে গদ্য প্রায়ই ছন্দের ধ্বনিকে বাজেয়াপ্ত করে…' (অমিয় চক্রবর্তী : এক মুঠো)।

(কতকগুলো প্রকরণগত কৌশল অমিয় চক্রবর্তী হপকিন্‌সের মতো ব্যবহার করেন, প্রসাধন হিসাবে নয়, গার্ডনারের ভাষায় 'Complex expressional rhythm' গড়ে তোলার জন্যে। তিনি এই ছন্দকে বলেছেন অর্থছন্দ, প্রকাশের ছন্দ। অর্থ বা ভাব প্রকাশের তাগিদে এখানে শব্দগুচ্ছ নিয়মিত ছন্দের প্রথাকে মাঝে মাঝে অতিক্রম করে যায়। অর্থপ্রধান বলে 'meaning unit'-এর দিকে লক্ষ্য রেখে এই কবিতার ছন্দোলিপি করতে হয় এবং এই 'meaning unit' পর্বের জায়গা নেয় বলে সামান্য পরিসরে ভাবার্থ সংহত করার তাগিদে, যেমন হপকিন্‌স তেমনি অমিয় চক্রবর্তী, বাধ্য হয়ে শব্দ-যুগল বা সমাস প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেন।) এই ব্যবহার তাঁদের কোনো উৎকেন্দ্রিক খেয়ালের ফল নয়। তাই একজন লেখেন 'anvil-ding', 'heaven-flung', 'heart-fleshed', 'maiden-furted', 'dappledawn-drawn', অন্যজন লেখেন 'আকাশ-মুক্তি', 'হীরে-রোদ্দুর', 'রাতজাগা-ভোরলাগা', 'আনন্দ-আশ্চর্য', 'গিরিগৈরিক'। আলোচ্য কবিতাতেও এই জাতীয় অনেক সমাস আমরা পাই— 'রৌদ্ররাগী', 'হিমকৈলাস', 'গঙ্গামাতৃক'। লক্ষণীয় দুজনের শব্দযুগলেই অনুপ্রাসের ঝঙ্কার। আসলে (একই অভিপ্রায়ে এই দুই কবি অনুপ্রাস ব্যবহার করেন। ভাব ও অর্থের অন্তর্গত প্রয়োজন নিয়মিত ছন্দের ছককে লঙ্ঘন করে যায়, তার ফলে যে ছন্দপতনের অস্বস্তি তাকে রোধ করার তাগিদে অনুপ্রাস, অর্ধানুপ্রাস, মধ্যমিল প্রভৃতি কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে।)

পদস্খলনের সম্ভাবনামাত্রে একটি ধ্বনি সমধ্বনিকে টংকারে

বাজিয়ে তুলে ভারসাম্য বজায় রাখে। হপকিন্সের নিচের লাইনগুলোয় অনুপ্রাস ও মধ্যমিলের ব্যবহার লক্ষণীয়,

Stroke and a stress that stars and storms deliver,
That guilt is hushed by, hearts are flushed by and melt...

(The Wreck of the Deutschland)

আর এক জায়গায়,

The grey lawns cold where gold, where quick gold lies···

(The Starlight Night)

তুলনীয় অমিয় চক্রবর্তীর কয়েকটি লাইন,

বাক্যের নীল জল, অগাধ উজ্জ্বল, উচ্ছল,
কথায়-কথা-গাঁথা অস্ফুট, স্ফুটনোন্মুখ,
প্রত্যহের তটে দোলায় অকথিত অনন্তা—
প্রত্যহ মনের কথা। (অনির্বচনীয়)

আবার অন্য জায়গায়,

একদিকে বালির স্তব্ধ সাদা-সোনালী, হঠাৎ নামে প্লাবনী—
তটজলে চাঁদের লাবণি।
বুকভরা অধীর : শান্ত তীর। (বঙ্গোপসাগর)

অবশ্য 'অভিজ্ঞান বসন্তের' অন্য সব কবিতার রচনারীতির সঙ্গে 'হাওয়া'-র কিছু অমিলও আছে। যে হলন্ত সিলেব্‌ল ব্যবহারে অমিয় চক্রবর্তী বলাঘাতের সাহায্যে হপকিন্সের স্প্রাং রীদ্‌মের তুল্য ঝাঁপতাল তৈরি করেছেন—'বেলা সাড়ে তিনটেয় সূর্য নেমেচে/প্রকাণ্ড মোটর-লরির পায়ে ঘুঙুর,'ঝিন্‌ঝিন্/লণ্ডনের রাস্তায় বাজাচ্চে ভিখিরি ইতালিয়ান্/ব্যারেল অর্গান্' (উর্বশী)। সেই বলাঘাতের ঝোঁক 'হাওয়া'-য় নেই। কারণ আগেই ছন্দোলিপি করে দেখেছি, এই কবিতার মূল ভিৎ পয়ারের আটমাত্রিক পর্ব। আর একদিক থেকেও এই কবিতা ব্যতিক্রম, কারণ এই কবিতায় চমকে দেওয়া লুকোনো মিল, মধ্যমিল, অনুপ্রাসের ঝঙ্কার যেন অনুপস্থিত ; যেটুকু আছে তা বড়ো অন্তর্লীন আর লাজুক।

করে দৈত্য তবু দেখা যায় না···

কচি কুঁড়ি নাড়ে···আলো ঠেলে···

···রাঙা তরঙ্গ···

···শুনি বাঁশিতে/আশ্চর্য।···

আশ্বিনের দরজায় শুভ্র শঙ্খের হাওয়া শ্লোকোত্তরা

প্রাণপ্রকাশের আকাশ।

এই কবিতায় পয়ারের নকসা অনেকটাই স্বীকৃত হওয়ায় এবং পয়ারের ছক থেকে ব্যতিক্রম তুলনায় কম হওয়ায়, ছন্দের পদস্খলন বাঁচানোর জন্যে অন্যত্র যে অনুপ্রাসের বিন্যাস করতে হয়েছে এখানে তার দরকার হয়নি। তাই কারুরীতির দিক থেকে এই কবিতাটি 'অভিজ্ঞান বসন্ত' পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে অনেকটা ব্যতিক্রম, কিন্তু এই ব্যতিক্রম নিয়মকে বুঝতে সাহায্য করে।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় কাব্যজিজ্ঞাসা

কবির কোনো হাত নেই ইতিহাসে। 'অর্থ আর মোক্ষের প্রগতি/ আনেন নি বাল্মীকি, ভার্জিল, সাফো। তবে কেন—কেন?' তবে কেন কবিতা লেখা?—

> ব্যর্থ কাম, ক্রোধের তৃপ্তির জন্য? প্রতিহিংসার
> ছদ্মবেশ? বিফল অহমিকার কুটিল চাতুরি?
> না কি শুধু অন্য কিছু নেই বলে এই ছলে কালের প্রহার
> ভুলে থাকা?···কেন, বলো! এই প্রশ্ন মনে হয় মৌলিক, জরুরি।

এই যে প্রশ্ন তুলেছেন বুদ্ধদেব বসু 'যে-আঁধার আলোর অধিক' বইয়ের 'কেন' কবিতায়, সে সব প্রশ্ন মৌলিক, জরুরি ঠিকই। কেন কবিতা লেখা, কী এই কবিতা বস্তু? কিন্তু কি করে বুদ্ধদেব বললেন, 'কিন্তু কোনো উত্তর কোথাও নেই। সব চেয়ে কম/কবির আলস্যময় উচ্চারণে···'? কেন না রোমান্টিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের অনেক কবিতারই বিষয় কবিতা। কবিতা কী, কবিকল্পনার স্বভাব কেমন, কাব্যসৃষ্টিতে দৈবী প্রেরণার ভূমিকা, প্রকৃত জগৎ ও কাব্যকল্পনার সম্পর্ক, এই সব প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন রোমান্টিক কবিদের অনেকেই, তত্ত্বালোচনায় ভরা প্রবন্ধে নয়, কবিতায়—শেলি এবং কীট্‌স, কোলরিজ ও রবীন্দ্রনাথ। সেই সব জিজ্ঞাসাই দিয়েছে উত্তরের ইশারা।

আর বোদলেয়ারের পর থেকে কবিতায় যে আধুনিক যুগের আরম্ভ তার তো কথাই নেই। রোমান্টিকতারই যে দ্বিতীয় প্লাবন সেই প্রতীক কাব্যাদর্শের অন্তর্ভুক্ত বা তার দ্বারা প্রভাবিত প্রায় সব বড় কবি কবিতার রহস্য বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কবিতায়। এই আত্মসচেতন যুগের শিল্পীরা তাঁদের শিল্প-অভিজ্ঞতা বিষয়েও সচেতন

হয়ে উঠেছেন ; কবিতার মধ্যেই মেতেছেন আত্মসমীক্ষায়, কাব্যজিজ্ঞাসায়। পোলদেশীয় নাট্যসমালোচক জান কট্ ইদানীংকালের নাটক সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন সে কথা আধুনিক কবিতা সম্বন্ধেও খাটে। প্রকৃতির সামনে আরশি ধরা, তাঁর মতে, আধুনিক নাটকের কাজ নয়—'it often takes the mirror itself as its theme : the mirror's existence, function, chemical composition. Thus the mirror sees itself.' (Theatre Notebook 1947-1967)। চিত্রশিল্পেও একই প্রবণতা। নাট্যপ্রক্রিয়াই যেমন নাটকের বিষয়, চিত্রকলাই যেমন চিত্রের বিষয়, তেমনি আধুনিক অনেক কবিতারই বিষয় কবিতা —আরশি এখন নিজের মুখচ্ছবি নিজেই দেখছে। অনেক থেকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি—অর্ফিউসের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত রিলকের সনেটসমুচ্চয়। বুদ্ধদেব বসু নিজেই সে বিষয়ে বলেছেন (রিলকের অনুবাদের ভূমিকায়) : 'কবিতার পর কবিতায়, পাপড়ির পর পাপড়িতে, রিলকে এখানে উন্মোচন করেছেন শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়া ; কেমন করে 'জীবন' রূপান্তরিত হয় শব্দে ও ছন্দোবন্ধে, অপস্রিয়মাণ মুহূর্তগুলি স্থায়িত্ব পায় কোনো-না-কোনো শিল্পরূপে—সেই রহস্যের অন্তঃপুরে যেন নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের।'

বুদ্ধদেব বসুর 'যে-আঁধার আলোর অধিক' কবিতা-সংকলনটির যদি কোনো বিষয় থাকে তবে সে বিষয় কবিতা। কেন উপমা, কেন ছন্দ, কীভাবে স্মৃতি বা মগ্নচৈতন্যে সঞ্চিত বিষয় অভিজ্ঞতাপুঞ্জ থেকে দৈবীপ্রেরণার তাড়নায় কবিতার জন্ম হয়, কীভাবে চৈতন্যের পৌনঃপুনিক আক্রমণে সেই তাড়নাকে বশীভূত করতে হয়—এই সব প্রশ্নেরই কাব্যময় জবাব খুঁজেছেন বুদ্ধদেব এই বইতে, কখনো আত্মজৈবনিক কোনো তথ্যকে কখনো কোনো পৌরাণিক উপাখ্যানকে বা কোনো পূর্বসূরির উক্তিকে যাত্রারম্ভের চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করে। আর শুধু এই বইতে কেন, কবির এই শিল্পসমীক্ষা ছড়িয়ে আছে

'বন্দীর বন্দনা' থেকে শুরু ক'রে বুদ্ধদেবের সমস্ত রচনায়। সেই সব জায়গায় পাই কবির সঙ্গে কবির সংলাপ—সেই সংলাপের মধ্য দিয়ে কবিকে দেখি কাব্যাদর্শের সন্ধানী। এই জিজ্ঞাসা এত অবিরলভাবে আর কোনো আধুনিক বাঙালি কবিকে এত উত্তেজিত করেছে বলে আমার জানা নেই। বুদ্ধদেবের কবিতা থেকে তাঁর এই কাব্যজিজ্ঞাসা বিশ্লেষণের চেষ্টাই এই প্রবন্ধ।

রবীন্দ্রনাথের মতো বুদ্ধদেবও বুঝেছিলেন, কবিতা লেখা 'একটা ব্যাপার, যাহার উপর আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।' শ্রীনরেশ গুহকে লেখা একটা চিঠিতে বুদ্ধদেব সেই উপলব্ধির কথাই বলেছেন : 'রচনাকর্মের মধ্যে একটা অনিবার্যতা আছে। সত্যি বলতে, কবিতা আমরা লিখি না, কোনো-কোনো কবিতা আমাদের দিয়ে নিজেদের লিখিয়ে নেয়। তার রূপ, ছন্দ, গড়ন সমস্ত নিয়েই সে আসে, যাকে বলে ডিক্টেট করে, আমরা সেই হুকুম তামিল করি মাত্র' (কলকাতা, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা)। এ তো অনেক পুরনো কথা, বাল্মীকির কবিত্বলাভের মতো, কালিদাসের সরস্বতীর বরপুত্র হওয়ার কিংবদন্তির মতো পুরনো, প্লেটোর তত্ত্বের মতো পুরনো। অতদূর না গেলেও চলে; ইংরেজ ও জার্মান রোমান্টিক কবিদের মধ্যেও এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন সৎ কাব্য রচনা যে শক্তির প্ররোচনায় ঘটে সেই শক্তি লেখকের ইচ্ছাধীন নয় শুধু কারুকৌশলে হয় না, তার জন্যে চাই 'celestial inspiration'।

সেই শক্তিই ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮১৮ থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮১৯ এই এক বছরের মধ্যে কীট্সকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল তাঁর মহত্তম রচনাবলি। অলৌকিক প্রেরণায় এলিজিসমুচ্চয় এবং সনেটগুচ্ছ রচনা সমাপ্ত করার পর সেই ঐশ্বরিক প্রসাদে অভিভূত হয়ে যে-দৈবপ্রেরণাকে রিলকে বলেছিলেন 'এক অনির্বচনীয় তুফান, আত্মার এক ঘূর্ণিবায়ু' তার প্রতি বুদ্ধদেবের অবিচলিত আস্থা।

সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ে বলতে গিয়ে তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন: 'তাঁর সঙ্গে মালার্মের একমাত্র সাদৃশ্য দৈববর্জনের সংকল্পে, স্বায়ত্তশাসনের উৎকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু মানুষের পক্ষে দৈববর্জন কি সম্ভব? এই যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অধ্যবসায়ের শক্তি, এও কি দৈবেরই দান নয়?' 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে জীবনদেবতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে তাই তিনি এতটাই উৎসুক বোধ করেছেন। জীবনদেবতাকে বুদ্ধদেব বলেছেন: 'মানসসুন্দরী বা বিদেশিনীর মতো ইনি দেহিনী নন, কোনো মানবিক পটভূমিকায় এর প্রতিষ্ঠা নেই; ইনি একেবারেই অন্তরঙ্গ, অথচ ইনি চঞ্চল, পলাতক, পরিচালক ও সর্বেশ্বরী। কবি তাঁকে যে ক্ষমতা আরোপ করেছেন তারই নাম সৃষ্টিশীলতা; তিনিই ইচ্ছশক্তি ও প্রেরণার উৎস, কবির অর্ধচেতন অন্ধকার মনও তিনি!' এই উদ্ধৃতির অন্তর্গত 'সর্বেশ্বরী' শব্দটি লক্ষণীয়, কেন না এই নামে 'যে-আঁধার আলোর অধিক' সংকলনে একটি কবিতা আছে, যার বিষয়ও অন্তঃপ্রেরণা। সেই সর্বেশ্বরী প্রেরণাতেই জড়ের রূপান্তর হয় শিল্পিত সৌন্দর্যে—

> ঘটায়, ঘোমটার তলে, মৌলিকের নিত্য রূপান্তর—
> পদার্থের, চেতনায়; স্পন্দমান মাংসের, মানসে;
> বিষ্ঠার, প্রোজ্জ্বল ফুলে; অঙ্গারের, নবান্ন-পায়সে;
> এবং মলের ভাণ্ডে ছেঁকে তোলে সম্ভাব্য ঈশ্বর।

সেই দৈবপ্রেরণার বন্দনায় বুদ্ধদেব বসুর কবিতা অনর্গল। 'তোমারই চকিত স্পর্শে কেঁপে ওঠে কল্পনার শ্রোণী, / কবিতার জন্ম হয়' (ছন্দ)। অথবা 'স্বর্গবীজ' কবিতায়— 'তারা!···তারা!··· স্বর্গবীজ! জ্যোতির জন্মের রতি! দেবতার রেতঃ স্রোত! কোন ক্ষেত্র তার?' সেই বীজ 'কোথাও ধরে না, কোথাও না।' কিন্তু 'তবু করে কল্প-কল্প ধরে, যদি পড়ে, যদি ধরা পড়ে কোনো কণা জ্যোতির্যোনি কবি-কল্পনায়।' অক্ষম বন্ধ্যাত্বে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মনে হয় 'আমিও তোমার মতো নিঃসন্তান হয়েছি এখন' (সমুদ্রের

প্রতি—জাহাজ থেকে) কিন্তু ঠিক 'তারপর এলো দেবদূত' (আবির্ভাব) এবং বন্ধ্যা ক্ষেত্রে কবিতার জন্ম হল। পার্থ এবং পার্থসারথির সম্পর্ক-প্রসঙ্গ ব্যবহার করে বুদ্ধদেব লেখেন সেই প্রতারক, সমর্থ, সজ্ঞান শক্তি বিনা কবির গতি নেই—'সারথি নিস্পৃহ যবে, সেইক্ষণে নিঃশেষ অর্জুন।' (শিল্পীর উত্তর) তাই সেই প্রবল শক্তিকে কবি ডাক দেন 'এসো না, আঘাত করো, ধরে নাও আমাকে উদাস,/হানো এক মুহূর্তে বাঁধন-ছেঁড়া বিদ্যুতের মতো বলাৎকার...' (না-লেখা কবিতার প্রতি : ৩)। এইসব জায়গায় যৌনসঙ্গমের ও নারীগর্ভে বীজবপনের ইঙ্গিতগুলো চোখে না পড়েই পারে না।

'মানি, এক অন্তর্যামী মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নিয়ে/ভরে দেয় আপন গোপন অর্থে উন্মীলন...' (মিল ও ছন্দ)। সেই অন্তর্যামী 'দেবতা, নির্জ্ঞান মন, না কি এক চতুর শয়তান', যাই হোক না কেন, তাই যদি পরম ও প্রাথমিক হয় তাহলে সৃষ্টিকর্মে চৈতন্যের যে ভূমিকার কথা আধুনিক অন্য কবিদের মতো বুদ্ধদেব বারবার বলেছেন তাকে মূল্যবান মনে করার কারণ কোথায়? চৈতন্যের ভূমিকা আছে, যেহেতু সেই সর্বেশ্বরী 'চঞ্চল, পলাতক' এবং 'প্রতারক'; সে কত ইঙ্গিত দেয়, হাতছানি দেয়। চৈতন্যের অনলস প্রয়াসেই সেই সব প্রতারক চতুর ইঙ্গিতকে শিল্পে স্তম্ভিত করা সম্ভব। বুদ্ধদেব নিজেই বলেছেন : 'প্রথম যেদিন বীজ উড়ে এসে পড়লো, আর তৈরি লেখাটা বেরিয়ে এলো যেদিন' : এই দুই বিন্দুর মধ্যে নেপথ্যে চলে অনেক আয়োজন, কবির জীবনে অনেক নতুন সমন্বয় ও বিন্যাস, আহরণ ও বর্জন ও সংশ্লেষ...।' (সাহিত্য সংখ্যা দেশ, ১৯৭৯)। কখনো করতে হয় দীর্ঘ প্রতীক্ষা ('অথচ আংটি যদি দিতে চাই, নানা ছলে ফেরাও তারিখ') কখনো মেলে আকস্মিক সার্থকতা এক বৈদ্যুতিক মুহূর্তে। অজস্র আভাসের মধ্যে নিতান্ত বিরল কয়টিকে চৈতন্য মল্লযুদ্ধে জয়ী হয়ে স্থায়িত্ব দিতে পারে, এ কথা বলতেও বুদ্ধদেব নারীগর্ভে বীর্যনিষেকের উপমা ব্যবহার করেছেন।

একটি আমের মূল্য শত লক্ষ মুকুল সংহার ;
যদিও একত্রে ছোটে জীবনের কোটি সম্ভাবনা,
পথে সব মরে গিয়ে, খুঁজে পায় জরায়ুর দ্বার
শুধু এক—শ্রেষ্ঠ নয়, বলীয়ান, আগ্রহে স্বাধীন ;
হয়তো সে নিরীহ বেচারামাত্র, তবু জ্যান্ত বলে,
অজ্ঞাত বিক্রমাদিত্যে সকলেই অনায়াসে ভোলে।

(না-লেখা কবিতার প্রতি : ১)

এই কবিতারই গদ্যব্যাখ্যা আছে শ্রীনরেশ গুহকে লেখা কবির পূর্বোদ্ধৃত চিঠিতে : 'যার আদেশের জোর সবচেয়ে বড় সেইটেই প্রেতলোক থেকে প্রাণলোকে উত্তীর্ণ হয়, যার দাপট কম, যে দুর্বল, সে বেচারারা দরজার ধারেই পৌঁছতে পারে না, কিংবা বেরিয়ে এসেও অকালে মারা পড়ে। এই ব্যাপারটাকে সৃষ্টির মূলতত্ত্ব পর্যন্ত প্রসারিত করে দেখতে পারো। নারীর গর্ভে পুরুষের প্রাণবীজ একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ যাত্রা করে, কিন্তু সেটা যাত্রা নয়, পাল্লাদৌড়, তাতে প্রবলতম একটিমাত্রই শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যভেদ করতে পারে, অন্যগুলোর ক্ষীণপ্রাণ পথে-পথেই অবসিত হয়।' এই উক্তির সঙ্গে 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথার সাদৃশ্য আছে। বুদ্ধদেব বলেছেন 'একটি আমের মূল্য শত লক্ষ মুকুল সংহার,' রবীন্দ্রনাথের তুলনা কাঁঠালের, 'কাঁঠাল গাছে উপযুক্ত সময়ে হুড়াহুড়ি করিয়া ফল তো বিস্তর ধরিল, কিন্তু ফলগুলো ছোটো ডালে ধরিয়াছে, যাহার বোঁটা নিতান্তই সরু, সেগুলা কোনোমতো কাঁঠাললীলা একটুখানি শুরু করিয়াই আবার অব্যক্তের মধ্যে অন্তর্ধান করে।...আমাদের ভাবনাগুলোরও সেই দশা।...কিন্তু ভাবুক লোকের চিত্তে ভাবনাগুলা পুরাপুরি ভাব হইয়া উঠিতে পারে এমন রস আছে, এমন তেজ আছে। অবশ্য অনেকগুলা ঝরিয়া পড়ে বটে, কিন্তু কতকগুলা ফলিয়াও উঠে।' এই ভাবে যাকে প্রেরণ করে দৈবাদেশ বা নির্জ্ঞান মন, তাকেই চৈতন্যের অনুশাসন সংগত রূপ দেয়।

রূপ দেয়, অথচ রূপ দেওয়াটা কোনো বাইরে থেকে আরোপিত ব্যাপার নয়। বুদ্ধদেব বলেইছেন 'তার রূপ, ছন্দ, গড়ন সমস্ত নিয়েই সে আসে'—আসে ঠিকই, কিন্তু যা অন্তর্গূঢ় ভাবে আসে তাকে বের করে আনতে হয়। দৈবাদেশের মধ্যে যে রূপের প্রত্যাশা থাকে তাকে পূরণ করতে হয়। অর্ফিউসের প্রতি সাত নম্বর সনেটের তর্জমায় যেমন লিখেছেন বুদ্ধদেব—'বন্দনায় অঙ্গীকৃত হয়ে/সে এলো বেরিয়ে, যেন নিঃশব্দ পাথর থেকে ধাতুর উন্মেষ।' আঙ্গিক আসলে সেই চৈতন্যের শাসন জারি করার উপায়, অথচ সেই কলারীতিও অন্তর্নিহিত থাকে প্রেরণারই মধ্যে।

সে করুণা করে
পাঠিয়েছে প্রতিভূ, প্রবক্তা, দূত—ছন্দ, মিল, ধ্বনির ইশারা
নিরঞ্জন গণিত, আবহমান নিরুক্তের অমোঘ বিধান—
যার পূত শাসনে সঞ্চিত জল, নর্দমায় স্বেচ্ছায় না-ঝরে
হয়ে ওঠে অধীর, উদ্দেশ্যময়, উজ্জ্বল ফোয়ারা। (মিল ও ছন্দ)

মনীষা ও চৈতন্যকে অথচ এক সময় বুদ্ধদেব সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন, ভেবেছিলেন বুদ্ধিমনীষার কোনো ভূমিকা নেই সৃষ্টিকর্মের ব্যাপারে। 'সমর সেন স্মরণীয়েষু' কবিতায় তাকেই তিনি কবিতা বলেছিলেন যা 'স্তব্ধতার নীলিমায় আত্মজাত পূর্ণতার বাণী' এবং প্রার্থনা করেছিলেন —

আমারে ফিরায় নাও অজ্ঞতার মত্ততায়, নীল,
নীল স্তব্ধতার অন্ধকারে, যেখানে বিশ্বের দায়
জ্বালায় ধ্যানের শিখা।—দাও এই বুদ্ধিরে বিদায়
কৈলাসেরে লক্ষ্য করে যে দাম্ভিক ছোঁড়ে শুধু ঢিল।

যিনি 'অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময়—সেই বিশাল ও স্বতোবিরোধময়' উৎস থেকে কবিতার জাগরণ জেনে বিস্মিত ছিলেন, তিনি বোদলেয়ারের কাব্যাদর্শে প্রভাবিত হয়ে জানলেন, বোদলেয়ারের অনুবাদের ভূমিকায় জানিয়েছেন,

'বোদলেয়ারের কাছে তাই শুধু শ্রদ্ধেয়, যা রচিত, চৈতন্যের দ্বারা শোধিত, চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা প্রাপণীয়।'

তাই অনুপ্রেরণায় বদ্ধমূল বিশ্বাসী হয়েও এই রূপকারী বিবেক শোধনের সাধনায় অক্লান্ত। ইয়েটসের 'Adam's Curse'-এর প্রতিধ্বনি ক'রে তাই বুদ্ধদেব 'কবি-জীবনী'-তে লিখেছেন, 'অক্লান্ত এই ছন্দের বুনোন, আনন্দিত/পরিশ্রম, কথার, কঠিন কারুকলা।' এবং আমার জীবন এই। / ইচ্ছে নেই, অনিচ্ছাও নেই এতে, আছে আবশ্যিক/অঙ্গীকার, মৃত্তিকায় প্রতিশ্রুত যেমন কৃষক।' এখানে কৃষিজীবীর উপমা, 'স্বাগতবিদায়' গ্রন্থের 'মাছধরা' কবিতায় একই কথা সাকার হয়েছে মৎস্যজীবীর উপমায়—

> সে করে মাছের চাষ। আছে এক নিজস্ব পুকুর।
> এই তার জীবিকা, বিনোদ, প্রেম, দৈনিক জোয়াল।
> ছিপ ফেলে বসে থাকে উদয়াস্ত, যেন উপস্থিত, সুদূর।…
> হঠাৎ কখনো রৌদ্র দীর্ণ করে গহন আঁধার,
> মুহূর্ত মিলিয়ে যায় অপ্সরার উজ্জ্বল উদ্ভাসে :
> কিংবা দেয় হাওয়া, জল উল্টে যায় অবোধ উচ্ছ্বাসে,
> মুহূর্তে বিলিয়ে যায় কম্পমান অঙ্গসমাচার।
> মাছ ? নাকি জলন্ত জলের শাঠ্য ? স্বপ্নের ছলনা ?
> কিন্তু ফের কাঁপে জল, রূপ নেয় বিশ্বাস্য বাস্তবে :
> ঐ তো সপ্রাণ রশ্মি, মূর্তিমতী সম্মত বাসনা
> ভেসে উঠে ডুবে যায়। তাকে আবো দক্ষ হতে হবে।

তাই কবির জীবন এক অনবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ; চিন্তার সঙ্গে ভাবার, ভাষার সঙ্গে ছন্দের, ছন্দের সঙ্গে অর্থের, অর্থের সঙ্গে আভাসের। এবং এই যুদ্ধে এক জয়, অন্য জয়কে নিশ্চিত করে না। প্রতিবারই নতুন ক'রে সূত্রপাত। যেমন 'শিল্পীর উত্তর' কবিতায় বলেছেন বুদ্ধদেব—'সহজেই লক্ষ্যবেধ করে/না-বুঝে প্রথমবার, তারপর থেকে সহজের/ অসহ্য আত্মীয় জেনে', শুধুই দুরূহ দুর্গমের অনুসন্ধান—'তাই তো আমার/পৌঁছবার তৃপ্তি নেই, আছে নিত্য-আরব্ধ যাত্রার/আবর্তন…।'

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় অনেকবার রূপান্তরের কথা পাই। 'দ্রৌপদীর শাড়ি' বইতে 'রূপান্তর' নামে একটা কবিতাই আছে।

ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা,
বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক চাঁদ হোক নারী,
মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা।
জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে,
চিরন্তনে মুক্তি দাও ক্ষণিকার অম্লান ক্ষমায়
ক্ষণিকেরে করো চিরন্তন।

শিল্পের কাজ এই রূপান্তর ঘটানো—পদার্থ পরিণত হয় চেতনায়, মাংস পরিণত হয় মানসে, বিষ্ঠা রূপান্তরিত হয় প্রোজ্জ্বল ফুলে। এই রূপান্তরের কথা আছে রিলকের অর্ফিউসকে নিবেদিত সনেটগুচ্ছে। বুদ্ধদেব-কৃত তর্জমা থেকে ছুটো নিদর্শন দিচ্ছি। পাঁচ নম্বর সনেটে আছে 'সে-ই হয় রূপান্তরিত/এতে কিংবা ওতে।' উনিশ নম্বরে আছে 'মেঘের মূর্তির মতো জঙ্গম জগৎ/রূপান্তর থেকে রূপান্তরে।'

আমাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার জগৎই রূপান্তরিত হয় কবিতায়। কিছুই ফেল্না নয়, যা কিছু বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন সবই সংগ্রথিত হয়, সুসমঞ্জস আকার পায় প্রতিভার অনবরত অধ্যবসায়ে। রবীন্দ্রনাথের কথা বলি, 'যেমন একটা সুতাকে মাঝখানে লইয়া মিছরির কণাগুলা দানা বাঁধিয়া উঠে তেমনি আমাদের মনের মধ্যেও কোনো-একটা সূত্র অবলম্বন করিতে পারিলেই অনেকগুলা বিচ্ছিন্ন ভাব তাহার চারিদিকে দানা বাঁধিয়া একটা আকৃতি লাভ করিতে চেষ্টা করে' (সাহিত্যসৃষ্টি)। সব বিরোধ একটি তোড়ার সুষমা পায়—'সব ধীরে ফিরে আসে, যুক্ত হয়, জেগে ওঠে, যুগপৎ লাল ফুল, গুপ্ত কীট,/যুগপৎ স্বর্গ ও শ্মশান' (সৃষ্টির মুহূর্ত)। সমস্ত জমা থাকে স্মৃতির ভাণ্ডারে, তার থেকেই ক্রমাগত উন্মীলন—

বাঁচে শুধু যা তোমার হাত
চিরকাল মূর্ছার কন্দরে

রেখে দিয়ে করো উন্মোচন—
রূপান্তর থেকে রূপান্তরে—
পৃথিবীর প্রথম যৌবন। (স্মৃতির প্রতি : ৩)

তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর সমস্তই হয়ে ওঠে কবিতার উপকরণ, সেই সবই প্রেরণার তাড়নায় এবং চৈতন্যের শোধনে রূপান্তরিত হয় কবিতায়। যে-কোনো পদার্থের মধ্যে স্ফুরিত হতে পারে কবিতার স্ফুলিঙ্গ—'চমকে দাও হঠাৎ বাথরুমে ;/ কখনো মাছের ঝোলে মিশে থাকো, সঙ্গে ঝোলো ট্রামের হাতলে' (না-লেখা কবিতার প্রতি : ৩)। 'একদিন : চিরদিন' বইয়ের 'আমার মিনার' কবিতায় সেই কথাই আর এক ভাবে বলা—'কেউ-কেউ বলে, আমার মিনারে আমি একলাই বাসিন্দা। ভুল বলে। এখানে আমার সঙ্গী আছে অনেক সুন্দরী, অনেক পণ্ডিত, অনেক হরিণ আর নর্দমার ইঁদুর, ভিখিরি আর দুর্গন্ধি বেশ্যারা।···আসলে আমার মিনারে কোনো আগল নেই, পাঁচিল নেই, পাহারা নেই।' কবি এক অতিকায় ব্লটিং-কাগজের মতো সমস্ত অভিজ্ঞতাকে শোষণ করে নেন, সঞ্চয় করে রাখেন স্মৃতির ভাণ্ডারে, অবচেতনের অন্তরালে, অনুকূল সময়ের অপেক্ষায়।

কবিতার মধ্যে আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়োজনে তাই 'নিজের মনের অনেক গভীরে নামতে হয় তাঁকে, পৌঁছুতে হয় মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে সেই গহনে, যেখানে পাথর কাদা আবর্জনার স্তূপের ফাঁকে-ফাঁকে স্তরে-স্তরে সঞ্চিত হয়ে আছে তাঁর সার্থক অভিজ্ঞতা, যেন মূল্যবান ধাতুর আদিম রূপ, অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে হাতের স্পর্শে, হাতুড়ির আঘাতে রূপান্তরিত হবার প্রতীক্ষা নিয়ে' (শিল্পীর স্বাধীনতা)। সেই প্রতীক্ষার অপরিমিত ধৈর্য ছিল রিলকের—বস্তু-সমবায়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানকারী দৈবী প্রসাদের জন্য নিজেকে তিনি অতন্দ্র-ভাবে প্রস্তুত রাখতে জানতেন। আর ইতিমধ্যেকার অর্জিত সমস্ত অভিজ্ঞতাকে জানতেন কবিতার উপকরণে পরিণত করতে—আত্মজৈবনিক সমস্ত উপাদানকে। তাই বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে

রিলকেই কবিকুলে আদর্শ—রিলকে, 'যাঁর কাছে তাঁর জীবন ছিলো তাঁর অন্তর্নিহিত অনলের ইন্ধনমাত্র…সব-কিছুর মূল্য যেন শুধু ততটুকুই, যতটুকু তাঁর চুল্লিতে তারা জ্বালানি হতে পারে। যাঁর বিষয়ে আমাদের প্রায় সন্দেহ হয় যে তিনি সাধারণ অর্থে 'বেঁচে থাকতে কখনো চান নি, চেয়েছিলেন শুধু নিজেকে কবিতার একটি বাহন করে তুলতে—এমন এক ধনুর্গুণ, যা লক্ষ্যবেধের জন্য সর্বদা টান হয়ে আছে, সর্বদা প্রস্তুত।' জীবনযাপনকে কবিতার উপাদান হিসেবে ব্যবহারের জন্য জীবনকে বঞ্চিত ও বিমুখ করার যে তপস্যা রিলকে করেছিলেন, তাই বুদ্ধদেবের অভিপ্রেত।

করো শুষ্ক, শুষ্কতর জীবনেরে, অবাধ্য নটীকে
শেখাও কঠিন চলা চৈতন্যের তুহিন স্ফটিকে ;—
তবে যদি সর্বশেষ সর্বস্ব-স্বপ্নেরে দিতে পারি
নিঃশেষে নিঙাড়ি। (মধ্যবয়সের গান)

'বন্দীর বন্দনা'-র 'মানুষ' কবিতায় এই অভিপ্রায়ের পরিষ্কার আভাস আছে—'অস্থিমজ্জারক্ত মোর নির্মম নিষ্পেষভারে বিনিঃশেষে ধ্বংস-ভ্রংশ করি / জন্ম যেন লাভ করে মর্মকোষে কবিতার কুসুম-মঞ্জরী।'

বিশ্বজগৎ থেকে, বিশ্বপ্রকৃতি থেকে রসদ সংগ্রহ করেন কবিরা, কিন্তু বোদলেয়ারের ডাণ্ডিজমের দ্বারা প্রভাবিত বুদ্ধদেব প্রকৃতি-বিরোধী। কবিকে তিনি মনে করেন প্রকৃতির প্রতিপক্ষ। বোদলেয়ার এই বিশ্বাসে তাঁকে বদ্ধমূল করলেও, এই বিশ্বাস তিনি পোষণ করেছেন 'বন্দীর বন্দনা'-র সময় থেকেই—'অনঙ্গের কবি নাকো স্তব। অদেহিনী, প্রাণ-উদ্বোধিনী/আমাদের প্রিয়তমা অগ্নিকল্পা কবিতা-কল্পনা' (কোনো বন্ধুর প্রতি)। আসলে বুদ্ধদেব যাঁদের নাম করেছেন সেই 'বোদলেয়ার ও ডস্টয়েভস্কি, মালার্মে ও র‍্যাঁবো, এডগার পো ও অসকার ওয়াইল্ড'—উনিশ শতকের এই লেখকদের আরো আগে থেকে রোমান্টিক কাব্যের ঐতিহ্যের ভিতরে ভিতরে বয়ে চলেছে এই প্রত্যয়, প্রকৃতি ও শিল্পের বিরুদ্ধ-সম্পর্কের কথা—প্রজন্মীর পর প্রজন্মী

মানুষ কালকবলিত হয়, কিন্তু শিল্প থাকে অব্যয় মাধুরীর আধার। 'বন্দীর বন্দনা'-র অন্যত্র এই কথা আরো জোরালোভাবে জানানো হয়েছে—

স্রষ্টা শুধু এই চাহে, এ বীভৎস ইন্দ্রিয়-মিলন—
নির্বিচারে প্রাণী সৃষ্টি করে থাকে যেমন পশুরা।...
আমি যে রচিবো কাব্য, এ-উদ্দেশ্য ছিলো না স্রষ্টার,
তবু কাব্য রচিলাম, এই গর্ব বিদ্রোহ আমার। (মানুষ)

প্রথম যৌবনে লেখা এই কবিতার কথা বুদ্ধদেব স্মরণ করেছেন 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ' বইয়ের 'আধুনিক কবিতায় প্রকৃতি' প্রবন্ধে; লিখেছেন: 'কবিতা একটি চিন্ময় পদার্থ, তা সৃষ্টি করতে হলে অন্তত কিছুক্ষণের মতো জৈবধর্মকে অস্বীকার করতে হয়, ঘোষণা করতে হয় চিত্তবৃত্তির ক্ষণিক ও বলীয়ান স্বাধীনতা। অতএব কবিতা লেখার কাজটিকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বললে ভুল হয় না।' পরিণত বয়সে এই ভাবের আবির্ভাব পাই নিশ্চিতভাবে 'শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর' সংকলনের অন্তর্গত 'মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে' কবিতায়।

তাঁদের কবিতা প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে, বুদ্ধদেব যে-ঐতিহ্যের অন্তর্গত কবি, তাঁরা কবিতাকে 'প্রকৃতির আরশি' বলে গণ্য করতে রাজী নন। 'যে কথা/কোটি কণ্ঠে প্রকৃতি জপায় নিত্য, তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ছাড়া/আর-কিছু বলার না-থাকে যদি, তবে তো কবির/মুখ না-খোলাই ভালো' (মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে)। মনে হয় প্লেটোর অভিনন্দন পেতেন এই কবিরা, কারণ তাঁর মতে কবিরা অনুকারী, আর অনুকারী বলেই তাঁদের জায়গা সত্যের তিন গুণ দূরত্বে। তাই,

প্রান্তরে কিছুই নেই; জানালায় পর্দা টেনে দে।
ওরা তোকে কেবল ভোলাতে চায়—লাস, মাটি, পুকুর, আকাশ;...
যা তোর নিজের নয়, তা শেখাতে পারে কোন্ মুনি?
বরং তুলে নে ঘাড়ে আদিবাসী সিনবাদের বোঝা,
ক-টি মাত্র মিল খুঁজে সারা দিন গাধার খাটুনি।...
রৌদ্র আর জ্যোৎস্নার তালি-মারা রঙিন খেয়াল

অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে সরে যায় নিখিল পৃথিবী,
কেন না, গতির পারে, তাকে তুই সৃষ্টি করে নিবি।

(আটচল্লিশের শীতের জন্য : ২)

এই ঐতিহ্যের কবিরা মনে করেন বাস্তবিকই কবিদের প্রজাপতি এবং তাঁরা সৃষ্টি করেন এক প্রতিস্পর্ধী দ্বিতীয় ভুবন—দৈবীপ্রেরণার তাড়নায় উদ্বুদ্ধ হয়ে 'অবাধ্য ও উত্তাল প্রকৃতিকে বিরাট চেষ্টায় সংহত করেন একটি আত্মবশ স্বয়ং-সম্পূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে।' প্রকৃতির সব কিছুই যেখানে সময় বা গতির অধীন, সেখানে কবি সময় বা 'গতির পারে' দ্বিতীয় এক বিকল্প বিশ্বকে রচনা করে তোলেন। কবিতা হয়ে ওঠে 'an object-in-itself, a self-contained universe of discourse'। রোম্যান্টিক কাব্যদর্শের এই ভাবনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আব্রাম্‌স দেখিয়েছেন, 'The key event in this development was the replacement of the metaphor of the poem as imitation, a 'mirror of nature', by that of poem as heterocosm, a 'second nature', created by the poet in an act analogous to God's creation of the world.' (*The Mirror and the Lamp*)। সেই কারণেই বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—

'তাই বলি, জগতেরে ছেড়ে দাও, যাক সে যেখানে যাবে।'

এই আত্মবশ স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের কথাই বলেছেন বুদ্ধদেব 'মরত্বসঙ্গীত' কবিতার নিম্নোদ্ধৃত অংশে :

তবু জেনো তুমি যাকে বলো
সুন্দর, তা নেই ব্যাপ্ত বহুরূপী পঞ্চভূতে, নেই
চিত্রল উদ্ভিদে কিংবা সূর্যাস্তের বর্ণ সমারোহে—
আছে শুধু আমারই অহমিকায়।···
কিন্তু আমি তাঁকেও ছাড়িয়ে
সৃষ্টি করি সৌন্দর্য এবং প্রেমে, অহংসর্বস্ব

এক অন্য বিশ্ব গড়ে তুলি, বায়বীয় ধারণার
উপাদানে।

বিশ্বপ্রকৃতি উপকরণের বেশি নয় কিছুতেই, আর সৌন্দর্য রচনা করে কবির প্রতিভা। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাই প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা কবির। স্রষ্টার এই অহমিকার দাবি আরো আগে করেছিলেন বুদ্ধদেব 'দময়ন্তী'র সময়ে, অবশ্য হালকা চালে—'ঘুম না-এলে ল্যাম্পো জ্বেলে বসি লেখার যজ্ঞে ; /বাঁচতে হলে বাঁচি আমার মন-বানানো স্বর্গে' (স্বর্গ-মর্ত্য)। এবং কোথায় সেই মন-বানানো স্বর্গের প্রতিষ্ঠা ? তার প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধদেব জানেন, 'ছন্দোবন্ধনে,/ভাষার গুঞ্জনে' (প্রৌঢ় প্রেম)। 'যুবক বয়সে ভেবেছি, তোমার/কোনো দেহে আছে বাসা,/আজ চল্লিশে এসে দেখি শেষে/সে-বাসা আমারই ভাষা' (পথের শপথ)। সেই ভাষাকেই কবির ভালোবাসা আত্মদান করেছে, কারণ কবি জানেন, তাঁর 'গতির পারে' রচিত বিশ্বের পচনহীন অমরত্ব আছে ভাষাবিন্যাসের অমর ভঙ্গিমার মধ্যে।

জীবন ও শিল্পের মধ্যে এই বিরোধ যে বাস্তবিক আপাতবিরোধ মাত্র তা গ্যেটে অভ্রান্তভাবে ধরেছিলেন ; তিনি বলেছিলেন, মানবাত্মাই সৃষ্টি করে সফল শিল্প-কর্ম, সেই অর্থে প্রকৃতিই শিল্পের রচয়িতা। প্রকৃতিই আমাদের জৈবতার দিকে টানে, আবার প্রকৃতিই পরিচালিত করে কবিকে কাব্যরচনায়। কিন্তু বুদ্ধদেব যে ঐতিহ্যের অন্তর্গত কবি, সেই ঐতিহ্যের কাব্যাদর্শই দাঁড়িয়ে আছে এই দুই ধারণার পরস্পর-বিরোধী দ্বৈরথের উপরে। 'আমরা যাকে আধুনিক সাহিত্য বলি', বুদ্ধদেব লিখেছেন, 'তার একটি মূলসূত্র হলো প্রাণ ও মনের দ্বৈত, প্রকৃতি ও চৈতন্যের বিরুদ্ধতা।' প্রকৃতি ও চৈতন্যের এই বিরোধের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে এই ঐতিহ্যের অন্য কতকগুলো উপলক্ষণ।

কবিতা যেহেতু প্রকৃতি ও চৈতন্যের মল্লযুদ্ধের পরিণাম, সেইজন্য কবিও অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রপীড়িত। শেলিও জানতেন সেই ক্ষান্তিহীন দ্বন্দ্বের কথা—'his heart and mind—both unrelieved/

Wrought in his brain and bosom separate strife.'। কেন না তিনিই সেই ক্ষেত্র যার মধ্যে জড় ও চেতনার এই অবিশ্রাম সংগ্রাম; তিনি জড়ত্বের সমস্ত সীমাবদ্ধতার অংশীদার, আবার তাঁর মধ্যেই জ্বলে চৈতন্যের শিখা। সমাজে তিনি নিঃসঙ্গ, উপেক্ষিত ও নির্বাসিত—তিনি অ-সামাজিক। তাঁর কথাই বলেছেন বোদলেয়ার —'কবি, সে অসুরপন্থী, অর্ধাশনে অমাত্য-প্রবর, / গার্হস্থ্যের চিরশত্রু, বন্ধু তার নরকের তাপ; / কবর, গণিকালয় তার জন্য সাজায় বাসর, / যে-শয্যারে কোনোদিন মলিন করেনি মনস্তাপ' (দুই ভালো বোন)। নির্বাসিত,—কিন্তু আহত অহমিকায় তিনি নিজেকে মনে করেন নির্বাচিত —'বিধাতার নির্বাচিত মোরা'। বোদলেয়ারের আলবাট্রস তাঁর তুলনা— সমাজে 'দাঁড়-ভাঙা, অসহায়, সন্ত্রস্ত', তিনি আসলে 'নীলিমার সম্রাট'।

> …যে-মুহূর্তে বাণীর আত্মারে জেনেছি আপন
> সত্তা বলে, শুদ্ধ মেনেছি কালেরে, মূঢ় প্রবচন
> মরত্বে, যখন মন অনিচ্ছার অবশ্য-বাঁচার
> ভুলেছে ভীষণ ভার, ভুলে গেছে প্রত্যহের ভার। (প্রত্যহের ভার)

অথচ প্রত্যহের ভার শিরোধার্য করে অন্য মানুষের মতো জীবনযাপন করতে মন চায় কবির—চৈতন্যের অনলে জীবনকে ইন্ধন না করে শুধুই জীবনযাপন। খেদ করেন—

> বঞ্চিত শুধু কি আমি?…আমি কবি!…শুধু আমি
> রাজ্যচ্যুত…নির্বাসিত?…অন্ন, শুধু প্রত্যহের অন্ন দিয়ে
> আমার রাজত্ব নিলে কেড়ে? শুধু আমি প্রতি মুহূর্তের
> অস্তিত্বের অস্বস্তির দাস? (অন্য প্রভু)

অথচ এ সবি ছল, এই সব অভিযোগ; আসলে গুপ্ত অহমিকা— 'মোরা কবি', 'হতে হল কবি'। জীবন যদিও 'দুই দিকে ছড়িয়ে রেখেছো কত রঙিন কানন— / বিক্ষেপ, জয়ের নেশা, ত্যাগের চটুল প্রলোভন' (কবি: তার ক্ষমতার প্রতি) তবু সেই দিকে তিনি আকৃষ্ট নন। জীবনকে কবিতার উদ্দেশে উৎসর্গ করতেই তিনি উৎসুক, সেই কথাই লিখেছেন 'গ্যেটের নবম প্রণয়' কবিতায়—

'তোমায় ছেনে হাওয়ায় আমি রচি, / বাজাই এক নতুন অমরতা ; / আমি সে-নাচ, তুমি কেবল নটি।' এই কথাই তো ছিল 'স্বর্গ-মর্ত' কবিতায়—'অমরতার তীব্র রসে মরজীবন ক্ষয় করি ; / বেঁচে থাকায় বিকিয়ে দিয়ে স্বর্গে বাঁচা জয় করি।'

এই শেষ-রোম্যান্টিক ও সিম্বলিস্ট ঐতিহ্যের কবিদের তাই নিশ্চিত বিশ্বাস শিল্পীমাত্রেই অসুস্থ,—সেই অসুস্থতা নিজেকে ক্রমান্বয়ে দ্বিধা বিভক্ত করার, আত্মিক সিজোফ্রেনিয়ার অপ্রতিরোধ্য পরিণাম। কবিতা তাই 'হ্লাদিনী, ব্যাধির বীজ, উন্মাদক, নিঠুর, অসুখী', সে ক্ষণিক লক্ষ্মী-লাভের বিনিময়ে অনন্ত বাসুকির বিষে জর্জরিত করে। আত্মপ্রপীড়িত, দ্বিধাবিভক্ত কবি জীবনকে কবিতার ইন্ধন করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—

> মেটাতে আমার তৃষ্ণা আমাকেই করে সে মন্থন !
> ভালো—কিন্তু বলো দেখি, হতে হবে আর কতোকাল
> একাধারে দ্রাক্ষাপুঞ্জ, বকযন্ত্র, শুঁড়ি ও মাতাল ! (নেশা)

আত্মচৈতন্যের এই দ্বিধাবিভক্ততার কথা গুরু বোদলেয়ারেও আছে,-'আমিই চাকা, দেহ আমারই দলি ! / আঘাত আমি, আর ছুরিকা লাল ! / চপেটাঘাত, আর খিন্ন গাল ! / আমি জল্লাদ, আমিই বলি' (আত্ম-প্রতিহিংসা)। আত্মখণ্ডিত বলেই অগ্নিকুণ্ডের সামনে অবসরগ্রস্ত যে 'দুই মুগ্ধ অন্তর্যামী', তারা অন্য কেউ নয়—'আমি আর মুখোমুখি আমি'। অথচ এই আত্মখণ্ডিত অসুস্থতার মধ্যেই শক্তি। ফিলোক-টেটস নাটকের ব্যাখ্যায় যেমন বলেছিলেন এডমাণ্ড উইলসন। এই বিশ্বাসে বুদ্ধদেবের আস্থা অবিচল, যদিও শিল্পীর আত্মিক অসুখের মধ্যেই তার শিল্পের উৎস, এই রোম্যান্টিক জনপ্রিয় মত ট্রিলিং তাঁর 'Art and Neurosis' প্রবন্ধে অনেক আগেই খণ্ডন করেছেন।

অর্থাৎ বুদ্ধদেবের এই সব কবিতা থেকেই স্পষ্ট যে তিনি কলাকৈবল্য-বাদী ঐতিহ্যের কবি। নিঃসংকোচ অলজ্জায় সেই ইদানীংকালে নিন্দিত ঐতিহ্যকে তিনি শিরোধার্য করেছেন—

আমার ভাবার ছন্দ, আমার ভাষার স্বপ্ন যদি
ঢেউ তোলে কোনো সুদূর আগামী কল্যে,
আমি বেঁচে আছি সেই কলাকৈবল্যে। (প্রৌঢ় প্রেম)

গোতিয়ে বিষয়ে বোদলেয়ার এই কাব্যাদর্শের সার কথা বলেছিলেন, 'সত্য কবিতার লক্ষ্য নয়, কবিতার উদ্দেশ্য কবিতাই···সত্যের সঙ্গে গানের কোনো সম্পর্ক নেই।' এই কথার মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই ঐতিহ্যের কাব্যাদর্শের—বুদ্ধদেবের কাব্যাদর্শের শক্তি এবং দুর্বলতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঠিকই 'বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর-একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে।' কিন্তু সেই জগৎ বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন ওয়াইল্ডের স্বয়ংবশ 'স্বতন্ত্র জগৎ' নয়। রবীন্দ্রনাথ এ কথাও বলেছেন 'সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে', কিন্তু প্রাকৃত জগতের সঙ্গে শিল্পসাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই এ কথা তিনি বলেননি। সাহিত্য আসলে প্রকৃতির দর্পণ না হয়েও জগৎপ্রকৃতির সারসত্যকেই প্রকাশিত করে। কবিতার ভাষার বিন্যাস যুক্তিবাদী গদ্যের মতো না হয়েও এই শিল্পিত ভাষারূপ মানব অদৃষ্টের মুখোমুখি ও সত্যের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়। সত্যের সঙ্গে শিল্পের এই যে সহযোগ রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে শক্তি জুগিয়েছে, সেই সত্যের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক বিষয়ে বোঝাপড়া এখনো বুদ্ধদেব করেন নি। কবির ব্যক্তিগত বিশ্বাস আর কবিতার সত্য আলাদা, এই কথা সতর্কভাবে মনে রেখেও কিন্তু বলা যায় সত্য-শিল্পের এই বোঝাপড়া বিনা প্রতিভার নির্মাণও উপলব্ধি দেয় না ; পর্যবসিত হয়ে যেতে পারে মহৎ খেলায়, সুপ্রসাধিত প্রমোদে।

অথচ কবিতা যতদিন মানুষের ব্যবহার্য ভাষায় অর্থময় শব্দাবলি দিয়ে লেখা হচ্ছে ততদিন শুদ্ধতার সন্ন্যাসে বা আভিজাত্যের অহমিকায় কবিতা কীভাবে সত্যোপলব্ধিকে ভাষার অমর বিন্যাসে স্থায়িত্ব দেবার দায়িত্ব এড়াবে! অন্তত কবিতার পক্ষে, ভাষাশিল্পের পক্ষে, সংগীতের বা 'নিরঞ্জন গণিতের' শুদ্ধতা অর্জন সম্ভব নয়। আছে কবিব্যক্তিত্বের

সমস্যা। যিনি যাতনা সয়ে যান, আর যিনি সৃষ্টি করেন তিনি একই মানুষ—দুই সত্তার মধ্যে দেয়াল তোলা যায় না। কাব্য থেকে ব্যক্তিত্বের বিনাশের কথা তো রোম্যান্টিক কবিতার ব্যক্তি-আবেগের অপ্রস্তুতকারী প্রকাশের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ামাত্র—এলিয়টপন্থীর ব্যক্তিত্বের বিনাশ আসলে ব্যক্তিত্ব প্রকাশেরই অন্য ছল। কবির ব্যক্তিত্বকে এড়ানো যায় না আরো এক কারণে,—সামাজিক মানুষ হিসেবে যেমন, তেমনি কবি হিসেবে তিনি একই ভাষার মুখাপেক্ষী। ব্যবহারের চরিত্র আলাদা হলেও ভাষা এক। ঐ সূত্র ধরেই জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যাতায়াতের পথ খুলে যায়। কিন্তু বুদ্ধদেব দ্রাক্ষাপুঞ্জকে বকযন্ত্রে সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত করে বিশুদ্ধ সুরার মতো বিশুদ্ধ শিল্প রচনার প্রস্তাব করেছেন—নিখাদ এবং নিরঞ্জন। অথচ অন্য শিল্পের শিল্পীরাও যতক্ষণ মানুষ ততক্ষণ মানবিক অস্তিত্ব তাঁদের শিল্পসাধনাকে প্রভাবিত করে নিশ্চয়ই। আর কবি তো শুধু মানুষ নন; তাঁর মাধ্যমও ভাষা, যা অর্থময়, যার উপর মানবব্যবহারের দাগ লেগেই থাকে। প্রয়োজনের দৈন্য কবিতার গায়ে লাগানোর কথা নয়—আসলে সৌন্দর্যের আনন্দে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা, যেখানে উত্তীর্ণ হতে গেলে সত্যকে অন্তর্গত করে নিতে হয়। তাই যে কবি শিল্পীর 'উদ্ধত নিঃসঙ্গতা' বজায় রেখে কবিতাকে দিতে চান 'আত্মবশ স্বয়ংসম্পূর্ণ' শুদ্ধতা তাঁর কাব্যাদর্শ খণ্ডিত হতে বাধ্য। রোম্যান্টিক অ্যাগনি-র বৃত্তে আত্মস্থ এই কবির অবিচল নিষ্ঠা ও অবিরল পরীক্ষা আমাদের মুগ্ধ করলেও তাই আমাদের অতৃপ্ত করে। অন্তত শেষ কবিতা লেখার আগে এই সমর্পিতপ্রাণ কবি সত্য ও শিল্পকে তাঁর কবিতায় মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে একটা বোঝাপড়া কি করবেন না?

বিষ্ণু দে-র অন্বেষণ : 'ঘর খুঁজে ফেরে সত্তা'

কবিজীবনের প্রথম স্তরে বিষ্ণু দে নিঃসম্পর্কিতের উদাসীন নির্লিপ্ততা নিয়ে ক্ষয়, নৈরাজ্য আর নিষ্ফলতার মানচিত্র এঁকেছেন। তাঁর যাত্রা শুরু বিশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষে, যখন ভেঙে পড়ছিল মধ্যবিত্তের সভ্যতা, সমাজপরিবেশের শূন্যগর্ভতা হয়ে যাচ্ছিল প্রকট। বুর্জোয়া বিকাশের অন্তিম পর্যায় কলোনিতে নিয়েছিল অসুস্থ চেহারা, তাছাড়া ইংরেজি শিক্ষা আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে দেশজ ঐতিহ্য থেকে। 'লোকশিল্প ও বাবুসমাজ' প্রবন্ধে ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিষ্ণু দে লিখেছেন— 'বিদেশী শাসন-শোষণের শহিদ, বিদেশীর অস্বাভাবিক প্রভাবে তাঁদের চৈতন্যে এসেছিল আত্মবিচ্ছেদ, নিজবাসভূমে পরবাস।' উনিশ শতকী ইঙ্গ-জাগরণের বিভ্রান্তির মর্মান্তিক দায়ের বোঝা বয়ে চলতে হচ্ছে তাদের যযাতির জরার বোঝার মতো। 'কোনো বিচিত্রবীর্য কি / পূর্বজ কোনো দশরথ / রাজযক্ষ্মার ক্ষয়ভার, জায়ুজ ব্রণের ক্ষয়পথ / দায়ভাগে নির্লজ্জ কি / রেখে গেছে পিছে উপহার' (অপস্মার)। ফলে যে ত্রিশঙ্কু অবস্থা, যে অনিকেত মানসিকতা তাই প্রকাশ পেয়েছে এই সময়ের কবিতায়। এক আত্মকেন্দ্রিক কবি—'এ বিশ্ব আমারই মূর্তি, —দীর্ঘ ছায়া আমার মনের'—চারিদিকে তাঁর বন্ধ্যা আর নিষ্ফলা ভূমি। সব কিছুই সেখানে বিবর্ণ, জরাগ্রস্ত, পাণ্ডুর বা মৃত। বাইরের নেতি অন্তরের নির্বেদ জাগায়, অন্তরের বিষাদ চরাচরে ছড়িয়ে পড়ে। নিজেকে মনে হয় আউটসাইডার—

> মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক,
> মুখোমুখি কথা বলি—চোখে লাগে অটল প্রাচীর।

বিদেশী পথিক আমি এসেছি কি বিধাতার ভুলে
পৃথিবীর সভাগৃহে, বুঝি নাকো ভাষা যে এদের।

(সোঽবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি)

সিমূমরুক্ষ এই ক্ষেত্রে জন্মায় ফণিমনসা, 'নীলোৎপল হয়েছে আজ কাঠগোলাপ'। অনুভূতি-প্রবণ মানুষের মনে জাগে বিবিক্তি আর নির্বেদ। ক্লান্ত হতাশ্বাস দিনগুলো 'হেমন্তের কুষ্ঠরোগে গতপত্র অরণ্যের মতো'। 'নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি অপলক ! / দুপাশে ঘনায় ক্লান্তির মেঘাবেশ'---এই রকম মানসিকতায় শহুরে প্রেমের মন-দেওয়া-নেওয়ায় 'বেজায় ক্লান্ত, শ্রান্ত লাগে !···ক্লান্ত লাগে।'

জাতীয় জীবনের বিকাশের সঙ্গে তাল না রেখে, অপ্রকৃতিস্থভাবে, কলোনির অর্থনৈতিক শোষণের প্রয়োজনে যে শহর গড়ে উঠেছিল গ্রাম-জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে, সেই শহরই—নির্মম পাথুরে প্রাণহীন--বিষ্ণু দে-র 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ও 'চোরাবালি'র পটভূমি। প্রকৃতির সানন্দ ও জায়মান জীবনের সঙ্গে কোনো যোগ নেই বিচ্ছিন্ন মানুষের, 'প্রকৃতির দুয়োয়ারে এসে পড়ি বিদেশী বর্বর'। আর নাগরিক লোকজন, স্বেদাক্ত ভিড় সম্বন্ধে এক প্রগাঢ় জুগুপ্সা—'পৃথিবীর জনতার গ্লানি' অসহ্য লাগে। ঘৃণ্য মনে হয় কোলাহল-কুৎসিত নগরের ভিড়ে জনতার দুষ্টশ্বাস---'বড়বাজারের উপল উপকূলে / জনগণের প্রবলস্রোত / উগারিছে ফেনা--বিড়ি সিগারেট, উনুনের মিলের ধোঁয়া, পানের পিক, দীর্ঘশ্বাসের জঘন্য সংসর্গে ক্লেদাক্ত হয়ে প্রার্থনা করেন 'মৈনাক ডুবিয়ে দিক পৃথিবীর জনতাকে আজ।' সব মিলিয়ে পরিবেশকে মনে হয় নিতান্ত নারকীয়—'রন্ধ্রহীন আর্তনাদে এ আঁধার হেডিসের মতো / হৃদয় ধরেছে চেপে'। হাওড়ার ব্রিজে জনস্রোতের গড্ডলপ্রবাহ দেখে বিষ্ণু দে-ও এলিয়টের মতো দান্তের নরকবর্ণনার প্রতিধ্বনি করেন—'জানি নি আগে, ভাবি নি কখনো / এত লোক জীবনের বলি, / মানি নি আগে / জীবিকার পথে পথে এত লোক,

এত লোককে গোপনসঞ্চারী / জীবন যে পথে বসিয়েছে জানি নি মানি নি আগে…' (টপ্পাঠুংরি)। এই নারকীয় পরিবেশে, 'উর্বশী ও আর্টেমিস' আর 'চোরাবালি' পড়লে দেখা যাবে, বারবার একাকিত্ব আর নিঃসঙ্গতার কথা এসেছে। কিন্তু এই নিঃসঙ্গতায় কোনো ব্যক্তিগত বিলাপের ভাবালুতা বা আত্মকরুণা নেই। প্রথম থেকেই বিষ্ণু দে প্রমাণ করলেন তিনি ক্ষমতাবান কবি, ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতাকে নৈর্ব্যক্তিক একাকিত্বে রূপান্তরিত করে। যে বুদ্ধিজীবীদের কথা তিনি পরে বলেছিলেন 'মার্কস ও বাংলাদেশে সাহিত্য' প্রবন্ধে 'তারা মধ্য আকাশের বাসিন্দা, মাতৃভূমি থেকে সম্পর্কচ্যুত এবং মৌলিক-ভাবে ইংরেজ শাসকশ্রেণী থেকেও বিচ্ছিন্ন'—সেই বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্নতা, সর্বসাধারণের সঙ্গে সংলগ্ন হওয়ার অনীহা, তাদের নির্বেদ ও নির্বেদের গ্লানি, সবই বিম্বিত হয়েছে ব্যক্তিগত একাকিত্বের আয়নায়।

এই নারকীয় জগতের নেতিকে দেখার ভঙ্গিটাও নঙর্থক। বিশেষত 'চোরাবালি'-তে ব্যবহার করেছেন কবি ব্যঙ্গপ্রখর নেতির ভাষা—নাগরিক চপলতার তীক্ষ্ণাগ্রে ক্ষতবিক্ষত হয় পুরনো বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ। 'তোমার ও কটা চোখ—যদিচ বাঙালী, / বুধবার থেকে কেন মনে পড়ে খালি ! /লোকে যাকে প্রেম বলে—সেকি তুমি মানো' ? (গার্হস্থ্যাশ্রম)। যৌবনের স্বাভাবিক আবেগে কদাচিৎ যদি আপ্লুত হন—

> তোমার কথার পাখা নিল প্রিয়া আমাকে আকাশে,
> নক্ষত্র-কম্পিত লোকে আনন্দের লঘিষ্ঠ হাওয়ায়।
> নিয়ে গেল আন্দোলিত রজনীগন্ধার শুভ্রবনে,
> অন্ধকারে চোখে চোখে নির্ভরের মাধুরী ঘনায়। (গার্হস্থ্যাশ্রম)

কিন্তু সে উন্মাদনা বেশিক্ষণের নয়। কারণ এখন যুবক প্রেমিক নয়, প্রেম-তত্ত্বের ছাত্র ; বিহঙ্গের মুক্ত হর্ষ তার জন্যে নয়, তার 'শুধু কুন্ঠিত বিচার'। আর সেই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রমাণ হয়ে যায় প্রেম আসলে কন্‌ডিশন্‌ড্

রিফ্লেক্স—'অভ্যাস, শুধু অভ্যাস'; ভালোবাসা ব্যাপারটা আসলে প্রাকৃতিক। ভিড় পছন্দ নয়, আবার ভিড় এড়িয়ে নীড়বাঁধার ইচ্ছেও পরিহাসের সামগ্রী—'শহরের বুকে পাঁচতলায় / নেব সখী এক ছোট্ট ফ্ল্যাট / ট্রাম বাস ভিড় নিত্য যায়—/ উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে দোঁহায় / ভিড়েতে থেকেও কী নিরালায়!' ভিতর ফাঁপা হয়ে গেছে, দুঃখ আনন্দ প্রেম কোনো কিছুই গভীরভাবে বিচলিত করে না। তাই আবার দান্তের নরক স্মরণ করেন কবি—'ফ্রানচেসকার আর্তনাদ—বিধাতাকে ধন্যবাদ! আজকাল হয়ে গেছে বাসি।'

রবীন্দ্রনাথের মতো সদর্থকতার বড় প্রতিনিধি তো হয় না। নেতির দেশকালকে অবয়ব দিতে গিয়ে বিষ্ণু দে-এই সময় যা কিছু সদর্থক তাকেই ব্যঙ্গের ধারালো অস্ত্রে আঘাত করছিলেন। করছিলেন বলেই, রবীন্দ্রকবিতার অংশগুলোর এমন বিকৃত ব্যঙ্গাত্মক ব্যবহার, 'সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর'-কে তখন এমন আক্রমণ। বিষণ্ন পরিবেশের বর্ণনায় লাবণ্যময় রবীন্দ্রপদাবলী পরিবেশের বিষাদকেই গাঢ় করেছে। (১) 'ধোঁয়ার মলিন এই শব্দখর কুৎসিত নগরে /তন্দ্রালসা সন্ধ্যা নামে···' (উর্বশী ও আর্টেমিস); (২) 'হে মোনালিসা, শুধু হাসো তুমি মধুরহাসিনী অপরিচিতা,/যখনই শুধাই, ওগো বিদেশিনী, হে মোনালিসা, দিনের চিতা/ক্লান্ত ঘরের নীরবতা দেখ তোমাকে ডাকে' (কবিকিশোর); (৩) 'গরবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘর, / কাঁদিয়া কেহ চেয়েছে ফিরে ফিরে।/কেহ বা কারে কহেনি কোনো কথা,/ কেহ বা জিন্ খায় নি ধীরে ধীরে' (কবিকিশোর); (৪) 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসি/বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ!/মরমিয়া সুগন্ধ তার বাতাসে উঠে প্রশ্বাসি,/সুরেশ শুধু খায় দেখি গ্লুকোজ!' (শিখণ্ডীর গান); (৫) 'পাঁচ মিনিট, পাঁচ মিনিট মোটে।/কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও/উদ্দাম উধাও/ট্রেন এলো বলে হাওড়ায়' (টপ্পা ঠুংরি)।

কেউ কেউ বলেছেন, অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকে একসূত্রে গাঁথার অভিপ্রায়ে বিষ্ণু দে স্বদেশীবিদেশী এত পুরাণপ্রসঙ্গ আনেন। হতে

পারে তাঁর অভিপ্রায় তাই ছিল। কিন্তু যে কবি উত্তরকালে কম্যুনিকেশনের সমস্যা নিয়ে ভাবিত, তাঁর প্রথম দিককার কবিতায়, অন্তত বিদেশী পুরাণ ও প্রসঙ্গের উল্লেখ—ড্যানায় নেয়াড ডায়ানা স্যার্সি হিপোলিটস প্রসার্পিনা ডিয়োটিমা সাইনারা অরফিউস ব্রুনহিল্‌ড্‌ সীগফ্রীড পিদসিকাতো ইত্যাদি—ত্রিকালকে একসূত্রে গাঁথেনি, বরং সেই সব সচরাচর-অজানা প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্নতার ভাবনাকেই পুষ্ট করেছে। 'ক্রেসিডা', বা 'ওফেলিয়া' কবিতার বিরুদ্ধে যে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ওঠে, বুদ্ধদেব বসুর মতো পাঠকও যেখানে স্বস্তিবোধ না করে লেখেন 'এ-দুটি কবিতায় কেন যে এক স্তবকের পর আর-এক স্তবক আসছে, সেটা আমার কাছে সব সময় স্পষ্ট নয়'—সেই দুর্বোধ্যতাও একদিকে বিচ্ছিন্নতাবোধের পরিণাম, অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাবোধকেই যেন সাকার করে তোলে।

উজ্জীবনের ইশারা ছিল 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার গতিতীব্র অশ্বক্ষুরধ্বনির মধ্যে—'হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,/আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর।/ কোথায় পুরুষকার? / অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?' আর 'মহাশ্বেতা' কবিতায় 'ভাস্বর তব তনুতে অমৃত জ্যোতি, / প্রাণসূর্যের একান্ত সংহতি। /ক্লান্তিবলয়ে শিহরায় ক্রন্দসী।/ উত্তর করে মুদ্রিত বরাভয়, / তামসীরে করো খণ্ডন, করো জয়।' সময়ের দিক থেকেও এই দুটো কবিতা বিষ্ণু দে-র প্রথম পর্যায়ের একেবারে শেষ প্রান্তে লেখা, ১৯৩৫ সালে। বেশ বোঝা যায়, একটা পালাবদলের সময় এসে গেছে।

'আজও চেনা হল না নিজেকে' এই বাক্যাংশ 'সংবাদ মূলত কাব্যে'র অন্তর্গত হলেও নিজেকে সনাক্ত করার কাজ শুরু হয়েছিল অনেক আগে। 'পূর্বলেখ' বই থেকে শুরু, যে-বই তিনি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন, আর এই বই থেকেই বিষ্ণু দে-র পুরগাতোরিও শুরু। রবীন্দ্রনাথ তো আগের পর্বেও ছিলেন—সেখানে তিনি ছিলেন ব্যঙ্গের

বিষয়, সেই তমসায় বদ্ধমূল পরিবেশে যেহেতু তিনি বেমানান। নতুন পর্বে বিষ্ণু দে-র যাত্রা রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। ভার্জিলকে দান্তে বলেছিলেন 'কবিসমূহের গৌরব ও আলো', বলেছিলেন তাঁর মহাগ্রন্থ সানুরাগ মনোযোগে তিনি যেন অধ্যয়ন করতে পারেন; ভার্জিলকে সম্বোধন করেছিলেন 'গুরু এবং স্রষ্টা' বলে। ভার্জিলের মহাকাব্য ঈনিডকে তিনি অন্যত্র বলেছেন মাতৃসমা, তাঁর কবিতার ধাত্রী। পুরগাতোরিও-তে গুরু অনুগামীর অশ্রুসিক্ত মুখ শিশিরজলে ধুয়ে শুচি করে দিয়েছিলেন। বিষ্ণু দে-র অনুসন্ধানে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সেই ভার্জিলের। উত্তরণের পথিক বিষ্ণু দে বুঝেছিলেন 'বিদেশী গুরুর ভাবধারা প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াপন্থা যাই হোক না কেন, তাকে অনুসরণ করে বেশিদূর যাওয়া অসম্ভব।' তাই এলিয়ট ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ, 'বৈশ্বিক মানবতা ও দূরবিস্তৃত প্রতিভায় সমন্বিত সেই বিরাট মানুষটি'—তাঁকেই তিনি দায়িত্ব দিলেন নরক থেকে উদ্ধার করে, পুরগাতোরিও-তে পথ দেখানোর। উদ্ধৃতির অন্তর্গত 'সমন্বিত' শব্দটির তাৎপর্য লক্ষ্য করবার। বিষ্ণু দে-র অন্বেষণ বিচ্ছিন্নতা, অসংলগ্নতা থেকে সংলগ্নতার, বিসঙ্গতি থেকে সঙ্গতির, নঙর্থকতা আত্মচ্ছেদ থেকে সদর্থকতা বা সত্তার, আত্মবিরোধ থেকে সমন্বয়ের। দান্তে যেমন পারাদিজোয় বিশ্বের পত্ররাজিকে প্রেমের বাঁধনে একটি মহাগ্রন্থে আবদ্ধ দেখেছিলেন, তেমনি বিষ্ণু দে, অনেক পরে বলেছেন, তাঁর অভীষ্ট, 'দৈনিকে বা সাপ্তাহিকে কোথা উৎকর্ষের গরিমা? / আমি চাই তুমি দাও রচনাবলীর সমগ্রতা...।' (আমরা)। এই সমগ্রতার সন্ধানে বেরিয়েছেন বলেই দরকার হয়েছে 'সমন্বিত সেই বিরাট মানুষটি'-র।

তাই রবীন্দ্রনাথের কথা এত বারেবারে আসে—'তোমার আকাশে দাও, কবি দাও / দীর্ঘ আশি বছরের / আমাদের ক্ষীয়মাণ মানসে ছড়াও/সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো...' (তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ?)। আবার প্রার্থনা 'শতাব্দীর সূর্যে এসো অভীপ্সার তীব্র

মেঘে তুমি'—কারণ তিনিই তো সঙ্গতির শিক্ষা দিয়েছেন ধ্যান ও কর্মের মধ্যে, সৌন্দর্য ও মননের মধ্যে, সমষ্টি ও ব্যক্তির মধ্যে—

> ধ্যান যার সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তে বিধুর যার গান,
> সেই তো বিশ্রামহীন মধ্যাহ্নের কর্মিষ্ঠ রৌদ্রের
> প্রাবল্যে চেয়েছে ফল ফুল আর আউষ আমন,
> যেখানে সবার হতে অধম ও সর্বহারা দীন,
> চেয়েছে যে প্রতিদিন দেশব্যাপী সর্বতোভদ্রের
> সর্বত্র সকলে হোক সচেতন সচ্ছল ও সুখী। (রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথে যেই এল অসংশয়িত আস্থা, অমনি বদলে গেল নিজের কবিতায় রবীন্দ্রচরণাংশ ব্যবহারের চরিত্র। (১) 'কানে কানে শুনি / তিমির দুয়ার খোলো হে জ্যোতির্ময়।' (আবির্ভাব) (২) 'তোমার প্রয়াণে / যৌবনবেদনারসে উচ্ছল তোমার দিনগুলি / রেখে যাবে জীবনের আনন্দের উচ্ছিষ্ট আবেশ / আমার প্রাণের পাত্রে।' (জঙ্গী) (৩) 'তবুও ভরে না চিত্ত, রথযাত্রা লোকারণ্য ঘুরে / মেলায় মেলায় ঈদমুবারকে জনসাধারণে···।' (রথযাত্রা ঈদমুবারকে) (৪) 'এসেছি তোমারই পাশে, নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার / দেখেছি তোমারই চোখে, অমর মহিমা / তাই দেশে দেশে বর্ষে বর্ষে / সময়ের তীর ধুয়ে ধুয়ে / চূর্ণ করে নিজ মর্ত্যসীমা মুহূর্তের সংহত ফাল্গুনে।' (ঐ মহাসমুদ্রের) (৫) 'যেখানে পর্বত ওড়ে আশ্বিনের নিরুদ্দেশ মেঘ / সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের বাঁকা তলোয়ার, / নটীর নূপুরে বাজে নদীর জোয়ার / শিহরায় দেওদারবন।' (তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ)—এই রকম চরণ এখন অনর্গল আসে কবিতার সদর্থক তাৎপর্যের সমর্থনে। আগের মতো নঙর্থক ভাবের মধ্যে সেই সব সদর্থক চরণ আর পারস্পরিক বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে নেতির শূন্যতাকেই আরো মর্মান্তিক করে তোলে না। তাই 'তবু শূন্য শূন্য নয়, ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন'—এই চরণের প্রতিধ্বনি বারবার শেষের দিকে শোনা যায়—যেহেতু চলেছেন শূন্যতা থেকে পূর্ণতার দিকে।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আরো দু-তিনজন সমকালীন মানুষের মধ্যে বিষ্ণু দে দেখেছেন দেশকালের সঙ্গে সংলগ্ন ব্যক্তিত্বের সুষমা। যামিনী রায় যেহেতু জীবনকে গ্রহণ করেছেন 'এক মৌল মানবিকতায়, এক দেশজ অন্তরঙ্গতায়'—তাই সত্তা বা আত্মপরিচয়ের অন্বেষণে বিষ্ণু দে তাঁর শিল্পজীবনের সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নেন। 'সাবেক, দেশী বাংলার মনের / ঐতিহ্যের ছবি' যামিনী রায় এঁকেছেন, আর বাঙালী আর ভারতবর্ষীয়ের উত্তরাধিকার খুঁজতে ব্যস্ত এই কবি—সহধর্মী বলেই দুজনে সহযাত্রী। বিষ্ণু দে-র নন্দনজিজ্ঞাসা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একজন সমালোচক ঠিকই বলেছেন 'বিষ্ণু দে-র কাছে শেষ পর্যন্ত যামিনী রায় তাই প্রতীক হয়ে ওঠেন, রবীন্দ্রনাথেরই মতো।' মনীষার পৌরাণিক চরিত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসুও সেই প্রতীকী প্রয়োজনে আসেন, কারণ 'মননের চূড়ান্ত শক্তিতে সংহত এক পরিপূর্ণ মানবিকতার চারিত্র্যে এক অর্গানিক সংলগ্নতায়' তিনি সদাজাগ্রত, কারণ তাঁর মধ্যে বিরাজমান আত্মভোলা নির্বিকার সাত্ত্বিক প্রসাদ—'সকল বিষয় আর সর্বজীবে নির্বিশেষ সন্ন্যস্ত সপ্রীতি, / প্রথম বাঙালী এই বিশ্বমানবের বক্ষে কেউ নয় ব্রাত্য'। একই কারণে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের প্রশস্তি বা মার্কস ও লেনিনের বন্দনা। মার্কস—যেহেতু তিনি শুধু বিচ্ছিন্নতাবোধের রোগবিশ্লেষণ বা রোগের কারণ নির্ণয় করেন নি, সঙ্গে সঙ্গে 'স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই সমাজকে, যেখানে জীবনকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট কোনও কর্মক্ষেত্রে জীবিকায় বন্দী থাকতে হবে না কিন্তু প্রত্যেকেই মুক্তভাবে প্রতি কর্মক্ষেত্রে নৈপুণ্য-সম্ভোগ করতে স্বেচ্ছাধীন।' আর 'প্রাজ্ঞ লেনিন',—কারণ তিনি সেই স্বপ্নকে বাস্তবিক করার কাজে হাত লাগিয়েছিলেন।

এ জীবন বিচ্ছিন্নের সমুদ্রে সমুদ্রে একাকার;
ঢেউগুলি নিরুদ্দেশ নির্বিশেষ, কোথায় সীমানা।
কার কোথা তীর কোথা তল কোথা দ্বীপ নেই জানা—
এলোমেলো সব ছবি মানুষের অসহায়তার। (বহুরূপী)

বিচ্ছিন্নতাপ্রপীড়িত মানুষের এলোমেলো ছন্নছাড়া অসহায়তার কারণ কেন্দ্রচ্যুতি—ভর খুলে গেছে, সংযোগ-সংলগ্নতার সেতুবন্ধ নেই। প্রত্যেকে নিঃসঙ্গ একা।

রবীন্দ্রনাথের গল্প, আশ্চর্য রূপক দিয়ে, এঁকেছেন কবি
আমাদের সকলের জীবনের ছবি,
মর্মভেদী ভীষণ অদ্ভুত
বিবাহের সকলই প্রস্তুত,
এমনকি বরযাত্রী এসে গেছে, শুধু বর নেই—(স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত)

সেই বর, সংলগ্নতার সেই সেতু আছে মানবসমষ্টির সংযোগ-সহযোগিতার মধ্যে, জীবনের মধ্যে মূল গভীরভাবে চালিয়ে দিয়েছে যে সামাজিক মানুষ তার সানন্দ প্রাণময় সত্তার মধ্যে। তাই 'ঘর খুঁজে ফেরে সত্তা আত্মপরিচয় / মাঠে গঞ্জে শহরে বন্দরে খোঁজে সে আপন সত্তা, সনাক্তিকরণ / দশের দর্শনে ...' জীবনের প্রয়োজনে যেমন চাই দশের দর্শন, তেমনি শিল্পের প্রয়োজনে, কবিতার প্রয়োজনে ; কেননা জীবনের উৎসমুখেই শিল্পের উচ্ছ্বসিত আবির্ভাব। সেই কারণে 'কবিতা চকমকি নয়, জ্বলে না চমকে, / কবিতা অঙ্গার, জ্বলে আমাদের মনের হাওয়ায় / দেশের ও দশের হাওয়ায় ...' (মন যেন নিভন্ত অঙ্গার)। তাই প্রথম পর্যায়ে জনস্রোত যাঁর মনে জাগিয়েছে জুগুপ্সা, তিনি উত্তরপর্যায়ে জনসংযোগের দাক্ষিণ্য চেয়েছেন আপন উত্তরাধিকার ও সত্তার অন্বেষণে। এখন 'আমারও অন্বিষ্ট তাই / অণুর সংহতি', আর সংহতির শক্তি জানেন বলেই এখন 'খণ্ডিত অণুতে পাই সমগ্রের সচল মহিমা সমুদ্রের ঢেউ'। এই উপলব্ধির সার যুক্তির ভাষায় লিখে রাখেন 'ব্যক্তির কৈবল্যে সখা, বাহুল্য ব্যক্তিও, / জনসমষ্টিতে জীবৎ তোমার ব্যষ্টিও।' অথবা 'বিকল্পবিরূপ/ সর্বচ্যুত ব্যক্তিত্বের চর্চা বৃথা, সর্বদা, সর্বথা।' জাগ্রত জনস্রোত নবসম্ভাবনায় উদ্দীপিত করে, পায় কবির উত্তেজিত সমর্থন—

লুব্ধ যাযাবর। নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,
দ্বারকার অঙ্গনে অঙ্গনে

তারা চায় রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী,
চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দীঘি ও খামার
চায় সোনাজ্বলা খনি। চায় স্থিতি, অবসর। (পদধ্বনি)

মার্কসবাদে দীক্ষিত হবার পর শ্রেণীসমাজের বিশ্বব্যাপী ভূমিকা বিষয়ে কবি সচেতন হয়েছেন, আর তখন থেকেই তিনি বেশি করে আস্থাশীল হয়েছেন মানুষের উপরে। কিন্তু এই মানুষ শহরের আত্মবিচ্ছেদ-পীড়িত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ নয়, কেন না, 'মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, শিক্ষিতও অথচ মানুষই নয়।' কাদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত তা দুটো উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায়—(১) 'মহুয়ানির্ভর আর মেঘজীবী এ দেশের স্মৃতি, / শুধু ছিন্ন গ্রন্থি আজ, ভেদ তাই দপ্তরে প্রান্তরে; কৃষাণ-কৃষাণী ওরা, আর এরা ভব্য চাকুরিয়া।' (এরা ও ওরা) (২) 'ও যবে বক্তৃতা করে আধিগ্রস্ত কবন্ধ কৌশলে, / নীলাকাশে মুক্ত এর হাত চলে লাঙলে চাকায়' (এ আর ও)। এই এরা এবং ওরার মধ্যে তাদের উপরেই বিষ্ণু দে-র নির্ভর বেশি, যারা শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষ।

আমরা ভেনেছি ধান, আমরা ভেঙেছি গম
জোয়ার বাজরা আর শস্য অড়হর
আমরা তুলেছি পাট আমরা বুনেছি শাড়ি গড়েছি পাথর
আমরাই ধরি হাল
আমরাই করি গান···। (১৪ই আগস্টে)

সত্তার সন্ধান, বিকল্পে বিবাহসভার অনুপস্থিত বরবধূর খোঁজও মিলবে এই কর্মজীবী গ্রামের মানুষের মধ্যে।

বাসায় ভিটায় কত কত রাজভবনে ভবনে
কত ভোজ উৎসবের শামিয়ানা দেখে দেখে শেষে
আজ মনে হয় এই আমাদের শ্মশান স্বদেশে
বাসর নরক হলো একাকার। ভাবি মনে মনে
এ যেন বিরাট এক বিবাহ-সভার আড়ম্বর—

শুধু নেই বধূ, নেই, সে গিয়েছে আউষের বিলে,
বর নেই, বর কোথা জগদ্দলে মুনিষ মিছিলে—…।

(রথযাত্রা ঈদমুবারকে)

আর একটা পরিবর্তন দেখার মতো। এখন কবি জনস্রোতের অসম্পৃক্ত নির্লিপ্ত দর্শক নন, মানুষেরা এখন 'তারা' নয়। 'তুমি'-ও থাকে না বেশি দিন—'কাস্তে লাঙলে হাতুড়ি হাপরে তোমরা গড়েছ হাল / জীবনের বীজ তোমরা ছড়াও মৃত্যুঞ্জয় হাতে…।' সাযুজ্যের সন্ধানী এখন মানুষের দলের একজন, তাই মানুষের কথা বলতে গেলেই এখন ব্যবহৃত হয় উত্তম পুরুষের একবচন বা বহুবচন। (১) 'আমরা জনতা, জনসাধারণ, সাধারণ লোক / চাষী ও মজুর কবি শিল্পী স্রষ্টা / রাত্রি আজ করে দিই দিন তুড়ি দিয়ে শনিকে রাহুকে…।' (১৪ই আগস্টে) (২) 'আমি তো গাঁয়ের লোক / দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধ খুঁজি প্রায় প্রতি বছরেই…।' (আমি তো গাঁয়ের লোক…)

সহজের খোঁজে গ্রামের কর্মী মানুষের দাক্ষিণ্য শুধু চান না, যার কৃপায় তারা সহজ ও নিটোল, সেই প্রকৃতির সংসর্গও কামনা করেন কবি—'আমরা সরল তাই সরল জীবন চাই সচ্ছল সভ্যতা চাই / ঘরে ঘরে, ঘরে ও বাহিরে চাই ঘনিষ্ঠের আত্মহারা / যোগাযোগ মানুষে মানুষে আর প্রকৃতি মানুষে…' (লুসিয়া, প্রকৃতি, আমরা)। কারণ সত্তা শুধু মানুষের সংসর্গে, দশের দর্শনে নয়, 'সত্তা যার নিহিত মাটিতে রৌদ্রজলে শিকড়ে শাখায়।' কবিশিল্পীর সরল অথচ কঠিনের দাবি পূরণ হয় না শুধু দেশে ও সমাজে সমব্যথায়, সততা বিনয় বা প্রেমে, চাই শুধু 'জীবে প্রেম' নয়, সঙ্গে সঙ্গে 'প্রকৃতির প্রেম'—'তবে না বইবে হাওয়া, মনের অঙ্গার / জ্বলবে হীরার মতো'। তাই ফিরতে হয় আদিম মাতার কাছে, প্রাণের উৎসের কাছে। শহুরে মানুষের হপ্তা-শেষের শখের বেড়াতে যাওয়া নয়, এ যাওয়া অস্তিত্বের অর্থ খোঁজার তাগিদে।

শহুরের মন যায় থেকে থেকে ছোট সেই গ্রামে,
থেকে থেকে মনে আসে রূপ-রস-গন্ধে বসুন্ধরা,
মনে পড়ে সেই মাঠ, তালদীঘি, টিলা সার সার
যেখানে আকাশ মেলে সূর্যাস্তের আশ্চর্য পশরা···।

(এ বিচ্ছিন্ন নয়নাভিরামে)

মানুষ প্রকৃতি মিলে যে সরল জীবন তার সানন্দ সতেজ সংস্পর্শেই দুরারোগ্য সত্তার ব্যারামের উপশম হতে পারে; ওষুধ বিষুধ বৃথা, এ রোগের অন্য চিকিৎসা নেই—

এ রোগের বিধান আকাশে,
পৃথিবীতে, বনস্পতি, ওষধিতে, ক্ষেত মাঠ ঘাসে,
পাহাড়ে, নদীতে, বাঁধে, গোচরের অনন্ত প্রান্তরে,
প্রকৃতিতে হৃদয়ের সুস্থ স্বচ্ছ স্বপ্নে রূপান্তরে;
চিকিৎসা লোকের ভিড়ে, বস্তির কুঁড়ের জনতায়—
জনতা বা প্রকৃতিতে, একই কথা, অন্যোন্য সত্তায়। (ব্লডপ্রেসর্)

তাই বিষ্ণু দে লিখেছেন 'প্রকৃতিতে গড়ি সমাজের বরাভয়।' সেই বরাভয় কখনো দেখেন 'চৈত্রের আকাশে এক পরাক্রান্ত জীবন কৌশলে বিজয়ী' পলাশের অথবা উপরে অগণন হরিয়াল নিয়ে 'ছায়াকম্প্র শান্তির আশ্রয় প্রকাণ্ড' পিপুলে। ভিতরের তাগিদে কবি তাই বাসা বাঁধেন সাঁওতাল পরগণার রিখিয়ায়। এ শুধু বাসা বাঁধা নয়, নিজবাসভূমে পরবাসীর স্বভূমি, আপন নিকেতনের অন্বেষণে। দেখেন হিরনাব টিলা, বাবুডির আঁকাবাঁকা লালপথ—যার বর্ণময় সৌন্দর্য হার মানায় পিসারো বা উত্রিল্লোকে, আর সেই নিসর্গের পটে দেখেন 'পিকাসোর পেশীসচ্ছল সাঁওতাল' যুবাকে। 'মেদুর তন্বী টিলাগুলি নীলে মেলে অগম্য হিয়া/বিলায় হৃদয় দূর ত্রিকূটের সংহত সম্মানে/ত্রিকালের মত কঠিন ত্রিকূটে চেয়ে থাকে দিঘারিয়া' (স্কেচ/'সন্দীপের চর') জটিলতামুক্ত সপ্রাণ জীবনাসক্তিতে বিষ্ণু দে-র কবিতায় বারবার আসে সাঁওতাল পরগণার নানা স্থানচিত্র—তিনপাহাড় ননিহাট মহুয়াগড়ি হর্লাজুড়ি বারমাসিয়া।

নিসর্গসবুজের মধ্যে যে উজ্জীবনের ইশারা, তারই নির্যাস জলের মধ্যে। বন্ধ্যা পাথরের মধ্যে সজল উর্বরতা, গ্রীষ্মের দাবদাহের পর বর্ষায় আর্দ্রতা, বিচ্ছিন্নতায় ছন্নছাড়া সমাজের মধ্যে জলস্রোতের নিরবচ্ছিন্ন ধারা—তারই মধ্যে আছে প্রাণময়তার আভাস, সঙ্গতি ও সুষমার প্রতীক। বিষ্ণু দে 'জলের আবেগশাস্ত্রে'র কথা বলেছেন, বলেছেন 'জল হল পৃথিবীর আদি মহাদায়'। প্রাণাবেগ জলের মধ্যে পায় বস্তুরূপ, তাই যখন নির্মম গ্রীষ্মের পৈশুন্য সয় না, তখন প্রার্থনা ওঠে—

> কালিদাসী স্বর্ণযুগ ভাসাইয়া আতাম্র শহরে
> কদম্বকাননে, আম্রে, মেঘদূতে বৃষ্টি যেন ঝরে,
> সন্ধ্যাকাশ ঢাকি কালবৈশাখীর নবধারাজলে
> গলির পিচের পথে, নীপবনে, ছায়াবীথিতলে। (বৈকালী)

নিরানন্দ মৃত ছিন্ন-শিকড় পরবাসী পরিবেশে বৃষ্টি 'বৃষ্টি তো নয়', পাথুরে শহরে পিচের রাস্তা যে নিষ্প্রাণ নির্মমতার প্রতীক, তারও মধ্যে বৃষ্টি জীবনের মমতা ঘনায়। অসুস্থ দুস্থ কলকাতার স্তূপীকৃত দুর্গন্ধের রাস্তাতেও বৃষ্টি পড়ে—

> দপ্তরে আড়তে ঘরে সকলেই ভোলে অবহেলে
> বর্তমান গ্লানিজ্বালা, চলে যায় স্বভাবসরল
> শৈশবেই, মহাখুশি জলপথে ইস্কুলের ছেলে
> ইলিশের মতো মুক্ত। সারা দেশে জলের ফসল। (তবুও আশ্চর্য বৃষ্টি)

যে অসম বিষম ব্যবস্থায় গ্রামে-শহরে ঘটেছে বিচ্ছেদ, বৃষ্টির অবিরল দিনে তা ঘুচে যায় 'নিরম্বু কলুষ ধুয়ে কলকাতাকে প্রাণ দিক গ্রাম'—জল যেমন ঝরে 'দগ্ধ পথে গলা পিচে ইটে', 'ছাতে ও ছাতায়', তেমনি ঝরে গ্রামের 'জলস্রোতে খানায় ডোবায়'। অন্য কারণেও তিনি 'সারা মনেপ্রাণে/মেঘের কাঙাল', অনুর্বর হৃদয়ে সত্তার ফসল যাতে ফলে। বৃষ্টি শুধু মাটিতে ঝরে না, ঝরে মনে, সত্তার গভীরে, অস্তিত্বের শিকড়ে—'মনে মনে আমিও সত্তার পোড়া ক্ষেত রুই, বুনি ;/হয়ে যাই থরো থরো ফসলের শিষ।' (আমিও তো) বৃষ্টি যুক্ত

করে দেয় ঐতিহ্যের সঙ্গেও—আবহমানকালের ভারতীয় কবিতার গুঞ্জরণ শুনি এই কবির বর্ষাসজল চরণে-চরণে, কালিদাসী স্বর্ণযুগ থেকে রবীন্দ্রনাথ। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'বিগলিত চীর অঙ্গে রিমি ঝিমি শব্দে শব্দে', রাধার মরমে বাঁশির মতো 'বৃষ্টি মরমে পশে', বৃষ্টি ঝরে 'মনের হরিষে নিন্দ যাওয়ার ছন্দে', 'যমুনার চির ভারতীয় শ্যামতৃণে'। যেমন বৃষ্টিধারা, তেমনি নদী আমাদের যুক্ত করে দেয় প্রবহমান ঐতিহ্যের সঙ্গে—'বহুকাল ধরেই নিয়ত এই নদী আমার ঐতিহ্য পরম আত্মীয়…।' এই নদীর সঙ্গে আমাদের আরাধনা তীর্থ তর্পণ, স্নান যান পান, সমস্ত দেশজ জীবনযাপন জড়িত। তাই নদীমাতৃক দেশের নদীমালার নাম কবির কাব্যে পাই বারবার—গঙ্গা সিন্ধু তিস্তা মাতলা মধুমতী মাথাভাঙা রূপনারায়ণ ইত্যাদি। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নদীর নিরবচ্ছিন্ন ধারা, বহমান ঐতিহ্য নিয়ে আসে অনেক সংকেত মৈত্রীর, মুক্তির ছন্দ, দ্বৈতের একতার। তাই 'নদীতেই নিশ্চয় প্রতীক', তাই 'আমাদের উপমেয় নদী/স্রোতে স্রোতে চলে নিরবধি'। মানবসংসারে যা মিছিল, নিসর্গসংসারে নদী তারই চিত্রকল্প,

> হৈমন্তী হরিণ নদী আজকে সে মরিয়া মহিষ
> প্রচণ্ড বন্যায় বন্য, নেমে আসে মাথাভাঙা তোড়ে।…
> ছুটির সে মরা নদী বর্ষা আজ, মাতে শত কৃষাণ-মুনিষ
> কিংবা মজুরেরা যেন দলে দলে কারখানার মোড়ে। (বর্ষার নদী)

বিষ্ণু দে একটি কবিতায় বলেছেন, 'একাগ্রতাই সত্তা'। নদীর মধ্যে আছে সেই একাগ্রতা, যেমন আছে মিছিলে। এই নদীই দেয় তারুণ্য গতি সজীবতার সংকেত, তাই পঁচিশ বছর পেনশন-ভোগী পিতামহ-আইসায়া দেখে অসিবীরব্রত নাতির 'নয়নে ভাস্বর/তার নীল নদী বয়, দুই তট সবুজ উর্বর।'

যে শিল্পী আত্মপরিচয় খোঁজেন, তাঁকে খুঁজতে হয় শুধু শিল্পীর জাগ্রত

জীবনে নয়, তাঁর নিজের ঘরের বংশের, দেশের আধভোলা-ভোলা চৈতন্যের রক্তের মধ্যে, জীবনযাপনের সব কিছুর সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে। দেশসমাজের পরিচয় সত্তার চৈতন্যে ধনী প্রজ্ঞাকে স্মৃতিতে সংহত করে দেশজ পুরাণের মধ্যে। চতুর্দিকে যখন বিসংগতি দেখেছিলেন বিষ্ণু দে তখন তিনি বারবার বিদেশী পুরাণ উল্লেখে বিচ্ছিন্নতার বোধকেই সাকার করেছিলেন, আবার যখন তিনি সঙ্গতি ও সাযুজ্যের সন্ধানী হলেন তখন কমে এলো বিদেশী পুরাণের ব্যবহার। অনেক গুণে বেড়ে গেল স্বদেশী পুরাণের উল্লেখ। এমন সব পুরাণের কথা যার তাৎপর্য লেখাপড়া-না-জানা সাধারণ মানুষ রামায়ণ-মহাভারত-কথকতা শুনে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। পাণ্ডব-কৌরবের কথা, বিভীষণ মেঘনাদ হিরণ্যকশিপু কংসের কথা, বাসুকী চাঁদসদাগর সুগ্রীব সুভদ্রা সত্যভামার কথা, দুর্বাসা কল্কি নৃসিংহ প্রহ্লাদ বিশ্বামিত্র অথবা উত্তরা-পরীক্ষিত কর্ণ-দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র বা শবরীর কথা। দাঙ্গার কলকাতার পর স্বাধীনতায় কলকাতার চরিত্রান্তর বর্ণন করতে গিয়ে বিষ্ণু দে লেখেন—'মুক্ত বর্ষভোগ্যশাপ, মুক্ত হলো কলকাতার বেড়ী,/ স্বর্ণলঙ্কাপুরে ছিল বন্দী সীতা মাটির দুহিতা/চার পাশে ঘিরে রাখে রাক্ষসের সৈন্য কিংবা চেড়ী···।' দগ্ধ কলকাতায় বৃষ্টির বর্ণনায় আসে অহল্যার অনুষঙ্গ—'এই ভালো; নবজলধর-শ্যাম আনুক আরাম/ অহল্যার শুষ্ক ক্ষতে সহস্র মরুতে ধারাজলে।' বৈপ্লবিক নবজন্ম বোঝাতে কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর প্রসঙ্গে আনেন তিনি এখন, রুশদেশের জাগরণ বর্ণিত হয় কুমারসম্ভবের আর জারতন্ত্রের পতন বর্ণিত হয় কালীয়দমনের আখ্যান দিয়ে।

শুধু দেশীয় পুরাণের কাছে নয়, আত্মপরিচয়ের অন্বেষণে বিষ্ণু দে লোকজীবনের স্মৃতিসংস্কারে বিজড়িত লোকসাহিত্য, রূপকথা ও ছড়ার দ্বারস্থ হয়েছেন। যে মানুষের সঙ্গ থেকে আত্মপরিচয় লাভ করা যায় বলে তিনি বিশ্বাস করেন, সেই মানুষের থেকে তাঁর কবিতা বিচ্ছিন্ন থাকবে এ কেমন করে হয়! যিনি দুর্বোধ্য ছিলেন, তিনি সহজ হতে

চেয়েছেন; এই কারণেও রূপকথার অনুষঙ্গ, ছড়ার লঘুচাল এনেছেন তাঁর কবিতায়। বারবার এসেছে সুয়োরানী দুয়োরানী কোটাল পক্ষীরাজ বেতালের কথা, এসেছে সাতভাই চম্পা রাক্ষস কঙ্কালী-পাহাড় দৈত্যদানো কড়ির পাহাড়ের প্রসঙ্গ। রূপকথা ধরনে লিখেছেন 'জয়মালা দেবে, লাল করবীর গুচ্ছে বেঁধে/চিকন কবরী দোলাবে কন্যা, ক্লান্তিহরা'। সত্তার মৌলিক প্রশ্নেও এসে যায় রূপকথার অনুষঙ্গ—'তাই আত্মপরিচয় নেই, ব্যক্তি নেই, সত্তা নেই,/লালনীলকমলের দেশে আজ বর নেই,/বিধবার দেশে অরক্ষণীয়ার সুন্দরীর বর নেই, সত্তা নেই···' (স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত)। নিজবাসভূমে মূলহীন পরবাসী হওয়া আত্মবিচ্ছেদের অপ্রতিরোধ্য পরিণাম। তাই দেশের মানুষে নিসর্গ পুরাণে রূপকথার সত্তাকে খুঁজে নিতে হয়। 'মরিয়া না মরে রাম নামহীন এই সব চাষী ও মজুর', দোলদুর্গোৎসব ঈদমুবারক নবান্নকে জানতে হয়, খেত মেলা আলপনা শীতলপাটিতে দেশীয় মেধাকে অনুভব করতে হয়, শুনতে হয় 'গ্রাম গ্রামান্তরে খেত-খামারের ভাটিয়ালি রাখালি বাঁশি', অংশ নিতে হয় 'মহিমের পোড়ো বাসা, ছোট মুখ, ছোট আশা, ভালোবাসা'-র, 'ভুবন ডাঙার হাটে/লাজুক দুটি উৎসুক সে চোখে' চোখ মেলাতে হয়। কায়মনোবাক্যে অনুভব করতে হয়—'এ দেশ আমার দেশ/আমারই আপন সত্তা···।' আর দেশের সেই স্বরূপ থাকে দেশজ ভাষায় —'তাই পরিব্রজে খোঁজা অপভ্রংশে, দেশজ ভাষায়,/আঞ্চলিক মুখে মুখে স্থানীয়ের বিশিষ্ট বচনে,/কথ্যছন্দে, সুরময় প্রাত্যহিক প্রাকৃত ভাষণে' (মালার্মে : প্রগতি। অনেক কথ্যছন্দ ছড়া সংকলিত হয়েছে পরিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে তাই, 'সাত ভাই চম্পা' এবং 'সন্দীপের চর' বইতে। পরেও লিখেছেন মিলিত নবজীবনের ছড়া-'কে জানত পোড়া দেশে এত বুলবুলি!/বানচাল দেশ ধানচালে ঘুলঘুলি/কোনঠাসা করে করেছ বোঝাই।' যাঁর কবিতায় দুর্বোধ্য শব্দব্যবহার, ক্রতুকৃতম অপাপবিদ্ধমস্থাবির সোৎপ্রাসপাশ, এক সময় ঠাট্টার বিষয় ছিল, তিনি এখন খোরপোষ ছুতোরের পো বানচাল তুলোধোনা জুজু

পঁইছে হিম্মৎওয়ালা দানো-পাওয়া হুমকি সর্দারি গর্দান চরকি নিমকহালাল দালাল, এই সব শব্দ অসংকোচে ব্যবহার করেন।

'জীবনের চেয়ে শিল্পে বিরোধ কি তীব্র নয়?' বিষ্ণু দে একবার জিজ্ঞাসা করেছেন, অন্যবার জবাব দিয়েছেন, 'শিল্পী জানে, কবি জানে, যেহেতু প্রেমিক তারা, তাই জানে/দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা; জানে সমাধা দুরূহ, তবু আশাও দুর্মর···।' কিসের আশা?—শিল্পের অন্তর্গত দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে সমাধা অর্থাৎ সৌষম্যের ক্ষমায় পৌঁছুনোর আশা। কেউ কবিতা লেখে, কেউ গান গায়, আঁকে চিত্রপট, গ্রানিটে নির্মাণ করে ইমারত, 'নির্মাণই সত্য জানি।' তাই কোনার্ক মন্দির দেখে শিল্পী-মজুরের কথা ভেবে কবি জিজ্ঞাসা করেন 'এরা কি সবাই বীর, প্রত্যহের অশ্বারোহী, কর্মী অনলস, সবাই অপরাজেয়, জীবনে নির্মাণে এক সংহত তন্ময়?' নির্মাণের মধ্যেই শিল্পীর সত্তার, আস্তিক্যের প্রমাণ। শুধু আস্তিক্যের প্রমাণ বলেই নয়, শিল্পেই যেহেতু উপাদান আর রূপকল্প অপৃথক হয়ে যায়, তাই আত্মবিচ্ছেদহীনতাব সুডৌল সঙ্গতি বোঝাতে বারে বারে কবি টেনে আনেন অনিবার্যভাবে শিল্পের প্রসঙ্গ। শিল্পের মধ্যে থাকে কোনার্ক মন্দিরের মতো সামগ্রিক স্থাপত্যের সমন্বয় ও সুষমা—'খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ডিত নৃত্যের সমগ্র স্কন্ধ ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় সমাহিত,/যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে একেকটি তড়িৎস্তবক।' বিচ্ছিন্ন বিড়ম্বিত জীবনে দুর্লভ সংহতি মেলে শিল্পের মধ্যে 'তাই শিল্পে সত্তা শুদ্ধ'

> কোটি কোটি লোক বাঁচি, নাকি মরি, শাসনে শোষণে;
> তাই, থেকে থেকে খুঁজি জীবনের তন্ময় ভাবণে,
> প্রেমে, সখ্যে, প্রকৃতি বা সংগঠনে, মানুষের জয়ে
> শিল্পের চিন্ময় কর্ম জীবনের ভঙ্গুর মৃন্ময়ে। (তাই শিল্পে)

শিল্পই দিতে পারে মৃন্ময়ে-চিন্ময়ে ছেদহীন সঙ্গতি, কেননা তারই মধ্যে জড়-চৈতন্যের একান্ত অভেদ। 'তাই তো শিল্পের মুখ চাওয়া, যদি

দুস্তর বাস্তবে/এবং হৃদয়ে বাঁধে অবিচ্ছেদ্য মননের সেতু…' (তাই শিল্পে পাই)।

সমস্ত শিল্পের মধ্যে আবার সঙ্গীতের দিকে তাকিয়েছেন তিনি সব চেয়ে বেশি। ধরনের জন্যে, অন্য কারণেও। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ সাল ধরে লেখা 'বৈকালী' সাঙ্গীতিক দশটি চাল বা মুভমেণ্টে বিন্যস্ত। দশটি মুভমেণ্ট পরিণামে এক লক্ষ্যে লীন হয়ে যায়। বিখ্যাত 'জন্মাষ্টমী' কবিতাও দুটো বিপরীত সাঙ্গীতিক তরঙ্গের সম্পর্ক দিয়ে রচিত। 'অন্বিষ্ট' কবিতায় যেখানে তিনি সঙ্গতির প্রার্থনা করেন, 'হে বন্ধু মিলাও হাত কলমে কোদালে লাঙলে লেখায়/যেন মিলে যায় আমাদের আশা ও নৈরাশ'—সেখানেও ভিন্ন ভিন্ন সাঙ্গীতিক মুভমেণ্ট একত্র হয়, সরে যায়, আবার মিলে যায় সমন্বিত সুষমায়। 'বারমাস্যা' কবিতার বারোটি মুভমেণ্টের পরিণামেও আছে সাযুজ্যের কথা—

> ব্যক্তির স্বরূপে ডুবি, ডুবি গুরু সমষ্টির হাঁকে,
> সাযুজ্যের ডাক শুনি উন্মাচিত উর্মিল গাজনে
> বিকট ভবিষ্যে লোটে মাথুর, কদম্বে হাহাকার,
> অকালবোধনে চণ্ডী সেতুবন্ধে আশ্বাস ছড়ায়। (বারমাস্যা)

'সেই একতার অর্কেস্ট্রার সমসমাজের/সঙ্গীতে ডোবে অন্যমনারও আত্মরতি'—তাই পরস্পরে আত্মীয়, মানুষে-মানুষে সহযোগী সমসমাজের কথা ভাবতে গেলেই যাঁর মনে পশ্চিমী অর্কেস্ট্রার সঙ্গীততরঙ্গ জেগে ওঠে—জেগে ওঠে 'বীটোফেনী সঙ্গীতের গন্ধর্ব বাতাস' বা গ্লুক্ বা বাখের কথা। জেগে ওঠে, যেহেতু সঙ্গীতেই সমস্ত বৈষম্য একটি সুষমার তোড়ায় বাঁধা হয়ে যায়—'হঠাৎ বেহালা বাজে/খুলে দেয় সুরের ফোয়ারা', মুছে যায় দিনের ঘৃণ্যতা, অনর্থক স্বার্থের দহন, সমস্ত বিচ্ছিন্ন শিল্পের চরম রসায়নে রূপান্তরিত হয় অবিচ্ছিন্নে। তাছাড়া, সঙ্গীতকে বলা হয়ে থাকে শুদ্ধতম শিল্প, কারণ সঙ্গীতের মধ্যেই মাত্র রূপকল্পই বিষয়, বিষয়ই রূপকল্প। বিষয়-রূপ সেখানে আদৌ অভিন্ন। আবার এলিয়টের 'music heard so

deeply/That it is not heard at all, but you are the music/While the music lasts' চরণগুলি স্মরণ করেই বিষ্ণু দে লেখেন 'ও রকম আমারও ঘটেছে,/যখন গায়ক নিজে, অথবা গায়িকা হয়ে ওঠে গান কথা সুর/আর শ্রোতা হয়ে যায় অধরা সে গানের বিষয়/আধেয় আধার, একাকার শরীর ও অশরীরী প্রাণ···।' (গান)। সঙ্গীতের ধ্যানের চূড়ান্ত মুহূর্তে সব ভেদ লুপ্ত হয়ে যায়, গায়ক-গানের, শ্রোতা ও গানের, গায়ক আর শ্রোতার। তাই সঙ্গতির কথা এলেই সঙ্গীতের কথা আসে। প্রকৃতিজগতে ঐকতান সমাহার দেখে যখন কবি ভাবেন কবে মানবসমাজে এই অবিচ্ছেদ আসবে, তখনই সঙ্গীতের উপলব্ধি জাগে—'এ আকাশ মহাসত্তা পৃথিবীর কতো না রঙের/শত শত বর্ণাভাসে এ যেন বা অর্কেস্ট্রা বিরাট !/একত্রে, সবাই এক সঙ্গীতের সঙ্ঘে বদ্ধ, তন্ময় মননে এক ··' (হেমন্ত)। আবার যখন হতাশা উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভবিষ্যতের স্বপ্নময় আশায় আস্থা রাখেন, তখন সেই আশাও সাঙ্গীতিক সুষমার রূপ নেয়।

> এ নৈরাশ সাজে নাকো। মনে প্রাণে ইন্দ্রিয়ে সঙ্গীত,
> তোমরাই অর্কেস্ট্রা সে যে বিশ্বময় বিরাট আসরে
> আশার উৎসবে জ্বালে আনন্দের অস্থির সম্বিৎ
> যন্ত্রণার মীড়ে-মীড়ে মৃত্যু-লেখা প্রাণের আখরে··· (এখনই বিদায় গান)

অভেদের মধ্য দিয়ে সঙ্গতি অর্জনের কথা বলতে গেলে চূড়ান্ত যে প্রতিমা বারবার বিষ্ণু দে-র মানসে ভেসে ওঠে সে দাম্পত্যসম্পর্কের। 'আমরা সবাই মানবজন্মে অমর মেলি প্রতীক-/কঠিনে কোমল বীরের বাহুতে স্বায়ত্ত বরনারী।' ভিন্ন নারী ভিন্ন নর দাম্পত্য-প্রেমে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এক সত্তায় অভিন্ন হয়ে যায়। তাই কর্মিষ্ঠ মানুষের স্বেদসিক্ত মুখের ছবি আঁকতে গেলেই তিনি কৃষাণের পাশে দেখেন ভূস্বর্গ ইন্দ্রাণী কৃষাণবধূকে। প্রেমিক-প্রেমিকা যখন একাগ্র প্রেমে আত্মস্থ তখন তারা দ্বৈততা হারিয়ে একের দ্বিজত্ব পায়। হয়তো সেই 'দিব্য আত্মস্থতা' ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ক্ষণকালের সেই অহংলোপী সঙ্গতি 'ঈশ্বরের

কাছে মর-মানুষের আপাতত মৌল ঋণশোধ'। দাম্পত্যপ্রেমে আলাদা মানুষ চূড়ান্ত মুহূর্তে হয়ে যায় অভিন্ন, এক, অবিচ্ছিন্ন—

দুটি সত্তা, ভিন্ন রাজ্য দিনের আলোয়,
সীমান্ত হারায় রাত্রে, ঘনিষ্ঠ আঁধারে
একটি শয্যার প্রান্তে দুটি অসীমের
তখন কুলান হয়…
যদিও প্রত্যেকে এক এবং স্বাধীন
মানবিক অরণ্যের নির্বিশেষে লীন,
বিশেষের দিব্যস্থানে তখনই উজ্জ্বল
হয়ে ওঠে চৈতন্যের তিমির সত্তায়,
অক্ষিস্থ ধূসরে যেন শাদায়-কালোয়…
যোগাযোগ রাত্রি হয় দিন। (রাত্রি হয় দিন)

এই দাম্পত্যের ছবি খোঁজেন তিনি পুরাণে, প্রাচীন সাহিত্যে। অথবা মূর্তিশিল্পে। নির্জলা অভাব, উপবাসী জ্বালা, পশ্চিমা মরুর দাহ হেঁটে পার হয়ে নিজস্ব সংবাদদাতা ছোট ভাঙা জনহীন মন্দিরে দেখে যন্ত্রণাগ্রস্ত দেশে যেন সত্তার প্রতীক হিসেবে 'নগ্ন যুগলবিগ্রহ বেশ-ভূষাহীন, শুধু কষ্টিপাথরের দেশী রাধা আর ঘনশ্যাম…।' আত্মচ্ছেদহীন সত্তার চূড়ান্ত আদর্শ হিসাবে জগতপিতরৌ পার্বতী-পরমেশ্বরের চূড়ান্ত প্রতীক বিষ্ণু দে বারবার ব্যবহার করেন। 'অর্ধনারীশ্বরের প্রতিমা'-র চেয়ে অভেদ সত্তার বড় প্রতীক আর কি হতে পারে? 'যাকে ভেবেছিলে পরমেশ্বর, সেই দেখ পার্বতী।' প্রান্তরে আত্মসংবৃত আত্মস্থ বিরাট অশ্বত্থকে দেখেও সেই ভারতীয় যুগলের কথা মনে পড়ে,—'কঠিন সংহত স্থির সারাটা প্রান্তরে প্রাণের গঠন,/অজেয় উৎসবে কোনও উমার সন্ধানে/যেন বা এসেছে দেশে সতীর গিরিশ।' তাই আশ্চর্য হই না যখন ডাস ক্যাপিটালের শতবার্ষিক উপলক্ষে লেখা 'একশো বছর পরে' কবিতায় তিনি 'ধূর্জটির যুগ্ম-নৃত্যের প্রতীক ব্যবহার করেন, কারণ বিচ্ছিন্নতার রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র তো সেই মহাগ্রন্থেই মার্কস দিয়ে গিয়েছেন। সেই নিদান মেনে

নিলে সমাজ-সংসারে আসবে সঙ্গতি, যে সঙ্গতি পার্বতীপরমেশ্বরে, অর্ধনারীশ্বরে।

দাম্পত্যের মধ্যে তিনি অন্তঃসঙ্গতির চূড়ান্ত প্রতীক পান, তাই শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু দে-র প্রতীকী তীর্থযাত্রায় প্রেমই পরম পথপরিচালক। আর সেই প্রেম কোনো বিমূর্ত ভাব নয় বিষ্ণু দে-র কবিতায়, যদিও বিয়াত্রিচের মতো প্রেমিকার কোনো নাম এই পদাবলীতে উচ্চারিত নয়—কিন্তু তবু সে মূর্ত, বিয়াত্রিচের মতোই। বিয়াত্রিচে সম্বন্ধে দান্তে যেমন বলেছেন, 'If that which up till here is said of her were all compressed into one act of praise 'twould be too slight to serve this presant turn. The beauty I beheld trans-cendeth measure, not only past our reach, but surely I believe that only he who made it enjoyeth it complete.' (পারাদিজো, সর্গ ত্রিশ, Carlyle-Wick-st ed অনুবাদ), তেমনি বিষ্ণু দে-র কাছে প্রেমের মহিমা, সৌন্দর্য, বিভূতি অপরিমাণ—'তুমিই সমুদ্র জানি, আমি অন্তরীপ, / খুঁজি না তোমার শেষ কোথা, কোথা তল, / তোমার রহস্য তাই করি না জরিপ, / আমার জীবনে শুধু তরঙ্গ উচ্ছল…' (তুমিই সমুদ্র)। আপন পদাবলীতেও প্রেমই নিয়ন্তাশক্তি, তাই বিষ্ণু দে স্বাভাবিকভাবেই বিয়াত্রিচেকে স্মরণ করেছেন—

> আমিও সৌভাগ্যবশে তোমাকে দেখেছি বেয়াত্রিচে,
> নববাসন্তীর কুঞ্জে নিজে পরিয়েছি গুঞ্জামালা
> তোমার অমরকণ্ঠে, তৃতীয় স্বর্গের আলো-জ্বালা
> নভোময় এ হৃদয়ে; যদিও বেঁধেছি বাসা নিচে
> বিপর্যস্ত পৃথিবীর তেপান্তরে চৌরঙ্গির পিচে
> ছদ্মবেশী নরকের কোলাহলে বেসুর বেতালা,…
> আমিও শুনেছি দিব্য বিশ্বব্যাপী প্রেমের মহিমা,
> দেখেছি নিজেরই স্নায়ুতন্ত্রে শুকতারার সঙ্গীতে
> তোমার ভাস্বর প্রেম আসমুদ্র সমস্ত মর্ত্যের
> সর্বজীবে মিলিয়াছে…। (বেয়াত্রিচে)

এমন প্রেমের মন্ত্র, এমন প্রেমিকার নামহীন অস্তিত্ব বিষ্ণু দে-র সমস্ত পদাবলীতে গুঞ্জরিত—'দেহমন ঘিরে তোমারই তো নামাবলী'। সেই প্রেমেই নারকীয় শূন্যতা থেকে আসল উদ্ধার। ভার্জিল-রবীন্দ্রনাথ পথ দেখিয়েছেন, বিয়াত্রিচে-প্রেমই সেখান থেকে নিয়ে যেতে পারে, সেই চূড়ান্তে। 'বিরাট শূন্য বাঁধবে কে / তুমি ছাড়া বলো ?' তাই যুদ্ধের নারকীয় বীভৎতার দিনেও প্রেমেই আসল আশ্রয়—'মধ্যবয়সী, তবুও তনু তোমার / আশ্বিন-আলো ছড়ায় আমার মনে।/ ফেলে দিই ভয় ফেরার পীত বোমার, / জীবন ঘনায় তোমার আলিঙ্গনে' (মধ্যবয়সী)। সমস্ত বিশ্বাস আস্থা আশ্বাসের প্রতীক যে প্রেয়সী, যার অস্তিত্বের মধ্যে শূন্য থেকে উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি, তাকেই আহ্বান করে কবি বলেন—

তোমাকেই দিই এই ক্লান্তির ভার
দীর্ঘ আয়ুতে উদ্বায়ু গত, ক্ষমা
তুমি ছাড়া কেবা করবে অঙ্গীকার ?
পূর্ণিমা তুমি, তোমাতে মেলাই অমা,
ঘৃণার আঁধার তোমাতেই প্রিয়তমা
সহিষ্ণু আলো জ্বালুক পূর্ণিমার। (সহিষ্ণুতা)

যে সমাজতান্ত্রিক স্বর্গ বিষ্ণু দে কল্পনা করেন তারও আভাস দেখেন শুচিশান্ত প্রেয়সীর মধ্যে—'বন্ধন নয়, বিশ্বব্যাপ্তি তোমার টানে, / ভাবী সমাজের অজেয় ইশারা তোমার গানে।'

এই ইহকালের প্রণয়িনীর মধ্যে তিনি আবার দেখেন যুগলপ্রেমের স্রোতে ভেসে আসা চিরন্তনী পরানপ্রিয়াকে—'প্রেমেই সমগ্র তুমি / হেরে যায় কালের নিষাদ।' ইতিহাসের দীর্ঘ নীলাকাশে সেই প্রেয়সী যেন তারকার মতো জ্বলে আপন অপরাজেয় গর্বে, 'উমার হৃদয়ে জ্বলে ত্রিনেত্র যেমন'।

তোমাকে কি দেব বলো ? আমার রাত্রিতে
তুমিই আকাশ ঘুম, স্বপ্ন, তুমি পাশে জেগে থাকা।
সবই তো তোমাকে ছুঁয়ে, দিনগুলি যেমন সূর্যেই,

তোমাকে যা দেব তাই, তোমারই তো দান চেয়ে রাখা,
যেমন বাজাই সব প্রত্যহের জয়গান কালের তূর্যেই। (রাগমালা)

দান্তে তাঁর মহাকাব্যের শেষ স্তবকে বলেছিলেন 'যেমন চাকা সুষম গতিতে ঘোরে, তেমনি তাঁর কামনা ও ইচ্ছা সেই প্রেমের দ্বারা আবর্তিত হচ্ছে, যে প্রেম সূর্য এবং নক্ষত্রনিচয়কে নিয়ন্ত্রিত করে।' প্রেমের সেই সার্বভৌম দিব্য প্রভা সত্তান্বেষী এই কবির উপলব্ধির এলাকায় অজানা নয় 'সমস্ত নিসর্গে দেখি তারই প্রতিধ্বনি', সেই প্রেম চরাচরব্যাপী বলেই প্রশ্ন জাগে—'তারই জয়যাত্রার আলপনা কি দিল সূর্যোদয়, / ভাসাল সূর্যাস্ত তার কপালের সিঁদুরে, সজনী ?'

যখন সংশয় এই দুলে ওঠে ছ-টার ট্রাফিকে,
তখনই পথের লাল আলো পড়ে তোমার শরীরে
অনন্ত যৌবনে স্মিত, আমার সমস্ত দিন ঘিরে
পরিত্রাণ পায় সেই মুহূর্তেই সব অপচয়। (সনেট)

সব বিসঙ্গতি, 'সব অপচয়' অর্থাৎ 'accidenti', প্রেমেই ঐক্য, স্বস্তি ও সুষমা পায়। 'আকাশে দোলে শুচি তোমার ছায়াপথের চন্দ্রহার', তাই প্রেমিকা যখন সদ্যস্নান সেরে ঘরে ফেরে প্রেমের প্রসাদে, তখন দান্তের দিব্য চরণের প্রতিধ্বনিতে মনে হয় এ যেন সেই প্রেম 'যে-প্রেমে প্রত্যেক দিন সূর্য ফেরে, ফেরে সন্ধ্যাতারা।'

তবু বিষ্ণু দে-র কবিতায় স্বর্গে উত্তরণ নেই। প্রেমের ছায়াপথ দিয়ে তিনি সেই স্বর্গের আভাস দেখেন মাত্র, আর তার রূপরেখা ভাবেন। শূন্যতা হতাশা অতিক্রম করে উদ্ধারের প্রত্যাশায় সন্তপ্ত পারাদিজোর প্রান্ত থেকে তাঁর অনামা বিয়াত্রিচে তাঁকে স্বর্গের দিকে ইঙ্গিত করে। সেই ইঙ্গিত অনুসরণ করে স্বপ্নস্বর্গের ছবি কবি এঁকেছেন কোনো কোনো কবিতায়—

আমিও তো যেতে চাই জন্মাবধি, যেখানে নির্ঝর
স্ফটিকচঞ্চল আর ষড়্‌ঋতুই মধুর-মুখর,

যেখানে রৌদ্র ও বৃষ্টি নিয়মিত মৈত্রীর আকর,
দুহাতে সঙ্গতে বাঁধে প্রত্যেকটি জীবনের প্রতিটি বৎসর।
পেতে চাই শুদ্ধ শান্ত পৃথিবীতে শুচি মহাকাশে,
দুদিকে মরাই ভরা, সুগঠিত শহর দুপাশে,
যেখানে মানুষ মুক্ত, প্রতি ব্যক্তি সংলগ্ন প্রত্যাশে,
শতায়ু বিনাই প্রতি মানুষ অমর। (আমি তো যেতে চাই)

'যেতে চাই', 'পেতে চাই'—যাওয়া এখনো হয় নি, স্বর্গ এখনো পাওয়া যায় নি। তাই সমর সেনের অভিযোগ 'how does he manage to look so serene even in the short run when everything is so ruffled and messy?' ('বাংলা কবিতা', ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বিশেষ বিষ্ণু দে সংখ্যা), যথার্থ নয়, এখনো কবি 'still centre'-এ পৌঁছুতে পারেন নি। অভিযোগ ভুল, তবু অভিযোগ ওঠে দুই কারণে। কখনো কবি বলেন আপন প্রত্যয়ে আস্থাবান কবির 'কৃত্য দায় / শুধু আলো জ্বেলে যাওয়া রাজপথে শুভ্র দীপাধারে।/ সে কেন দেখবে বলো চোরাকানা গলির আঁধারে। কোথা কোন্ কোণে ল্যাম্পপোস্টে কোন্ কুকুর কি নোংরা ছড়ায়' (সে কেন)। চরাচরের নোংরাকে অগ্রাহ্য করা, জীবনে যখন অহরহ দ্বন্দ্ব তখন ধ্রুবে তাঁর অবিচল আস্থা 'প্রতীক বার্তাবহ / হাওয়ায় হাওয়ায় বেঁধে আনে প্রত্যয়', মাঠে মাঠে অসাড় হিম সত্ত্বেও তাঁর অপরিসীম স্বপ্ন—এই সবের জন্যেই আপাতত মনে হয় কবিতায় বিষ্ণু দে 'looks so serene'। কিন্তু সে দৃষ্টিবিভ্রম—রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও যেমন হয়, প্রশান্তি গোপন করে রাখে অবিরাম প্রচ্ছন্ন সংগ্রাম। বিষ্ণু দে ভোলেন না 'যদিও মর্যাদা আজ দূরের আকাশে আসন্নসম্ভবা, এখনও জীবনে ব্যাপ্ত দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অপমৃত্যু অসত্যের অন্যায়ের নানা বিভীষিকা, একদিকে অকর্মণ্য নানা খেলা, মৃত্যুময় অহমিকা' (শত মুখ নদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড়) দ্বিতীয়ত, বিষ্ণু দে যে যন্ত্রণার দৃশ্য 'short run'-এ দেখেন, তাকেও দেখেন দূরের

পটভূমিতে। 'যখন পাণ্ডব আর কৌরবকে চেনা হয় ভার, / যখন আশঙ্কা আশা সদসতে প্রায় বিশ্বরূপ' তখন 'ছড়ায় চোখ কাল অতিক্রান্ত দূরে'। এমন দূরের প্রেক্ষাপটে দেখেন বলে মনে হয় সত্তবেদনা হারালো তার তাৎক্ষণিকতা।

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'—'স্মৃতি' যেন অতীত ইনফের্নো, 'সত্তা' যেন বর্তমানের উদ্ধার-উৎসুক পুরগাতোরিও, আর 'ভবিষ্যত' যেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় উজ্জ্বল পারাদিজো। কিন্তু দান্তের মতো বিষ্ণু দে-র কবিতায় সুস্পষ্ট স্তরভেদ নেই। এখানে নরক ও শুদ্ধিলোক আর স্বর্গের সম্ভাবনা একসঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। দুই জগৎ ও তৃতীয় জগতের সম্ভাবনা এই কাব্যে যুগপৎ উপস্থিত। তাই যে পর্যায়ের কাব্য থেকে আরম্ভ হয়েছে উজ্জীবনের শুদ্ধিলোকের স্তর, সেখানেও বারবার নরকের কথা আছে। (১) 'নীরন্ধ্র অবীচি আর দুর্গন্ধ রৌরব···' (চতুর্দশপদী) (২) 'নরকে আমারও যাত্রা অলকার গন্ধ গায়ে / আমিও শুঁকেছি শকুনের শিবার আহার···' (অন্বিষ্ট)। (৩) 'দান্তে নরকে এ জীবন লেলিহান অনেক চোখের / স্বপ্ন আজকে মধ্যদিনের আগুন' (অবিচ্ছিন্ন কাব্য)। (৪) 'এ কোন্ নরকে এসেছি আমরা অলকার দম্পতি' (স্মরক্রান্তি)। (৫) 'এ নরকে / মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই···।··· আমরা নরকে আছি, অথচ সে জ্ঞান নেই মনে / তাই বিবাহসভায় প্রচ্ছন্ন নরকে আজ বর নেই···' (স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত)। (৬) 'নরকে যে আমাদের নির্জলা ভূলোক' (নির্জলা ভূলোক)।

যেখানে নরকের সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই সেখানেও বহু চরণে তিনি নারকীয় পরিবেশ ফুটিয়েছেন বিকল্প প্রসঙ্গের কৌশলে, অনুষঙ্গের পরোক্ষতায়। সেই সব দৃশ্য এঁকেছেন যেখানে মরা ভাগাড়ে ঘুঁটের ধোঁয়া, শ্যাওড়া আগাছা নোংরায় ভাঙা পথ, জীর্ণ মঠ বিদীর্ণ মন্দির, শূন্য ক্ষেতে খামারে ইঁদুর, চতুর্দিকে মনসায় ধুতুরায় লোলুপ আগুন আর শ্বাপদ-সংকুল বনে শৃঙ্গী ও দন্তুর প্রাণীর সমারোহ। অন্যত্র—

বিরাট মৃত্যুর ডাঙা, এক ফোঁটা জল নেই প্রাণ এক ছিটে ;
না জানি কী অন্ধকারে কঙ্কালী কোটরে করে গৃধ্নুর মন্ত্রণা
স্বর্গহীন লুসিফর, বীলজেবব ম্যামনেরা ; মাটির যন্ত্রণা
থেকে থেকে ফেটে পড়ে বালিতে কাঁকরে অভ্রে লাইমে গ্রানিটে ;
নিরন্ন নীরস লগ্ন, শুষে খায় তিলে তিলে নিসর্গ নিষাদ ;
একটু সবুজ নেই, শুধু সোনা, পোড়া, নেই কীটেরও আভাস,
শ্যাওড়াও মরে যায়, তারও কাঁটা মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের আশ্বাস।

(শুশুনিয়া)

কারাগারের মতো এলসিনোরে, ঘুণলাগা দানেমার্কের রাজাসন, যেখানে হাওয়ায় কলুষ—সেও তো নরকেরই বিকল্প। সত্তার সন্ধানী খোঁজেন অবিকল আত্মস্থ মানস, কিন্তু চতুর্দিকে দেখেন এখনো 'পাপের মিলনে ভয়ংকর মত্ত-অন্ধকার চলে জাঠা/অন্ধ নেকড়ের পাল', ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা টাইরেসিয়সের অন্ধ অন্তর্দৃষ্টি ধার নিয়ে তিনি দেখেন—

তুমি তো দেখনি দেশ অনাহার কাকে বলে
দেখনি তো সারাদিন ঘুরে ঘুরে
লঙ্গরখানার পাশে সন্ধ্যার নৈরাশে
নিজের শিশুর মুখ
অনাগত আহারে উন্মুখ
দেখনি সঙ্গিনী স্ত্রীর বিবস্ত্র ব্যর্থতা
অসহায় রোগের লড়াই···
আমার দুচোখ অন্ধ, আমি শুধু অন্ধকারে দেখি
অতীতের ধূলা আর ভবিষ্যৎ রাবিশে কাদায়
বোজানো ডোবার জল
তোমাদের প্রাণের পল্বলে মানুষ বাঁধে না বাসা
স্রোতের বিস্তার নেই
মাছও নেই, কাদা, ধুলা, মরা ব্যাঙ
রৌদ্রে শুকায়···। (টাইরেসিয়স)

পোড়ো জমি, স্থদে স্থদে খেত দেউলে, হাল লাঙল ভঙ্গুর, সার

নেই বীজধান নেই ; কোনো বছরে অতিবৃষ্টি, কোনো বছরে অনাবৃষ্টি—মানুষ মৌন অসহায়, আকাশ বিবর্ণ। ওদিকে 'অস্থিসার কলকাতার শোথাতুর মরুভূমি'। চতুর্দিকে মতিচ্ছন্ন গৃধ্নুদের ধূর্ততা, স্বার্থান্ধের ক্ষমতার লোভ। এই বিচিত্রদেশে 'ভূতপত্রীর বালি, উড়ু-উড়ু ধূলিসার, / শুষ্ক, দগ্ধ, ছায়াশূন্য, ছিন্নমূল, / কোনোটি বা স্কন্ধকাটা, নিষ্পল্লব, যত খাল / কানা নদী পচা হাজা কত শব, / আর নদী নদীর কঙ্কাল ;/ ফ্যাকাসে হাওয়ায়/অস্থিসার/এ মেঘমাশ্রিত সানু, অয়শ্চক্র সমুদ্রও হেরে যায়…' (এ বড় বিচিত্র দেশ)। দেশের বাইরে বিশ্বে তাকালে দেখেন 'অনেক হিরোশিমায় যেন অনেক হাইফঙে / যীশুর শ্বেত নদীও কেন রাঙা?' (পিতার মতো মাতার মতো)। থেকেছেন বুর্জোয়া বহু দেশে গ্রামে শহরে বস্তিতে, দেখেছেন বুর্জোয়া-বিকাশের মর্মান্তিক পরিণাম—'লালদীঘির লাল অন্ধকার'। অন্য কবিতায় (জন্মাষ্টমী) বলেছেন 'লালদীঘি তো চিরকাল এ শহরে অশ্রুর তোরণ' এবং সেই তোরণে লিখে দিয়েছেন দান্তের ইনফের্নোর তোরণের লিখন অনুবাদ করে 'এখানে যে আসো এসো সর্বআশাহীন'। নরক পরিবেষ্টিত কবির মনে বারবার প্রশ্ন জেগেছে, জ্ঞানে আর কাজে, স্বপ্নে-বাস্তবে, তত্ত্বে-তথ্যে অন্তহীন মল্লযুদ্ধ চিরকাল কি চলতে থাকবে, সভ্যতার অর্থ কি গুহায়িত হৃদয়কে নিজেই হানায়, মনীষার তাৎপর্য কি শ্বাসরুদ্ধ মনের মরণ? বাংলার জীবনে যখন মরুভূমি ধেয়ে আসে, নিঃস্ব আর পাণ্ডুর আম-জাম-কাঁঠালের বন, যখন 'সত্তা হয়ে ওঠে স্বার্থ সিমুমের বালুকাবীজনে', তখন সংশয়াপন্ন কবির এক-একবার 'মনে হয় কী নির্বোধ! বৃথা গেছি আজীবন বকে!' তাই সমর সেনের অনুযোগ কী করে মানি, যে গলিত সীসার মতো তপ্ত অশ্রু অথবা অলাতচক্রে আবদ্ধ মানুষের যন্ত্রণার কথা অবহেলা করে বিষ্ণু দে প্রশান্তিতে আত্মস্থ!

পুরগাতোরিওতে উত্তরণের মুহূর্তে, ১৯৩৬ সালে যে কবিতা লিখেছিলেন বিষ্ণু দে—'জন্মাষ্টমী'—সেই অসামান্য কবিতায় একাকার

হয়ে মিশে গেছে, সঙ্গতি ও সত্তার অন্বেষণে কবির শুদ্ধিলোকে যাত্রা, আর সেই প্রতীকা যাত্রার পথের দুধারে ইনফের্নোর পরিবেশ—শূন্যতা বিসঙ্গতি বিষাদ আর কান্না। দুই বিপরীত তরঙ্গ—একদিকে নির্বোধের মদগর্ব, স্বার্থপর লজ্জাহীনতা, অন্যদিকে 'আনন্দ, আনন্দ বুঝি। আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ'; একদিকে সিনেমার অন্ধকারে 'ক্লোস্‌অপ্‌ আলিঙ্গনে/মদালস গভীর চুম্বনে/বিদ্যাসুন্দরের যত নব্য হৈচৈ', অন্যদিকে রথচক্র বঞ্চিত আবেগে সঞ্জীবনী প্রতিষেধ। চা তাস ফ্লাস খিস্তি অট্টহাসি, লিলির টেনিসের জুড়ি খসরু বেগ, গণ্ডেরিরাম 'নিমকহালাল তুখোর দালাল', তার বিপরীতে 'আনন্দের যে ভৈরবী মীড়ে মীড়ে / সুষুম্নার শিরে শিরে' সেই সাযুজ্যসঙ্গীত। তখনই বুঝেছিলেন শেষ পর্যন্ত জিতবে দ্বিতীয় তরঙ্গ, প্লাবিত করে দেবে সর্ব চরাচর, সামান্য ঝিল্লিও মৌন, 'ক্রন্দনশর্বরী / শেষ হল, সেও বুঝি জানে।' পঁচিশ বছর পরে 'অয়রিডিকে' কবিতায় বলেছেন আবার (১) 'নরকের পথে গান করে চলি মৃত্যুঞ্জয় মাত্রায়', (২) 'নরকে তোমার প্রেমের কলিতে মরণও যুক্তপাণি।' শেষ পর্যন্ত আলোয়-আলোয় স্নাত পারাদিজোয় উত্তরণ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু নারকীয় পথ বেয়ে সেই উত্তরণ তার যন্ত্রণা এখনো বিষ্ণু দে-র কাছে উপেক্ষিত নয়। সত্তা, সঙ্গতি অর্জিত হবেই এই বিশ্বাসে ধ্রুবতা সত্ত্বেও বিসঙ্গতি ও অবক্ষয়ের পারিপার্শ্বিক এখনো তিনি আঁকেন। এই চৈতন্য আছে বলেই তাঁর লক্ষ্য কোনো ঋষিকল্প সমাহিত প্রশান্তি নয়, তিনি চান 'চির-অস্থির উদাত্ত এক শান্তি / যেমন জেনেছে চণ্ডীদাস বা দান্তে', অথবা যেমন জেনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যাঁর হাত ধরে আত্মবিচ্ছেদের নরক থেকে সত্তার পুরগাতোরিওতে তাঁর যাত্রা। জীবনচর্চা ও কাব্যচর্চা দিয়ে তিনি বুঝেছেন বিচ্ছিন্নতায় নয়, মূলহীনতায় নয়, সত্তাকে পেতে হয় নিজের আবহমণ্ডলে, স্বদেশের মৃত্তিকায়, দেশজ জীবনে, মাতৃভাষায়। তাই, 'জল দাও আমার শিকড়ে'। বিয়াত্রিচে দান্তেকে বলেছিল, সত্যের মূলে যেতে হবে; বিষ্ণু দে উপলব্ধি করেছেন সত্তার শিকড়ে

যেতে হবে। সেই শিকড়ে ফেরার পথ নির্দেশ করেছেন—নিজেকেও নির্দেশ করেছেন, অন্যকেও—বিনীত শান্ত পদাবলীতে—

জেনো, হয়ে গেছে বহু দেরি।
ফেরার সময় বহুকাল
কেটে গেছে, সদাগরী ফেরি
ঘরে গেছে, এখন শৃগাল
ভাবে তারা নেকড়ের পাল।
জেনো হল ফেরার সময়,
মাটিতে ফেরার এল কাল—
শিকড়ে শিকড়ে বেঁধে যাওয়া,
মজ্জায় মাটিতে তাল তাল
নিজের সত্তাকে প্রাণদান।··
মেনে নাও উদ্বাস্তু স্বদেশ,
বুভুক্ষু, বিবিক্ত, অক্ষয়
অমর সে কোটি মুখে কান
দাও, শোনো, বলো : ভালোবাসি।···
তবে কোনো দিন শুভক্ষণে—
অবশ্য করেছো বহু দেরি,
বিশ্বকে মেলাতে পারো ঘরে
নবান্নের মতো আড়ম্বরে। (স্বহস্তে বাজাবে)

—বিনীত শান্ত পদাবলী, কিন্তু তারো মধ্যে অশান্তির শিরা কম্পমান।

সমর সেনের কবিতার ইমেজ

'সমর সেন শহরের কবি, কলকাতার কবি' যিনি সমর সেনের কবিতা পড়বেন তিনিই বলবেন। 'আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি' সমর সেন, একথা বললেও আপাত-দৃষ্টিতে যা চোখে পড়ে তার বেশি বলা হলো না। তিনি বাস্তব-শহরের কবি, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তিনি প্রতীকী শহরের কবি। শান-বাঁধানো শহর যেখানে স্বাভাবিক নিয়মের প্রবর্তনায় কিছু জন্মায় না, যে শহরের উন্মার্গগামী ভিড়ে মানবিক সম্পর্কগুলো হয় অনুপস্থিত নতুবা যান্ত্রিক, জনসঙ্ঘের অস্বাভাবিক অনুপাতের ফলে যেখানে যৌন-অনাচারের বিচিত্র প্রবাহ, সেই শহর বন্ধ্যাত্ব ও নপুংসক ব্যর্থতার প্রতীক। সমর সেন শহরের কবি, কিন্তু যে কোনো শহরের নয়, ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার ফল যে আধুনিক শহর তিনি তার কবি, কারণ তিনি বর্তমান সভ্যতার বিষন্ন বন্ধ্যাত্বের কবি। এই শহরের ধুলোর কণা যেন ক্ষয়রোগের জীবাণু সর্বত্র সঞ্চরমান ক্ষয়রোগের স্বাস্থ্যহীন পাণ্ডুরতা, বিকারগ্রস্তের দুঃস্বপ্ন।

১ আকাশে ধোঁয়ার ক্লেশ, চারিদিকে ধোঁয়ার গন্ধ,
আর হাওয়ায় অসংখ্য ধুলোর কণা
জীবন্ত বীজাণুর মতো। (ঝড়)

২ হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ ;
আর রাত্রি
রাত্রি শুধু পাথরের উপর রোলারের
মুখর দুঃস্বপ্ন। (নাগরিক)

৩ শূন্য মাঠে কোটরহীন চোখের মত গ্যাসের আলো ঝোলে। (ক্রিসমাস)

যে যৌনতা জন্ম দেয় না, সৃষ্টি করে না, প্রেমের সঙ্গে যে

যৌনতার কোনো সম্পর্ক নেই, শহরে সেই বিকারগ্রস্ত যৌনতার বন্ধ্যাত্বের ছবি। অনেক ক্ষেত্রে যৌনতা পর্যন্ত নয়, যৌনতার বিকল্পে অক্ষমের কল্পনায় যৌনাচারের বিচিত্র ছবি রচনা করে কৃত্রিম উত্তেজনার চেষ্টা। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সব কিছুকেই পণ্যে পরিণত করে, সেই ব্যবস্থায় প্রেম যৌনতায় পর্যবসিত, এবং যৌনতা পণ্যে পরিণত এবং তাই এই নরকশহরের গণিকার ভিড়। হয় যান্ত্রিক, নয় বিকৃত যৌনতা অথবা বিকল্প যৌনতা—তারই ইমেজের মধ্য দিয়ে সমর সেন আধুনিক নগরের তথা বর্তমান সভ্যতার অবক্ষয়ী বন্ধ্যাত্বের চেহারা এঁকেছেন। রিকশার উপরে ক্লান্ত চীনে গণিকা চোখ বোজে, শহরের নারকীয় রাত্রিতে মাতালের স্খলিত চীৎকার, লম্পটের পদধ্বনি, ক্লান্ত গণিকার কোলাহল ; পথে পথে ফরাশি ছবির আমন্ত্রণ, তুখোড় ইয়ারের দল, রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল, মাতাল এবং ভোরবেলা চীৎপুরের ঘাটে দেবনখরে লোলচর্ম নিরানন্দ নারীদল। 'কাঁচাডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম, / নারীধর্ষণের ইতিহাস। পেস্তাচেরা চোখ মেলে প্রতিদিন পড়া / দৈনিক পত্রিকায়' (ঘরেবাইরে)। এই বন্ধ্যাত্বের ছবিকে নিরঙ্কুশ করতে চেয়েছিলেন বলেই বোধহয় পৌরপিতাদের কৃপায় শহরে যে সব গাছগাছালি আছে, যে সব ফুলন্তফলন্ত গাছ মাঝে মাঝে দেখা যায় তাদের কোনো অস্তিত্ব সমর সেনের কবিতায় স্বীকৃত হয় নি। শুধু কৃষ্ণচূড়া ছাড়া ; কিন্তু ক্ষয়রোগীর মুখে রক্তাভা যেমন অসুস্থতাই জানায়, তেমনি রুগ্ন শহরে কৃষ্ণচূড়ার অতিরক্তিমা যেন আন্তরিক ক্ষয়কেই প্রচার করে। এই বিকারগ্রস্ত নিস্ফল যৌনতা মানুষে-মানুষে সম্পর্কের সেতু রচনা করে না ; পূর্বেও যেমন সে একা, পরেও তেমনি একা, বরং পরবর্তী একাকীত্ব আরো বেশি বিস্বাদ তিক্ততায় ভরা। শহরের গড্ডলপ্রবাহে নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর চেষ্টায় যে যৌনমিলন, তা নৈঃসঙ্গ না ঘুচিয়ে আরো বেশি প্রখরভাবে একা করে দেয়। পরবর্তী পৃষ্ঠার কয়েকটা চরণে যে মর্মন্তুদ নিঃসঙ্গতার ছবি তার তুলনা অবিরল মেলে না।

প্রান্তরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে
একটি ক্লান্ত শ্বেতাঙ্গিনী আলোয় থমকে দাঁড়ালো ;
তারপর শীর্ণ হাতে
অলস, অলস ভাবে ঠোঁটে মাখালো রঙ,
আর পাউডার মুখে ;
উপরে আকাশে যত দূর চোখ যায়
শুধু নীল অন্ধকার। (মৃত্যু)

নিষ্ফল পরিবেশ প্রভাবিত এই কবি সন্তানজন্ম বিবাহিতপ্রেম ব্যাপারে তীব্র তিক্ততা অনুভব করেন। বন্ধ্যাত্ব যেখানে সার্বভৌম সেখানে জন্ম অসহ্য ব্যতিক্রম, এবং ব্যঙ্গের বিষয়। 'হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও, / কী আনন্দ পাও সন্তান ধারণে ?' (মেঘদূত) অথবা 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্নমুখে / উর্বর মেয়েরা আসে…' (উর্বশী)। 'উর্বর' এই একটি বিশেষণশব্দের মধ্যে কটুতার সমস্ত বিস্বাদ ঢেলে কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন অনুর্বরতাই এই সভ্যতার স্বাভাবিক চারিত্র্য।

তাই সমর সেনের কবিতায় যে সমস্ত পৌরাণিক চরিত্রের উল্লেখ আছে তার মধ্যে অগ্নিবর্ণ ও পাণ্ডুর উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যযুক্ত মনে হয়। রঘুবংশম্ কাব্যে আমরা রাজা অগ্নিবর্ণকে পাই ; সংযত দাম্পত্যজীবন যাপনকারী দিলীপ রঘু ও রামচন্দ্রের বিখ্যাত কল্যাণব্রতী বংশে নিষ্ফল যৌন-যথেচ্ছাচার ও আনুষঙ্গিক সুরায় লিপ্ত হয়ে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন সুদর্শনের পুত্র বংশের শেষ রাজা অগ্নিবর্ণ। অবশেষে মন্ত্রীরা পরামর্শ করে নির্জন উপবনের প্রান্তে অগ্নিকুণ্ডে তাকে নিক্ষেপ করে। সভ্যতার প্রতীক নগরে বন্ধ্যা যৌনাচারের উত্তেজনা যে অপমৃত্যুর দিকে তর্জনী-নির্দেশ করছে একথা বোঝাতে সমর সেন তাই অগ্নিবর্ণের উল্লেখ করেছেন।

নির্জন গুহায় নিবিড় নিষিদ্ধ প্রেম,
ভিজে ফুলের মতো নর্তকীর নরম শরীর,

প্রতীক্ষায় স্পন্দমান কত সঙ্গীত উজ্জ্বল বুক,
তবু আজ মৃত্যু এলো আষাঢ়ের মেঘের মতো,
হে অগ্নিবর্ণ! (অগ্নিবর্ণ)

একই উদ্দেশ্যে সমর সেনের কবিতায় মহাভারতের রাজা পাণ্ডুর উল্লেখ —'আমাদের মৃত্যু হবে পাণ্ডুর মতো।' 'তুমি যে সময়ে স্ত্রী সংসর্গ করিবে, সেই সময়ে তোমার মৃত্যু হইবে', মৃগরূপী ঋষিকুমারের এই শাপে পাণ্ডুর পুত্রোৎপাদনশক্তি প্রনষ্ট হয়েছিল। কিন্তু 'একে বসন্তকাল ও বনের অলৌকিক সৌন্দর্য, তাহাতে আবার অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না রাজীবলোচনা মদ্রাধিপতনয়া একাকিনী সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন, এই সমস্ত দর্শন করিয়া রাজার অন্তঃকরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল, তিনি ক্রমে ক্রমে অনঙ্গশরে অবশচিত্ত হইয়া বলপূর্বক মাদ্রীকে আলিঙ্গন করিলেন। মাদ্রী বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা কোনো মতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি কামশরে বিমোহিত হইয়া মৃগরূপধারী ঋষিকুমারের শাপ একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। দৈব-নির্বন্ধ অখণ্ডনীয়, রাজা বারংবার মাদ্রীকর্তৃক নিবারিত হইয়াও কোনোক্রমে নিরস্ত হইলেন না; সুতরাং অনুল্লঙ্ঘনীয় মৃগশাপবশত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন' (আদি। ১২৫)। নগরের নরনারীর বন্ধ্যা নিষ্ফল রতিক্রিয়া, পণ্যপ্রেম, রিরংসার উত্তেজনা সমস্তই ইঙ্গিত করছে বিস্তীর্ণ নগর যে আধুনিক সভ্যতার প্রতীক সেই সভ্যতার অবক্ষয় ও আসন্ন অপমৃত্যুর দিকে।

অবক্ষয়িত ঘুণধরা সভ্যতার প্রতীক হিসাবে রুক্ষ বিষণ্ণ শহর বড় বেশি প্রত্যক্ষ, আমাদের বড় বেশি নিকটের। তাই সেই অবক্ষয় বা নির্বেদ বোঝাতে সমর সেন শুধু নাগরিক জীবনের ইমেজ ব্যবহার করেন নি, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রজাতীয় ইমেজ তিনি ব্যবহার করেছেন একই উদ্দেশ্যে। পতিত জমি, বন্ধ্যাভূমি, সন্তপ্ত শিমূমে-তাড়িত ক্যাকটাস-ফণিমনসায় পূর্ণ মরুভূমির ইমেজ যখন এলিয়ট থেকে সুধীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলের কবিতায় জীবনবিরোধী সভ্যতার প্রতি অনীহাপ্রকাশে

ব্যবহৃত হচ্ছিল বারবার, তখন উত্তরসূরী সমর সেন সেই ইমেজ-গুলিকেই ঋণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। মরুভূমি তার বিস্তার, জ্বালা, অস্তশ্বাস, বালুর অনুর্বর নিষ্ফলতা নিয়ে হয়ে উঠেছে বন্ধ্যা বিষণ্ণ শহরের মতোই অন্তঃসারশূন্য, অনুর্বর, নির্বেদময় বর্তমান অবস্থায় কবির মানসিকতার অবজেকটিভ কো-রিলেটিভ। এই ইমেজগুলির পুনরাবৃত্তি সেই মৌলিক পরিস্থিতিসমূহের দিকে ইশারা করে, যেদিকে আঙুল দিয়ে দেখায় ক্ষয়রোগগ্রস্ত নগর।

১ সেই চুল, সেই গভীর চোখ, নরম শরীরে
সেই পুরোনো মরুভূমির ব্যাকুলতা…। (চার অধ্যায়)

২ নদীর জোয়ারে, অন্ধকারে তিলে তিলে পৃথিবী মরে
বুঝি, পিঙ্গল বালুচর সর্বভুক, অবিনশ্বর। (রোমন্থন)

৩ কঙ্কাল গাছ হাতছানি দেয়।
প্রখর রৌদ্রে
মরুভূমি আমাদের ঘেরে । (শবযাত্রা)

৪ আমাদের পিরীতি বালুর বাঁধ,
গণিকার প্রেম আমাদের উজ্জ্বল পৃথিবী। (চিত্রাঙ্গদা)

শেষ উদ্ধৃতির একটি বাক্যে অনুর্বর বালুরাশি, আর ধনতান্ত্রিক সভ্যতার পণ্যপ্রেমের ক্ষণিক নিষ্ফলতাকে গেঁথে দেওয়া হয়েছে, এবং তাতেই বোঝা যায় কেন বালুময় মরুভূমি এই সভ্যতার উপযুক্ত উপমা। মরুভূমির যে উদ্ভিদ তার মধ্যেও প্রাণের রসস্রোত নেই, সেও বন্ধ্যা ধূসর, কণ্টকময়, বর্ণবিবর্জিত এবং গ্রোটেস্ক। 'কুটিল ফণিমনসা হাসে…' (ঘরে বাইরে)। 'হলুদ বালি দিনরাত্রি জ্বলে, দূরে ফণিমনসার ঝাড়। / ফেরার হাওয়ায় শুনি ক্রমশ নিঃশব্দ গান / আমার এ মরুভূমি বসন্তের বাগান' (নানা কথা)। 'আমাদের বাগানে বাড়ে ফণিমনসার ঝাড়…' (পঞ্চমবাহিনী)। 'রসহীন ফণিমনসায়, রুক্ষ বালুতে / প্রাণের প্রতিরোধে চক্রান্ত চলে' (শবযাত্রা)। শেষ উদ্ধৃতিটিতে কবি যেন ইমেজের উপর বলার সব দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত

হতে পারেন নি, দ্বিতীয় চরণে ইমেজের পরোক্ষতা প্রত্যক্ষবাদী হয়েছে। কবিতার ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু মরুভূমি-ফণিমনসা ইত্যাদি ইমেজ-ব্যবহারের কারণ সম্বন্ধে যদি সন্দেহ এতটুকুও থেকে থাকত তবে তা অপসৃত হয়েছে।

যেখানে ফণিমনসা নেই সেখানে তুল্য কোনো রুক্ষ ব্যর্থতার ছবি। একটা কবিতায় নিষ্পত্র বটের ইমেজ একটু বিচিত্রধরনের।

> একটি একলা বট থাপছাড়া ছায়া দেয়,
> প্রায় পত্রহীন সে প্রৌঢ়বট, বহুকাল মাখে নি সবুজ কলপ,
> কিন্তু তার শিকড়েরা ঊর্ধ্বমুখ, আকাশ সন্ধানে। (জোয়ার ভাঁটা)

নিঃসঙ্গতা, পত্রহীনতা, অকাল প্রৌঢ়তা সবই এই জগতের সঙ্গে মানানসই, কিন্তু শেষ চরণটা বেমামান মনে হয়। এখানে উপনিষদের সেই অমর্ত্যবৃক্ষের অনুষঙ্গ পাই, যার কথা সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন 'যযাতি' কবিতায়—'ঊর্ধ্বমূল, অধঃশাখ, দুর্নিরীক্ষ্য সেই মহীরুহ'। কিন্তু সেই অনুষঙ্গ সমর সেনের কবিতার জগতের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক। অন্যত্র নিঃসঙ্গ প্রৌঢ় বটগাছের ইমেজে অবশ্য এই অসঙ্গতি নেই। 'নিঃসঙ্গ বট / যেন পূর্বপুরুষের স্তব্ধ প্রেত' (পলাতক)। 'দিগন্তে ধূসর মাঠে গতপত্র বট / মাথা নাড়ে প্রবীণ ক্লান্তিতে' (বিকলন)। 'ধুলো ওড়ে, নেড়া বট মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে / গতপত্র ক্লান্ত ভঙ্গিতে' (জন্মদিনে)। নাগরিক একাকীত্ব, জরাগ্রস্ততা এবং নির্বেদের প্রতীক শুধু এই বটগাছ নয়, সে দর্শকও বটে; ভাঙনের মাঝখানে প্রতিরোধে অক্ষম ও নিশ্চেষ্ট, নির্লিপ্ত দর্শক। বিশুদ্ধ চৈতন্যের প্রতীকও সেই বট সম্ভবত।

আগে সমর সেনের কবিতায় পাণ্ডুর উল্লেখ করেছি। আর, প্রবীণ গতপত্র নিঃসঙ্গ ক্লান্ত বটের প্রসঙ্গে মনে হয় পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের কথা, যার উল্লেখ সমর সেনের কবিতায় অনেকবার পাচ্ছি। পাণ্ডুর অসংযত ব্যর্থ যৌনাচার, আর ধৃতরাষ্ট্রের সজ্ঞান অন্ধতা, এই দুইয়ে মিলে সভ্যতা সবেগে চলেছে অনিবার্য ধ্বংসের পথে। যে

ন্যাড়া বট 'মাথা নাড়ে প্রবীণ ক্লান্তিতে' তার মধ্যে বৃদ্ধ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের অক্ষমতা প্রতিমূর্ত।

১ বহু পাপে সিদ্ধ এক মোক্ষহীন বৃদ্ধ
দন্তহীন কান্নায় বিলোল মাড়িতে
মৃত যৌবনের পাশে আগত চকিতে—
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র! (ক্রান্তি)

২ শকুনি-চক্রান্ত শেষ, শঙ্কিত সঞ্জয়
বিবর্ণ প্রাসাদে ফিরে, সঞ্চিত স্বার্থের প্রতীক
লবেজান ধৃতরাষ্ট্রকে সভয়ে জানায়
পুনরুজ্জীবনের বার্তা সাধারণ লোকের। (লোকের হাটে)

৩ তাই ঘরে বসে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিচলিত শুনি,
আর অব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলি :
আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই। (একটি বুদ্ধিজীবী)

ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধতা কৌরবের পরাজয়ের মৌলিক কারণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সর্বনাশের জন্যেও দায়ী তার অন্ধতা। নিঃসঙ্গ বটগাছ এবং জরাগ্রস্ত কুরুরাজ যেমন সভ্যতার ভাঙন-গড়নের, সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের নির্লিপ্ত দর্শক, শূন্য চৈতন্যের প্রতীক, তেমনি বটগাছ এবং ধৃতরাষ্ট্র নিরাসক্ত এবং অসম্পৃক্ত বুদ্ধিজীবীর প্রতীক। আমরাই পাণ্ডু, আমরাই ধৃতরাষ্ট্র, অক্ষম এবং অন্ধ; সৃষ্টিতে অপারগ এবং প্রলয়-প্রতিরোধে অসমর্থ।

ধৃতরাষ্ট্র যেমন গুরুজন ও পার্শ্বচরদের পরামর্শ অবহেলা করেছিল, সর্বনাশ সমুৎপন্ন জেনেও চৈতন্যকে বৃথা স্তোকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, কিছু ঠিক হবে না জেনেও সব ঠিক হয়ে যাবে এই বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল, তেমনি এই কবিপুরুষও সভ্যতার আশু ধ্বংসের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মাঝে মাঝে পলায়ন করতে চেয়েছে গোপগাথার পরিবেশে। মাঝে মাঝে এই কবিতার বিষাদমণ্ডলে তাই 'সাঁওতাল পরগণার নিঃসঙ্গ স্তব্ধতার' ছায়া পড়ে। 'আমার ক্লান্তির

উপরে ঝরুক মহুয়া ফুল,/নামুক মাহুয়ার গন্ধ' (মহুয়ার দেশ)। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের পর জেনেছিল, সুধীন্দ্রনাথ যে কথা জেনেছেন, 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?' আর এই বিমুখ প্রলয়োন্মুখ জগৎ থেকে যেখানে 'নির্জন গ্রামে কুঁড়ে-ঘর, পোষা মুরগির ডিম, খেতের ধান', সেখানে পলায়নের চেষ্টা যে পরিহাসের ব্যাপার একথা সমর সেন জানেন না তা নয়, তাঁর বিদ্রূপপ্রখর চোখ পরিহাসের সুযোগ পেলে নিজেকে নিয়েও পরিহাস করতে ছাড়ে না। 'দুর্মুখ পৃথিবীকে পিছনে রেখে/তোমাকে নিয়ে কোথাও সরে পড়ি' (নিরালা)। 'সরে পড়ি'—এই প্রস্তাবের ভঙ্গিমার মধ্যেই সরে পড়াটা কতো অসঙ্গত, অন্যায় আর হাস্যকর তার ইশারা রয়েছে। অন্য জায়গায় বলেছেন, 'পলায়ন জীবিকা আমার'—আর একথার মধ্যে আছে আত্মধিক্কার। কবি জানেন, সাঁওতাল পরগণার মহুয়া ফুল হাতছানি দিলেও আমরা যখন ধ্বংসের মুখোমুখি তখন পলায়নের প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছু গৌরবের ব্যাপার নয়। এই বুদ্ধিমান কবিস্বভাব চৈতন্যের বৈকল্যকে অণুমাত্র প্রশ্রয় দেয় না বলেই, সমর সেন, বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় 'রোম্যান্টিক হবার ভরপুর ইচ্ছে নিয়েও রোম্যান্টিক হতে পারেন নি।' স্বীয় এবং স্বশ্রেণীর চরিত্রের আত্মবিরোধকে তিনি বিদ্রূপে ছিন্নভিন্ন করেন।

মুখে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বুলি,
মনে রোম্যান্টিক বুলবুলের অবিরত গান
তুমি ছিলে তারি একজন।
এ অধমও তারি একজন। (কয়েকটি মৃত্যু)

এই অংশ সম্বন্ধে অবশ্য একটা মন্তব্য প্রাসঙ্গিক। ফরাশি বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণীর সঙ্গে রোম্যান্টিক মানসের কোনো বিরোধ নেই, বরং তারা পরস্পর মিত্র ও সহায়ক। তাহলে কবি কেন বিরোধের কথা বলেন? তিনি যখন মুখে আর মনে বিরোধ দেখতে চেয়েছেন তখন, অনুমান করি, তিনি সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা বলতে

মার্কসীয় মতবাদ বোঝাতে চেয়েছেন—বলতে চেয়েছেন মার্কসবাদের সঙ্গে রোম্যান্টিকতা পরস্পরবিরোধী।

বন্ধ্যা পরিবেশে কবি অনুভব করেন ক্লান্তি, নপুংসকতা এবং দীর্ঘকালীন নির্বেদজনিত চাপা হিংস্রতা। যৌনাচারে ক্লান্ত, বন্ধ্যাত্বে নিষ্ফল, যান্ত্রিকতায় অসাড়, নির্বেদে নিঃসঙ্গ, সভ্যতায়, শহরে বা সেই সভ্যতারই দূর প্রতীক মরুভূমিতে—চাপা হিংসা, বিস্ফোরক রাগ হঠাৎ ফেটে পড়ে—'অনুর্বর বালুর উপরে/কর্কশ কাকেরা করে ধ্বংসের গান' (ঘরে বাইরে)। এই পাশব হিংস্রতার আত্মপ্রকাশ সমর সেনের কবিতায় রূপ পায় ভীষণমূর্তি নানান প্রাণীর ইমেজের মধ্য দিয়ে। কোথাও 'বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে/তোমাকে পাবার বাসনা' (প্রেম)। অন্যত্র 'হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এলো…' (মুক্তি)। কোথায়ও বা পাই 'রাত্রির দিগন্তে ঘুরে ফিরে/আদিম জন্তুর মতো বিরাট মেঘ' (অগ্নিবর্ণ)। আরো কয়েকটা নিদর্শন দিই—'দুপুরের খর সূর্যে ক্লান্ত মহিষের পদক্ষেপ…' (ঝড়)। 'মধ্য দিনের সূর্য, মনে হয়/এক অতিকায় তৃষ্ণার্ত মহিষের চোখ/শূন্য থেকে এক মনে জলাশয় খোঁজে…' (ক্রান্তি)। 'বন্য মহিষের আক্রোশে জগদ্দল মেঘ ঘন ঘন ডাকে' (লোকের হাটে)। 'উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন/এপ্রিলের বসন্ত আজ' (চার অধ্যায়)। 'রাত্রে চাঁদের আলোয় শূন্য মরুভূমি জ্বলে/বাঘের চোখের মতো' (স্বর্গ হতে বিদায়)। সব শেষের উদ্ধৃতিটায় সভ্যতার শূন্যতা এবং শূন্যতাজনিত হিংস্রতা সংযুক্ত হয়ে গেছে। অনুর্বর সভ্যতার মরুভূমি জ্বলে, জ্বলে হিংস্র বাঘের চোখের মতো চাপা বিস্ফোরণোন্মুখ হিংস্রতায়। কঠিন পায়ে উঠে আসে হলুদ রঙের চাঁদ, কিন্তু সেই পিঙ্গল পাণ্ডুর চাঁদের মধ্যেও আজ অবরুদ্ধ হিংসার আভাস লেগেছে, আকাশে এখন চাঁদ ওঠে জ্বলন্ত খড়্গের মতো।

চারিদিকে ক্ষুধার্ত দীপ্তি, হিংস্র হাহাকার, চোখে চোখে বাসনার

বিষণ্ণ দুঃস্বপ্ন, কানে আসে সুদূর দিগন্তের কান্না, আকাশে কঠিন নিঃসঙ্গতা, রক্তে অগণিত কত প্রহরের ক্রন্দন, স্পন্দমান দিনগুলি যেন দুঃস্বপ্ন। রাত্রিশেষে কলের বাঁশির তীক্ষ্ণ হাহাকার, সন্ধ্যা নামে শীতের শকুনের মতো, চতুর্দিকে অথচ শাড়ি আর তাড়ির উল্লাস, ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক, বিগলিত বিষণ্ণতায় ক্ষুরধার স্বপ্ন দেখে কার্জন পার্কে বক্রদেহ নায়কের দল—অর্থাৎ দুঃস্বপ্ন ও দীর্ঘশ্বাসে ভরা চতুর্দিকে নারকীয় মিছিল। কিন্তু কেন এই বিবমিষায় পূর্ণ, ক্লান্ত বিবর্ণ হিংস্র বন্ধ্যা, কামাচারে—ন্যক্কারজনক নরকের সমাবেশ, তার কোনো কারণ নির্ণয়ে সমর সেন প্রথম দিককার কবিতায় চেষ্টা করেন নি। কোনো নির্দিষ্ট প্রত্যক্ষগোচর যুক্তিভিত্তিক কারণের প্রতি নির্দেশ না করায় সেই অনির্দেশ্য-কারণ দুঃস্বপ্নের কবিতার মধ্যে ভাষা পেয়েছে যেন সভ্যতার দীর্ঘশ্বাস, সার্বভৌম হাহাকার—অভিজ্ঞতা-প্রবীণ যৌবনের বেদনা, ব্যর্থপ্রণয়ের যন্ত্রণা এবং পরিবেশজনিত জুগুপ্সা। ব্যক্তিগত হাহাকারে স্বর পেয়েছে সভ্যতার আর্তনাদ। প্রথম দিকের কবিতার কোনো কিছুর কোনো নির্দিষ্ট কারণ নেই, সব কিছু অনির্দেশ্য বলেই তার মধ্যে একই সঙ্গে 'নবযৌবনের বিষণ্ণমধুর দীর্ঘশ্বাস' অন্য দিকে সভ্যতার অবক্ষয়ের বেদনা।

১ বাতাসে ফুলের গন্ধ
আর কিসের হাহাকার। (একটি রাত্রির সুর)

২ রজনীগন্ধার আড়ালে কী যেন কাঁপে,
কী যেন কাঁপে
পাহাড়ের স্তব্ধ গভীরতায়। (বিরহ)

৩ সে চোখে নেই নীলার আভাস, নেই সমুদ্রের গভীরতা,
শুধু কিসের ক্ষুধার্ত দীপ্তি, কঠিন ইশারা,
কিসের হিংস্র হাহাকার সে চোখে। (নাগরিকা)

৪ মোড় ঘুরে দক্ষিণের পথ ধরলাম,
চারিদিকে আকাশ মেঘমদির,
আর কিসের দীর্ঘশ্বাস—। (ঝড়)

৫ ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন। (মহুয়ার দেশ)

৬ খাপছাড়া ঘুমে দূরে শুনি জোয়ারের জল,
কিসের কল্লোল। (ক্রিসমাস)

'কিসের কল্লোল'—এই সংশয়, এই অনিশ্চয়তা সমর সেনের কবিতার প্রথম পর্যায়ে ছিল। কিন্তু ক্রমেই সংশয় কেটে গেছে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো অন্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একজন হওয়া সত্ত্বেও, মরুভূমি যে-সভ্যতার প্রতীক, সেই সভ্যতার বিনাশ যে অনিবার্য একথা সমর সেনের কবিতায় ক্রমেই ধরা পড়েছে। ধ্বংসোন্মুখ এই মরুভূমি কেন অনুর্বর তারও জবাবের আভাস আসছে কবিতার ইমেজে—'আরও সমস্ত ক্ষণ জ্বলে/ বণিকসভ্যতার শূন্য মরুভূমি' (একটি বেকার প্রেমিক)। বণিক সভ্যতার অনুর্বর শূন্য মরুভূমির উপর কালজ্ঞানী কর্কশ কাক ধ্বংসের গান করে, এখন কবি বোঝেন দূরাগত এই কল্লোল বিপ্লবের পথে অগ্রসর জনসংঘের কল্লোল। ১৯৩৪-৩৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ের কবিতাবলীর মধ্যে কোনো রাজনৈতিক সামাজিক প্রোগ্রাম নেই, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের কোনো কার্যক্রম নেই, সেই পর্যায়ে শুধু অনির্দেশ্য ব্যর্থতার হাহাকার, ক্রন্দন, দুঃস্বপ্ন ও বিষণ্ণতা। ১৯৩৭-৪০-এর মধ্যবর্তী পর্যায়ে দুঃস্বপ্নময় সভ্যতার জ্বর থেকে, বন্ধ্যাত্ব থেকে উদ্ধারের প্রথম ইঙ্গিত এলো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কার্যক্রমে—'কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী/যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে…' (ঘরে বাইরে)। একই শিরোনাম অন্য কবিতায়, 'পৃথিবীর বদরক্ত বের হোক/অস্ত্রোপচার নিতান্ত প্রয়োজন…।' এখন থেকে কবিকণ্ঠ রাজনৈতিক শ্লোগানে ক্রমেই কর্কশ ; চীৎকারে গলা ভেঙে যায় অথচ স্থায়ী প্রতিক্রিয়া মনে রেখে যায় না। এখন থেকে প্রত্যক্ষভাষণের বহুলতা, আর ইমেজের বিরলতা।

১৯৪০ সালের পর থেকে রচিত কবিতাগুলোর অনেক চরণ মনে হয় যেন হুবহু বিপ্লবপন্থা রাজনৈতিক দলের প্রচার পুস্তিকা থেকে

তুলে নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক দল যেভাবে দেশের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে, ঠিক সেই ভাষায় সেই ধরনে সমর সেন এই পর্যায়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন, অবক্ষয়ের কারণ নির্দেশ করেন।

১ রক্ত আশ্বিনে রুষ বিপ্লবের পর
মধ্য ইউরোপে
জারজ সন্তানকে সঙ্গোপনে রসদ জোগায়
মাতা তার, দাঁতচাপা বৃদ্ধা গণিকা
পশ্চিমী গণতন্ত্র নাম। (নানাকথা)

২ তামাম দুনিয়ায় চলে প্রতিবিপ্লবের ব্যভিচার
সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ অনেক দিনেই করেছি বরবাদ···। (বসন্ত)

৩ আমরা বাঙালী ; মীরজাফরী অতীত, মেকলের
বিষবৃক্ষের ফল। (পঞ্চমবাহিনী)

এবং সমস্যা-সংকটের সমাধানও রাজনৈতিক। বৈপ্লবিক কর্মপন্থা উদ্ধারের একমাত্র উপায় এবং উদ্ধারের সেই পথ কবিতায় নির্দেশিত হয়েছে রাজনৈতিক দলের প্রচারপুস্তিকার ভাষায়—এখন 'হারামী বণিক', 'বৈশ্য সভ্যতার জারজ সন্তান', 'শেঠির দালাল', 'জিন্দগী', 'দুশমন', এই সব শব্দে ও বাক্যাংশে কবিতা রচিত। এখন ভাষার শুচিতা (শুচিবায়ুগ্রস্ততার কথা বলছি না), ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা এবং ইমেজের পরোক্ষতা আর অবশিষ্ট নেই। সে উচ্চকণ্ঠের প্রত্যক্ষভাষণে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-অনুভূতির লেশ নেই, যেন সেগুলি উত্তেজিত বহুজন-সমাবেশে রাজনৈতিক সভায় গৃহীত প্রস্তাব। 'অপরের শস্যলোভী পরজীবী পঙ্গপাল/পিষ্ট হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে' (নানা কথা)। অথবা 'ধানক্ষেতে কাস্তে-হাতে কিষাণ,/হাতুড়ি বাজে কামারশালে,/সবুজ আগুন জ্বলে অনেক মাঠে' (ইতিহাস)। আর একটা উদাহরণ—'কারখানায় সংঘবদ্ধ জমে অনেকের ভিড়/হাতে বিপ্লবের রাখী' (ক্রান্তি)। এই ক্রান্তিকালে যখন 'সমাজে মধ্যপদ

ধীরে ধীরে লোপ পায়', যখন কবি বোঝেন 'আমাদের শ্রেণী লবেজান' তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই মানুষ স্বশ্রেণীকে পরামর্শ দেন—'ঘুণধরা আমাদের হাড়,/শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু/আশা 'আছে বাঁচবার' (গৃহস্থবিলাপ)।

যে ইমেজগুলি যেন জীবনের দীর্ঘশ্বাসের বাক্‌প্রতিমা ছিল সেই ইমেজের অনর্গল স্রোত যখন থেকে স্তিমিত হতে-হতে একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল, তখন থেকে সমর সেনের কবিতা শক্তির উৎসে নিঃসম্বল হয়ে ক্রমেই দরিদ্র হয়ে উঠলো। 'রাজনৈতিক মতামত কবিতার বিষয় হতে পারে কিছু কিছু সময়ে, সেখানে বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শে কবির গভীর প্রত্যয় গোষ্ঠীর গণ্ডি কাটিয়ে সার্বভৌমত্ব পায় এবং অবিশ্বাসীর মনেও অন্তত কবিতা পড়ার সময় অস্থায়ী আস্থা জায়গা। কিন্তু সমর সেনের মধ্যে সেই প্রত্যয়ের নিষ্ঠা ছিল বলে মনে হয় না। থাকলেও বুদ্ধির স্তরে ছিল, উপলব্ধির স্তরে পৌঁছায় নি। তাছাড়া কবি সমর সেনের মনের স্বভাব স্কেপটিক বুদ্ধিজীবীর—যে আপ্রাণ বিশ্বাস করতে চায় অবিশ্বাস্যের খাদের সামনে পায়ের তলায় মাটি পাবার জন্যে, কিন্তু মনের স্বভাবে যে সংশয়ী বলে সমস্ত বিশ্বাসে তার অচিরেই ঘুণ ধরে। সুতরাং যত জোরেই তিনি সাম্যবাদের শ্লোগানে গলা মেলান, অন্তত কবিতায় নিজের অবিশ্বাসের প্রমাণগুলো গোপন থাকে না। শেষ পর্যায়ে সমর সেন নিজের অবিশ্বাসী স্বভাবকে চোখ ঠেরে বিপ্লবের পক্ষাবলম্বন করেছেন বটে, কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। বিশ্বাসের অভাবে বক্তব্য কল্পনার দ্বারা আক্রান্তহতে পারেনি এবং হতে পারে নি বলেই এখানে কবির কথা ইমেজে শরীরী হয় নি, প্রত্যক্ষ ভাষণের দরিদ্র নগ্নতায় উপস্থিত হয়েছে। মুষ্টিবদ্ধ হাত এবং মিছিলের চীৎকারকে কবিতায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে যা হয়েছে তাকে কবিতা বলা চলে না, তার মধ্যে বিশুদ্ধ গদ্যের সম্ভ্রমও নেই—তার মধ্যে পাই সাংবাদিকতার জ্যোতিহীন আড়ম্বর। এই চরণগুলোকে কে কবিতার চরণ বলবে—'সাম্রাজ্যবাদের

এই নাভিশ্বাস মুহূর্তে/প্রতি বিপ্লবের ঝঞ্চাবাহিনী/দেশে দেশান্তরে নতুন সাম্রাজ্য প্রয়াসী' (খোলা চিঠি)। অথচ যে কবিতাগুলির জন্যে সমর সেন কবি, সেই কবিতাগুলোর ইমেজেই ছিল সেই জাদুমন্ত্র যার ফলে 'তাঁর গদ্যছন্দ বাংলা ভাষায় অভিনব' মর্যাদা লাভ করেছে। এই সব ইমেজের জন্যই এই গদ্যছন্দের রচনাগুলো নিঃসংশয়ে কবিতা হয়ে উঠেছে—'এখানে সন্ধ্যা নামল শীতের শকুনের মতো', এবং 'নামহীন ফুলের অদ্ভুত চাপা গন্ধ/মুহূর্তগুলির নিঃশব্দ কান্নার মতো।'

নিষ্ফল যৌনতা ও মধ্যবিত্ত অন্ধতার অনেক চিত্র কবি এঁকেছেন; বলেছেন পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের কথা, যে দুইজনের অপরাধে কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশান। কিন্তু সেই পথে পুনরুক্তিপরায়ণ না হয়ে সমর সেনের নতুন কিছু করণীয় ছিল না। সমর সেন বড় কবি হতেন, তাঁর কবিতার অগ্রগতি সম্ভব হতো, যদি এই বন্ধ্যা নরক থেকে তিনি কোনো মানবিক বিশ্বাসে উদ্ধারের পথ পেতেন, প্রেমে বা ঈশ্বরানুরাগে বা অন্য কোনো শাশ্বত সুদীর্ঘ-প্রসারিত সরণিতে। দান্তে-নন্দিত যে 'প্রেমের মন্ত্রে চলে চরাচর সূর্য চন্দ্র তারা' সেই প্রেমে বা যে ধর্মবিশ্বাস বন্ধ্যাভূমির নপুংসক রাজার রাজত্ব থেকে এলিয়টকে উত্তীর্ণ করেছিল। কিন্তু সমর সেনের সংশয়ী বুদ্ধিজীবীর স্বভাব এই সব বিশ্বাসকে বিদ্রূপে খান্ খান্ করে—প্রেম এখানে 'ম্যাকারিনের মতো মিষ্টি' অথবা দেহসম্ভোগের নামান্তর। সমর সেনের ভুবনে ঈশ্বর অনুপস্থিত; উপস্থিত ব্যঙ্গের শিকার হিসেবে কদাচিৎ—'প্রভুর বন্দনা শুনি বেনের ভবনে'। উদ্ধারের পথ তিনি বেছে নিলেন সাম্যবাদী রাজনৈতিক দলের কর্মপন্থায়—'দুনিয়া কো কিষাণ মজদুর মজদুর কিষাণ এক হো' শ্লোগানে-শ্লোগানে মুখরিত হলো তাঁর কবিতা। স্টালিনগ্রাডের প্রতিরোধে, লালবাহিনীর বিজয় বার্তায় মনে হলো সর্বসমাধান এসে গেল বুঝি হাতের মুঠোয়! কিন্তু জন্ম-অবিশ্বাসীর কোনো বিশ্বাস স্থায়ী হয় না, আর আন্তরিক শূন্যতা পূরণ করতে পারে না কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রম—বরং

সেই শূন্যতাকে ভুলে থাকার বিকল্প উপায় কবিতায় রাজনৈতিক তার-স্বরকে আরো চড়া সুরে বেঁধে দেওয়া। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এই কবি তমসায় বদ্ধমূল। বন্ধ্যাত্বের মানচিত্র আঁকতে-আঁকতে শেষ পর্যন্ত কবিও বন্ধ্য হয়ে গেলেন, প্রস্থান করলেন মৌনের নিরঞ্জনে। নতুন কিছু বলার নেই, নতুন কিছু বিশ্বাস নেই, সুতরাং নাগরিক মরুভূমির ইমেজে-খচিত বন্ধ্যাসভ্যতার চিত্রের পুনরাবৃত্তি করে কী লাভ? পুনরুক্তি না করে, সংশয়কে বিকল্প বিশ্বাসে প্রথমে ঢাকার চেষ্টা করে, এবং পরে সেই চেষ্টা পরিত্যাগ করে, কবি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এই মৌনের সিদ্ধান্তে বোঝা যায় সমর সেন তাঁর সাফল্যের সীমা জানতেন; নিজের সফল পুরাতন রচনার চর্বিতচর্বণে রাজী না হয়ে তিনি কবিচরিত্রের দৃঢ়তার এবং নির্লিপ্ততার প্রমাণ রেখে গেছেন। আত্মরচনার প্রতিধ্বনিতে মুখর পরিবেশে এই জাতীয় সততা বিরল বলেই শ্রদ্ধেয়।

'সমর সেনের কবিতা' সংকলনের শেষ কবিতা 'জন্মদিনে'-র দ্বিতীয় অংশটি উদ্ধারযোগ্য। কোন্ কোন্ জগৎ থেকে কবি তাঁর ইমেজগুলি আহরণ করেছিলেন তার বিবরণ সেই অংশে আমরা পাই। যেদিন সেই ইমেজের অনর্গল স্রোত স্তিমিত অবরুদ্ধ হয়ে এলো, কবিতায় এলো প্রত্যক্ষভাষণের চড়াগলা, সেদিন থেকে কবিতা পদ্যের স্তরে নেমে এলো এবং একদিন সেই নিঃসম্বল কবিত্বের দিকে তাকিয়ে সেই ধারাকে কবি নিজেই থামিয়ে দিলেন। যৌবনের সপ্রেম আসক্তি নিয়ে যে জরাগ্রস্ত অবক্ষয়িত পৃথিবীর দিকে সমর সেন তাকিয়েছিলেন, তার প্রতি তিনি সানুরাগে শেষবারের জন্যে ফিরে তাকিয়েছেন, নিজের অন্তর্হিত কবিত্বের উদ্দেশে এই এলিজি রচনা করেছেন এবং বিদ্রূপপটু এই কবি শেষ পয়ারে নিজেকে এবং উদ্ধারচেষ্টার অন্তঃসার-শূন্যতাকে ব্যঙ্গ করে অন্তরালে প্রস্থান করেছেন।

> শুনি না আর সমুদ্রের গান
> থেমেছে রক্তে ট্রামবাসের বেতাল স্পন্দন।

ভুলে গেছি সাঁওতাল পরগণার লাল মাটি
একদা দিগন্তে দেখা উদ্ধত পাহাড়,
বাইজীর আসরে শোনা বসন্তবাহার।
ভুলে গেছি বাগবাজারী রকে আড্ডার মৌতাত,
বালিগঞ্জের লপেটা চাল,
আর ডালহাউসীর আর ক্লাইভ স্ট্রীটের হীরক প্রলাপ,
ডকে জাহাজের বিদেশী ডাক।
রোম্যান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়।

যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে।
বছর দশেক পরে যাবো কাশীধামে॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

তিরিশ বছরেরও বেশি আগে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন সঙ্গত কারণেই সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সাড়া পড়ার একটা কারণ ছিল ঐতিহাসিক, অন্য কারণ কারু-রীতিগত। এই প্রথম একজন কবি রাজনৈতিক দলের মতবাদ পুরোপুরি মেনে নিয়ে, সেই মতবাদে দীক্ষিত হয়ে, দলভুক্ত রাজনীতির প্রতিনিধি হিসেবে বাংলায় কবিতা লিখলেন। সাম্যবাদের ছাপ বাংলা কবিতায় অবশ্য আগেই পড়েছিল, নজরুল অগ্নিবীণা বাজিয়েছিলেন, ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সময় বুদ্ধদেব বসুর মতো একান্ত প্রেমের কবিও লিখেছিলেন 'বৃহন্নলা, ছিন্ন করো ছদ্মবেশ'—কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রে সাম্যবাদ একটা ভাবালুতাপূর্ণ অনুষঙ্গ জাগিয়েছিল মাত্র। আর সেই সাম্যবাদের অস্তিত্ব লেনিনের রচনায় ছিল না, ছিল কবিদের কল্পনায়, মানবিক সহানুভূতিতে, বিমুখ বিশ্ব বিষয়ে কবিদের বিরূপতায়। এই অবস্থায় 'পদাতিক' হাতে নিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ ঐতিহাসিক।

এমন একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন অথচ স্ববশ সুর বাংলা কবিতায় শোনা গেল যা অনেক দিন শোনা যায় নি। এমন রাজনৈতিক এক মতবাদ তাঁর কবিতার বিষয় যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে মর্যাদা দেয় না, যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এতদিনকার রোম্যান্টিক গীতিকবিতার প্রেরণা। তাছাড়া, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রেমকে তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তুর সম্মান দিলেন না। বরং সানন্দে ঘোষণা করলেন 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য', অনেকটা লেনিনের উদ্দেশে লেখা মায়াকোভস্কির কবিতার ধরনে 'now's no time for a lover and his loss'।

আর অন্য কবিরা যখন অবক্ষয় আর ভাঙনের ছবি আঁকতে ব্যস্ত, তখন সুভাষ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত আন্তরিকভাবে যুদ্ধের সজ্জা পরবার আবেদন জানালেন। তাঁর মুখ ভবিষ্যতের দিকে ফেরানো। সব শেষে কবিতাবলীর মধ্যে এমন একটা কিশোর-সুলভ অকুতোভয় উল্লাস আছে যা সংক্রামক। সুতরাং আবির্ভাবমাত্রেই এই কবির যে জয়জয়কার হবে এ তো স্বাভাবিক।

অথচ ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিশোর-সুলভ দর্পিত দ্বিধামুক্ত আত্মবিশ্বাস, ছাত্র-মজুরের উজ্জ্বল মিছিলে যোগদানের সংক্রামক উল্লাস যিনি প্রকাশ করলেন, তিনিই একসঙ্গে দেখলাম কলাকৌশলের ব্যাপারে কী প্রবীণ এবং পরিমিত। কৈশোরে 'স্বভাব-কবির অভাব' হয় না, স্বতোৎসারিত কাব্যোচ্ছ্বাসই এই বয়সে স্বাভাবিক। কিন্তু তির্যক ঘন বাক্যাংশবদ্ধ ব্যঙ্গে ('মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবে না'; 'আদালত সচ্চরিত্র'), প্রবাদের ব্যবহারে ('বাহান্ন হাতির শুড়ে হাঁচিগ্রস্ত অহিংস শকট', আস্ত বাংলা ইডিয়াম চরণের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ায় ('স্বখাত সলিলে কথিত যখন ধ্রুব নিধন'; 'হা! হতোস্মি সড়কে বেঁধেছি ডেরা'), গদ্যধর্মী শব্দ ব্যবহারে ; 'স্বপ্নের ভাঁড়'; 'যুক্তরাষ্ট্রের মেঠাই'), সংলাপের হাল্‌কা চালে ('সাবাস বল্লভভাই, প্রকাশ্যেই নেড়ে দিলে গান্ধীর চিবুক'; একত্রিশে চৈত্রেই চম্পট—প্রকাশ, তাদের ইচ্ছা'), ছন্দের মাত্রাগণনায় হসন্তের বিচিত্র নূতনত্বে (পাগড়ি, হাজরা, হাত-পা—সব দুইমাত্রা, ধনীদের তো, একচেটিয়া, ভারতমর্ষে—সব চারমাত্রা), অন্ত্যমিল ব্যবহার না করে চরণের শেষে যুক্ত-ব্যঞ্জনের ব্যবহারে মিলের আভাস সৃষ্টিতে ('রোম্যান্টিক' কবিতায়), যতি ও যুক্ত ব্যঞ্জনের মুশকিল প্রয়োগে স্তম্ভন ও গতি সৃষ্টিতে ('নিশ্চয়, নিঃসঙ্গ লাগবে মিঠে'), যে প্রগাঢ় রীতিবোধ ও ছন্দবোধের পরিচয় ঐ বয়সে সুভাষ মুখোপাধ্যায় দিয়েছিলেন তা সেদিন যেমন বুদ্ধদেব বসুকে বিস্মিত করেছিল, আজও তেমনি বিস্ময়ের বিষয়।

'চিরকুটে'-র প্রথম কবিতাতেই কবি স্বীকার করেছেন 'সেদিনকার শাণিতধার হারিয়েছি'। 'পদাতিকে'-র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লক্ষণ ছিল বৈনাশিক স্যাটায়ার। স্যাটায়ারের আগ্রহ ও প্রধান প্রবণতা আঘাতের। 'চিরকুটে' এলো ইতিবাচক সুর। ধারালো ব্যঙ্গ-চতুর, ভাষণের পরিবর্তে এই পর্বে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে ইতিবাচক ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন, তার কারণ বোধ হয় শুধু পরিণতিসাপেক্ষ ব্যক্তিত্বে নেই, আছে হয়তো ছোট দল বড় হওয়ার মধ্যেও। 'পদাতিকে' নতুন পৃথিবী গড়ার নিশানাটুকু নিশানাতেই পর্যবসিত। কিন্তু 'চিরকুটে' তা নয়। অথচ সদর্থক রাজনৈতিক ভাষণের স্পষ্টতায় কবিতার কতোটা লাভ হল সেটাও বিচার্য বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে, বিচার্য হয়ে ওঠে কবিতার সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কের সমস্যাটাও। মনে হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের উপনিষদে বিশ্বাসের বা এলিয়টের বিশিষ্ট খ্রীস্টানী ধর্মমতে বিশ্বাসের অংশীদার না হয়েও যদি তাঁদের কবিতার ভোক্তা হতে আমাদের বাধা না হয়ে থাকে, তাহলে সাম্যবাদীদলের রাজনীতিতে অবিশ্বাসী হয়ে সেই মতে বিশ্বাসী কবির কাব্যসম্ভোগে বাধা কোথায়? ধর্মমত বা দর্শন যদি কবিতার প্রেরণা যোগাতে পারে, তাহলে রাজনৈতিক মতবাদ বা নয় কেন? প্রথমত, পূর্বজ কবিরা ধর্মমত পোষণ করলেও তা সচরাচর কবির অভিপ্রেত বহুমুখী সচেতনতার দরজা বন্ধ করে দিত না। কিন্তু যে কবি মার্কসবাদী, তাঁর উপলব্ধি-বীক্ষার উপর এই মতবাদের দাবি সর্বতোমুখী এবং এই সর্বতোমুখী দাবির মধ্যে বহুকৌণিক চৈতন্য বজায় রাখা কঠিন হয়। তাছাড়া ঘটনাশ্রয়ী রাজনীতি পাঠককে দুই শিবিরে ভাগ করে দেয়, পাঠকের মনে জাগায় দলগত বৈষম্য ও বিরোধের তাপ। তাই সমবেদনাবোধের যে সামান্য অনুভূতি কবিতা ফুটিয়ে তুলতে চায় তাই খণ্ডিত হয়, দ্বিখণ্ডিত দর্পণের বিকৃতির মতো। রাজনীতি তো প্রেম, মৃত্যু, প্রকৃতির মতো মানবভাগ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত নয়; ঘটনাশ্রয়ী রাজনীতি যুগপরিবর্তন, মতপরিবর্তন, ঘটনাবর্তের

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাসি খবরের কাগজের মতো মূল্যহীন হয়ে যায়। 'স্তালিন জীবন হোক' এ ঘোষণা যতো আবেগের সঙ্গে একদিন করা যাক, সোভিয়েত সাম্যবাদীদলে বিংশতি সম্মেলনের পর সেই ঘোষণা কোনোক্রমেই ততোটা আবেগবাহী থাকে না। অথবা ক্রুশ্চভ পদচ্যুত হবার পর 'যত দূরেই যাই' বইয়ের এই সব চরণ—'পৃথিবীকে নতুন করে সাজাতে সাজাতে / ভবিষ্যৎ কথা বলছে শোনো, / ক্রুশ্চভের গলায়' (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ)। রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে অনুপ্রাণিত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার সঙ্গে চার্টিস্ট আন্দোলন-অনুপ্রাণিত ইংরেজ অপ্রধান কবিদের কবিতার সঙ্গে তুলনা করেছেন অমলেন্দু বসু এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে রাজনৈতিক মত বা আন্দোলন থেকে উৎপন্ন কাব্য এখনও পর্যন্ত বিফল-প্রযত্ন রয়ে গেছে' (চতুরঙ্গ, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৪)। চার্টিস্ট কবিদের কবিতা সম্বন্ধে এঙ্গেলস্ নিজে বলেছিলেন 'that poetry was not worth much'। একই চিঠিতে এই জাতের কবিতার ব্যর্থতার কারণ বিষয়ে এঙ্গেলস্-এর একটা দামি কথা আছে—'in order to affect the masses it must also give the mass prejudices of the period' (শ্লুয়েটারকে লেখা চিঠি)।

একই রাজনীতি 'পদাতিক' আর 'চিরকুটে'-র বিষয়। কিন্তু 'পদাতিক' যে ভাবে পাঠককে মুগ্ধ করে, 'চিরকুট' তেমন করে না। 'পদাতিকে' যে কারুশিল্পের আশ্চর্য সচেতনতা ছিল, 'চিরকুটে'-র তুলনামূলক শিথিলতায় তার অভাব—আকর্ষণের অভাবের এটাই হয়তো প্রধান কারণ। আসলে 'পদাতিকে'-র ভিত্তি রাজনৈতিক মতাদর্শে হলেও, কাব্যপাঠক সেদিকে তত নজর দেয় না, তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় কৈশোর-নবযৌবনের এক বেপরোয়া ফুর্তি, এক অদম্য সংক্রামক উল্লাস। রাজনৈতিক বক্তব্যের নূতনত্ব প্রথম প্রকাশের সময় হয়তো তার প্রধান চমক ছিল। এখন রাজনৈতিক বক্তব্যের মূল্য এইটুকু যে তার ফলেই তাঁর কবিতায় এই ধাতব স্বর আবির্ভূত হতে পারলো।

এখন তার মূল্য, পরবর্তীকালের জন্যেও তার মূল্য, তার পরিণত শিল্পরীতিতে, তার স্বাস্থ্যকর উদ্দীপনায়। এই উদ্দীপনা থেকে 'চিরকুট' বঞ্চিত আর এই বঞ্চনার বদলে বিশেষ কোনো ক্ষতিপূরণ অন্য দিক থেকে হয় নি। সাম্যবাদী দলের মতে যতই আস্থা বেড়েছে ততই বিশ্ববীক্ষায় অবশ্যম্ভাবী পক্ষপাত দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক মতবাদকে যেমন সিসটেম হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তেমনি কবিতাকেও সিসটেমে পরিণত করার একটা গর্হিত ঝোঁক দেখা দিয়েছে। প্রায় সব কবিতার শেষ বাক্যে একটা নিরঙ্কুশ আশাবাদের জ্যোতিরচনার, সমাধান বাতলে দেবার, রাজনৈতিক দলের নির্দেশপত্রের মতো একটা পথ-নির্দেশের চেষ্টা রয়েছে। যেমন—

১ এসো আজ এই জটিল পথে/ঠিকানা বদলে প্রণয় খুঁজি।

(কাব্যজিজ্ঞাসা ২)

২ ছত্রভঙ্গ রৌদ্র হয় ফিকে/উদ্যত সঙ্গীন দিকে দিকে। (কাব্যজিজ্ঞাসা ৩)

৩ শৃঙ্খলিত সেনাপতি,/তাই বলে আমাদের শূন্য নয় তূণ। (আহ্বান)

৪ অথর্ব নায়ক হ[illegible]চ্যুত—
দ্রুতগতি ইতিহাস,
এসেই কদম তার হয় যে অস্থির। (চীন: ১৯৪১)

'পদাতিকে'-র তুলনীয় শেষ লাইনগুলোর ('হাজরা পার্কে সভা কাল; নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ!' কিংবা 'আমাকে সৈনিক করো তোমাদের কুরুক্ষেত্রে, ভাই'।) সঙ্গে 'চিরকুটে'-র এই সব লাইনের স্বরের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। প্রথম উদাহরণগুলোতে বক্তব্য প্রায় সম্পূর্ণই নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু 'পদাতিকে'-র উদাহরণগুলোতে সমাধান ব্যক্তিগত অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধ। শেষ বাক্যে এই রকম ঔপদেশিক ভঙ্গিতে সার কথা বলে দেবার এই রকম ঝোঁক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একেবারে সাম্প্রতিক কবিতাতেও দেখি। 'কাল মধুমাস' এবং তার পরবর্তী বই থেকে কয়েকটা নিদর্শন দিচ্ছি।

১ ভোর হবে, তাই এই অন্ধকার ব্যথায় মোচড়ায়। (এদিকে)

২ নিষ্পত্র মরা ডালে
চুঁইয়ে চুঁইয়ে
চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে—
নতুন জীবনের
বীজমন্ত্র। (মসিয়ার পর)

৩ সময় মতো যাওয়ার মধ্যেই জীবনের সৌন্দর্য। (এক অস্থির চিত্র)

৪ অথচ তারই হাতে দেখছি মুক্ত পাখা
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত
আমারই পতাকা। (ছেলে গেছে বনে)

হয়তো এই প্রবণতাকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার একটা বিশিষ্ট লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া চলে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা হালকা চালের কবিতার সংখ্যা 'চিরকুটে' খানিকটা কম। 'চিরকুটে'-র অনেকগুলি কবিতা আটমাত্রা-ভাঙা পয়ার ছন্দে লেখা। মাঝে মাঝে এসেছে এক মন্থর বিষাদ, আর এই বিষাদ সঙ্গত রূপ পেয়েছে পয়ারে—'ঢেউ-এর ইশারা গিলি অন্ধকার গলির রোয়াকে,/ হাতে হ্রস্ব জীবনের জরিপের ফিতে' (কাব্যজিজ্ঞাসা)। কিন্তু পর-পর দুটো কবিতার বইয়ে কবি হঠাৎ যেহেতু আলাদা মানুষ হয়ে যান না তাই মাঝে-মাঝেই 'পদাতিকে'-র ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ ধারালো বাক্যবিন্যাস 'চিরকুটে'-র মন্থরগতি ইতিবাচক ভাষণের মধ্যে পাই। সুভাষচন্দ্রের প্রস্থান অবলম্বনে মাইকেলী-গম্ভীর ছন্দ ব্যবহার করে 'এত বলি ত্রিপুরীর বীর জগন্নাথ / গেলা চলি' চরণকে হাস্যোদ্বেল করে তোলা যেমন অনবদ্য, তেমনি শেষের চরণ দুটোয় পয়ার, একটা পুরনো কবিতার প্রতিধ্বনি এবং পূর্ণের বদলে অপূর্ণ মিল ব্যবহার চমৎকার—'সহসা বিস্মিত শিষ্য কীর্তন থামায়। / বিষণ্ণ বাজার কাঁদে : নিমাই, নিমাই'। আর 'দীক্ষিতের গান' কবিতায় হারিয়ে যাওয়া পুরনো

উল্লাসের আভাস মেলে। অবশ্য 'জাপপুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি, জ্বলে হ্যাঙ্কাও'-এর মতো এখানে উল্লাস তেমন অদম্য স্বতঃস্ফূর্ত বলে মনে হয় না, কিন্তু এখানেও অন্তত একটা স্তবকে যতির চমৎকার ব্যবহারে থামা ও চলায় ছন্দ আশ্চর্যভাবে দুলে উঠেছে—

হতাশার কালো চক্রান্তকে ব্যর্থ করার
শপথ আমার ; মৃত্যুর সাথে একটি কড়ার—
আত্মদানের ; স্বপ্ন একটি পৃথিবী গড়ার।

এই বেপরোয়া ফুর্তি আর একবার পাই 'ছেলে গেছে বনে' বইতে। ধুয়োর তিনবার পুনরাবৃত্তিতে সেই সংক্রামক আনন্দ আবার ফিরে এসেছে—

ডাকে বান,/ভাঙে বাঁধ—/হাতে দাও হাত ভাই।
দলে দলে কাঁধে কাঁধ/চলো এক সাথ ভাই।···
আনো দিন হাতুড়ির/আনো দিন কাস্তের
খাদ্যের শিল্পের শিক্ষার স্বাস্থ্যের। (আজকের গান)

আর একটা কারণে 'চিরকুট' আমার কাছে মূল্যবান বলে মনে হয়। পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে বেশ কিছু ভালো ছোটগল্প বাংলায় লেখা হয়েছিল, কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে ভালো কবিতা বেশি পাই না। 'চিরকুটে' পাই। এক বিষাদগাঢ় সকরুণ মমতা এই কবিতাগুলোয় বর্তমান। ফেটে পড়া রাগ আছে 'হুজুর, জেনে রাখুন/খাজনা এবার মাপ না হলে/জ্বলে উঠবে আগুন।' —কিন্তু অগ্নিবর্ণ ক্রোধকে অতিক্রম করে, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সেই দেশব্যাপী শবগন্ধের মধ্যে কবি কী ভাবে এই কারুণ্য ও মমতা অর্জন করতে পারলেন যার ফলে মন্বন্তরের ছবি এমন বিস্ময়কর ইমেজসমূহের মধ্যে স্থায়িত্ব পায়।

১ শোকাকুল সন্ধ্যাকাশে মোছা/এয়োতির অবাধ্য সিঁদুর। (এই আশ্বিনে)
২ হাতুড়ি বিকিয়ে হাটে/ভস্ম মেখে পড়ে থাকে/বেকার হাপর। (স্বাগত)
৩ বেত্রাহত অন্ধকার শিহরায় ভয়ে (বর্ষশেষ)

গভীর দেশপ্রেমের ('এদেশ আমার গর্ব,/এ মাটি আমার কাছে সোনা') উৎস থেকেই হয়তো উঠে এসেছে এই সব ইমেজ।

আক্রমণাত্মক স্যাটায়ারের সঙ্গে ইমেজ-নির্মাণ-ক্রিয়ার বিরোধ আছে মনে হয়। স্যাটায়ার বৈনাশিক, কিন্তু নিটোল পরিপূর্ণ ইমেজরচনায় সৃজনপ্রবণতা জোরালো হওয়া চাই। তাই 'হবো অপরূপ অপরাহ্নের নদী'-র মতো অপরূপ ইমেজ 'পদাতিকে' পেলেও, এমন আবির্ভাব সেই পর্যায়ে বিরল। আর তা ছাড়া সেখানে কবিতাগুলো কোনো কেন্দ্রীয় ইমেজের উপর বা ইমেজসমবায়ের উপর ভিত্তি করে স্থাপত্যের মতো গড়ে ওঠে নি। কিন্তু 'চিরকুটে' যেই সুভাষ প্রাক্তন ব্যঙ্গ প্রায় পরিহার করে ইতিবাচকতায় আত্মস্থ হলেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিতার প্রধান উপকরণ হয়ে উঠতে থাকলো এই সব ইমেজ। অবশ্য এই পর্বের কবিতার শেষে সারসত্য বলে দেবার যে প্রবণতার কথা আগে বলেছি তা ইমেজের দীপ্তিকে অনেকটা নষ্ট করেছে। তবু 'চিরকুটে' যা শুরু 'ফুল ফুটুক' কবিতাবলীতে তারই চরিতার্থতা।

'অগ্নিকোণ' নামের কবিতাপুস্তিকায় মাত্র পাঁচটি কবিতা সংকলিত হয়েছিল। নাম-কবিতায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার গণ-অভ্যুত্থানকে কবি কাব্যরূপ দিয়েছেন। রাজনৈতিক জ্বরোত্তাপ এই বইতেই সব চেয়ে বেশি, রাজনৈতিক চড়াগলায় কবিতার নম্র সুর আড়ালে সরে গেছে। অথচ জোর অন্য সব জায়গায় সয়, কবিতায় সয় না, ভালোবাসায় সয় না। মাত্রাবৃত্তের সুকৌশল প্রয়োগ সত্ত্বেও, ভৌগোলিক নামগুলিতে কবিতা খচিত হওয়া সত্ত্বেও এখানে 'হাঁক'-ই প্রধান হয়ে উঠেছে। কোটি কোটি কণ্ঠের হুঙ্কারে যে ব্রজের কানে তালা লাগে তা পাঠকেরও গ্রহণীশক্তিকে বধির করে দেয়। অবশ্য 'দিন এসে গেছে ভাইরে' বলে কবি রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে যে শ্লোগানের সুরে গলা সেধেছেন, তারও পূর্বাভাস ও প্রস্তুতি 'চিরকুটে' ছিল নির্ভুলভাবে অন্তত দুটো কবিতায়—'উনত্রিশে জুলাই' ('স্ট্রাইক! স্ট্রাইক!') এবং 'জবাব চাই' ('রক্তের ধার রক্তে শুধবো/কসম ভাই—/ব্রেথওয়েটের, গোয়ালিয়রের/জবাব চাই।')

কিন্তু এই তারস্বরের সময়েই লেখা হল এমন দুটো কবিতা যা আশ্চর্যভাবে স্বতন্ত্র শুধু নয়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ দুটো কবিতাও বটে। আগে মাত্র দুটো গদ্যছন্দে কবিতা লিখেছিলেন তিনি—'পদাতিক' নামকবিতার পঞ্চম অংশ আর 'চিরকুটে'-র 'উজ্জীবন'। কিন্তু গদ্যছন্দে লেখা 'মিছিলের মুখ' কবিতার পর থেকে, যেমন নাজিম হিকমতের অনুবাদে হয়তো মূলের ছন্দরক্ষার গরজে, তেমনি 'ফুল ফুটুক' কবিতাবলীতে তিনি সব চেয়ে বেশি কবিতা লিখেছেন গদ্যছন্দে। পরে ছন্দোবদ্ধ কবিতা অনেক লিখলেও গদ্যছন্দেই বেশি লিখেছেন এই কথা মনে রেখে বলা যায় তুলনায় ছন্দের দিক থেকে 'মিছিলের মুখ' একটা পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আর অন্তিম পরিণামে এতোই পৃথক, তবু 'একটি কবিতার জন্যে' ও 'অগ্নিকোণে'-র তুলনা করলে দেখা যাবে অনেকগুলো সাদৃশ্য। দুটো কবিতাই ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্তে লেখা। দুটো কবিতারই পিছনে একই রাজনৈতিক চেতনা। একই ধরনের ইমেজ পাই দুটো কবিতাতেই—

১ অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে দুরন্ত ঝড়ে…। (অগ্নিকোণ)
সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে/দুরন্ত ঝড়…। (একটি কবিতার জন্যে)

২ বজ্রের সুরে বেঁধে নেয় গলা…। (অগ্নিকোণ)
বজ্রের হাঁকে ডাকে/অরণ্যে সাড়া…। (একটি কবিতার জন্যে)

৩ বঞ্চিতদের দিগন্তজোড়া মিছিল। (অগ্নিকোণ)
মিছিল এগোয়/আকাশ বাতাস মুখরিত গানে (একটি কবিতার জন্যে)

ব্যবহৃত শব্দাবলীও এক। 'অগ্নিকোণে' তল্লাট, উপড়ে আনে, পোড় খাওয়া, লেজ তুলে, আর 'একটি কবিতার জন্যে'-র মধ্যে কবিতায় রাগে রী রী, তল্লাটে, ফতোয়া, লটকে—এই সব শব্দ।

এত মিল, তবু কতো আলাদা। 'একটি কবিতার জন্যে' যে সার্থকতর সে কি প্রকৃতির পটভূমি আছে বলে? না কি এই কবিতার শেষ স্তবকের কথা শুধু সাম্যবাদীর নয়, সর্বমানুষের আকাঙ্ক্ষার কথা

বলে—'নতুন পৃথিবী, অজস্র মুখ, সীমাহীন ভালবাসা'। 'অগ্নিকোণে'ও তুলনীয় পংক্তি আছে—'পোড়া মাঠে মাঠে বসন্ত ওঠে জেগে'। কিন্তু 'অগ্নিকোণে' এই পংক্তি একটা স্বতন্ত্র স্তবক—আগের পংক্তির সঙ্গে এই পংক্তির কোনো অনিবার্য যোগ নেই। কবি যেন পরে ভেবেচিন্তে লাইনটি জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু 'একটি কবিতার জন্যে' কবিতায় 'নতুন পৃথিবী, অজস্র মুখ, সীমাহীন ভালোবাসা' ছেদচিহ্নহীন একই বাক্যবন্ধে অবলীলাক্রমে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছে—মূল কবিতার থেকে তা আলাদা নয়। তাছাড়া 'অগ্নিকোণে'-র অভিপ্রায় একেবারেই রাজনৈতিক। কিন্তু 'একটি কবিতার জন্যে' কবিতায় রাজনীতির ভূমিকা অপ্রধান; এখানে প্রধান কথা, কত বিচিত্র আবেগ যে কবিতার জনক হতে পারে সেই দলমত নিরপেক্ষ মূল্যবান কথাটা।

যে সাদৃশ্য অন্য দুটো কবিতায় পেলাম, সেই সাদৃশ্যের ছাপ 'মিছিলের মুখ' কবিতাতেও রয়েছে।

১ আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ…। (একটি কবিতার জন্যে)
বিস্রস্ত কয়েকটি কেশাগ্র
আগুনের শিখার মতো হাওয়ায় কম্পমান। (মিছিলের মুখ)

২ ঘুমভাঙা দলবদ্ধ ঢেউয়ের/ক্ষুরধার তলোয়ারে। (অগ্নিকোণ)
তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই মুখ
নিষ্কাষিত তরবারির মতো…। (মিছিলের মুখ)

'একটি কবিতার জন্যে' কবিতায় দেয়ালে দেয়ালে কারা অনাগত দিনের ফতোয়া এঁটে দেয় এবং মিছিল এগোয় আকাশবাতাস মুখরিত গানে, 'মিছিলের মুখে' অন্ধকারে হাতে হাতে গুঁজে দেওয়া হয় এক নিষিদ্ধ ইস্তাহার এবং মিছিল উদ্বেল হয়। দুটির কোনোটিতেই 'অগ্নিকোণে'-র মতো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা বক্তব্য প্রধান হয়ে ওঠে নি। প্রথমটিতে প্রকৃতি ও আন্দোলনের উত্তেজনার লক্ষ্য একটি কবিতাকে জন্ম দান, দ্বিতীয়টিতে উদ্বেল মিছিলের উদ্দেশ্য একটি মুখকে দেহদান। আর দুটো কবিতার মধ্যেই বড়ো হয়ে উঠেছে পৃথিবী আর ভালোবাসার

কথা। 'মিছিলের মুখ' কবিতায় এসে মিলেছে রাজনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে জ্যোতির্ময় প্রেম। অবশ্য এই কবিতাটির সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ তার অবয়বত্বে, তার প্রত্যক্ষতায়। স্বল্পভাষী শব্দরেখায় কবিতার সেই জ্বলন্ত মুখ তার আগুনের শিখার মতো কেশাগ্র নিয়ে, উন্মুক্ত তরবারির মতো ধারালো অপ্রতিদ্বন্দ্বী আহ্বান নিয়ে আশ্চর্য অবয়বত্ব লাভ করেছে।

'মিছিলের মুখ' কবিতাটা আরো ছুটো কারণে স্মরণীয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রেম অস্বীকৃত ছিল। যেখানে প্রেমের কথা আছে, সেখানে হয় উচ্চ সমাজের রমণীয় বিলাসের প্রতি অথবা মধ্যবিত্তের নীরক্ত নপুংসকতার প্রতি বিদ্রূপের লক্ষ্য হিসেবে জায়গা পেয়েছে। যেমন 'কৃত্রিম হ্রদে পায়চারি করি, চলো না' (আদর্শ); 'কথোপকথনে মুগ্ধ হবে ছুটি পার্শ্ববর্তী সিঁড়ি—অবশ্য কর্তব্য নীড়' (নির্বাচনিক); 'হৃদয় সম্পর্কে হবু দম্পতির হিং-টিং-ছট' (নারদের ডায়েরি)। রাজনীতি বিষয়ে ইতিবাচক ভাষণের দিনে 'চিরকুট' বইয়ে তিনি আর প্রেম সম্বন্ধে তত বিদ্রূপপ্রখর নন—প্রমাণ 'সীমান্তের চিঠি' এবং 'কাব্যজিজ্ঞাসা' কবিতার অংশবিশেষ। কিন্তু সেখানেও প্রেম নয়, রাজনৈতিক বক্তব্যই প্রধান। 'মিছিলের মুখ' কবিতায় রাজনৈতিক মতাদর্শকে ছাপিয়ে প্রেম প্রথম প্রধান হয়ে উঠল।

দ্বিতীয়ত, মিছিলের এই মুখ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় পরে বারে বারে এসেছে। যে মিছিলের মুখের দেখা এখানে পেলাম, সেই মুখ আবার ফিরে এলো 'ফুল ফুটুক' পর্যায়ের 'জয়মণি, স্থির হও', 'আমি আসছি', 'লাল টুকটুকে দিন' কবিতায় এবং সব সময়েই এই প্রভাস্বর মুখে সংহত হয়েছে প্রেম এবং রাজনৈতিক চেতনা ছুই-ই। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, সর্বত্রই এই মুখের আচরণ ছলনাময়ী পলাতকার মতো—

১ সভা ভেঙে গেল, ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ল ভিড়
আর মাটির দিকে নামানো হাতের অরণ্যে

পায়ে পায়ে হারিয়ে গেল
মিছিলের সেই মুখ। (মিছিলের মুখ)

২ সামনে ফেনিল তরঙ্গের গায়ে
নিজেকে সহস্র খণ্ডে ভেঙে
আমাকে বিদ্রূপ করে হারিয়ে গেল
মিছিলের সেই ছলনাময়ী মুখ। (জয়মণি, স্থির হও)

৩ তুমিই আমার সেই মিছিলের মুখ।
এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত যাকে খুঁজে
বেলা গেল। (লাল টুকটুকে দিন)

'জয়মণি, স্থির হও' কবিতায় কবি একবার আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করেছেন 'সে কি স্বপ্ন? /সে কি মায়া? /সে কি মতিভ্রম?' 'লাল টুকটুকে দিন' কবিতায় এই মর্মান্তিক প্রশ্ন আবারো ধ্বনিত হয়েছে—'চোখ মুছি—/তুমি স্বপ্ন? /না, তুমি মায়া?' ভয় হয় 'পুড়ে পুড়ে ছাই হবে সেই আত্মক্ষয়ী আগুন' নিজেকে মনে হয় 'কোটি আলোকবর্ষ আগেকার'' কোনো মৃত নক্ষত্রের মতো, বাহিরে সে ঔজ্জ্বল্য বিকীর্ণ করে বটে কিন্তু আসলে সে অন্তরে ভস্মসার।

অনেক সময় বিশ্বাসের চূড়ার তলাতেই আশ্রয় পায় বিশ্বাসক্ষয়ের কীটাণু। 'অগ্নিকোণে' যখন কবি অতি বিপ্লববাদে অতি বামপন্থায় সব চেয়ে বেশি আস্থা ন্যস্ত করেছিলেন তখন কি সেই মতাদর্শ বিষয়ে ভিতরে ভিতরে বিশ্বাসের ভিত টলে উঠেছিল? তাই কি যেসব কবিতায় মিছিলের মুখের ইমেজ আসে সেই সব কবিতায় বিচলিত বিশ্বাসের ইশারা মেলে? যে মুহূর্তে সভা ভেঙে গেল, জনসঙ্ঘের ঘনিষ্ঠতা ও জনচিত্তের যৌথ উত্তেজনা থেকে কবি বঞ্চিত হলেন অমনি দেখলেন 'আমি নির্জন, নিঃসঙ্গ'—যে মিছিলের মুখ, যে বিশ্বাস তাকে জ্বালিয়ে রেখেছিল তা দৈনন্দিন শহরের জীবনযাপনের ভিড়ে কোথায় হারিয়ে গেল। 'ভিড় দেখলেই দাঁড়াই /যদি কোথাও খুঁজে পাই মিছিলের সেই মুখ', কিন্তু বিশ্বাসের প্রান্তকে

আঁকড়ে ধরার আকুল ব্যগ্রতা সত্ত্বেও সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিষ্পেষিত তরবারির মতো মুখ ফিরে আসে না। 'জয়মণি, স্থির হও' কবিতায় মিছিলের মুখ পুনরায় হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেল কিন্তু 'তারপরেই /বিদ্যুতের চকিত কশাঘাতে/দুর্নিবার/বেগান্ধ পতন' এবং মিছিলের সেই ছলনাময়ী মুখ কবিকে 'বিদ্রূপ করে হারিয়ে গেল'। পলায়মান বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা কবি করেছেন—'আমি তারস্বরে চেঁচিয়ে বললাম : /জয়মণি, স্থির হও/হে কালবৈশাখী, শান্ত হও—' কিন্তু সে স্থির শান্ত হলো না; বিশ্বাসের ভাণ্ড ছিদ্রিত হয়ে গেল কবির সমস্ত আগ্রহ সত্ত্বেও। যেন বিশ্বকে সাক্ষী মেনে কবি বললেন —'দেখ,/আমি জটায় বাঁধছি/বেদনার আকাশগঙ্গা।'

এই বিচলিত-বিশ্বাসের জন্যেই কি নাজিম হিকমতের কবিতার অনুবাদে সুভাষ মুখোপাধ্যায় হাত দিয়েছিলেন? এক পর্ব শেষ হয়ে গেল, নতুন পর্ব শুরু করার আগে চিন্তাগুলো একটু গুছিয়ে নেওয়া দরকার। নিজের কণ্ঠে কথা বলার আত্মস্থতা হারিয়ে গেছে, আবার তাকে ফিরে পাবার আগে, সমধর্মা কোনো কবির প্রত্যয়ের উত্তাপ থেকে নিজের বিশ্বাসের বাতি জ্বালানোর চেষ্টা করা দরকার। নিজের যে বিশ্বাস দুলে উঠেছে, সেই বিশ্বাসের দ্বিধামুক্ত উচ্চারণে অনুবাদক হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ নেবার জন্যেই হয়তো সুভাষ মুখোপাধ্যায় তুর্কী কবি হিকমতের কবিতা তর্জমায় হাত দিয়েছিলেন। এই অনুমান সত্য হোক বা নাই হোক, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বিবর্তনে হিকমতের এই তর্জমার দাম যে খুব বেশি এতে কোনো সন্দেহ নেই। স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের মধ্যে গদ্যছন্দে সীমারেখা টানা বেশ কঠিন কাজ। ছন্দের সুনিয়মিত নির্দিষ্ট বন্ধন থেকে সে মুক্তি দেয় বলেই নিজস্ব নিয়মে তাকে স্ববশ হতে হয়। গদ্যছন্দে সার্থকতা নির্ভর করে শব্দসমূহের মধ্যে একটা টেনশন বা আততি সৃষ্টিতে। লক্ষণীয় যে কাব্যরচনার প্রথম পর্বে অনেক বিষয়ে

সমর সেনের কাছে ঋণী হলেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমর সেনের মতো গদ্যকবিতা রচনায় হাত দেন নি। বাস্তবিক হিকমতের তর্জমার আগে 'মিছিলের মুখ' সুদ্ধ মাত্র তিনটি গদ্যকবিতা তাঁর পাই। 'ফুল ফুটুক' পর্যায়ে যে অনেক সার্থক গদ্যকবিতা তিনি রচনা করেছেন, যেগুলো সমর সেনের বা অন্য পূর্বজ কবির গদ্যকবিতা থেকে আলাদা জাতের, তার পত্তন হয়েছে হিকমতের কবিতা তর্জমার সময়।

এবং যে ইমেজের আভাস 'চিরকুটে' দেখা গিয়েছিল, 'ফুল ফুটুকে' যে ইমেজমালার প্রতিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাকে সুভাষ ব্যবহার করতে পেরেছেন হিকমতের অনুবাদের অভিজ্ঞতার ফলেই। মায়াকোভস্কির কবিতার সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই নাকি হিকমতের কবিতায় 'ক্রমেই নতুন আঙ্গিক, অভিনব চিত্র, বিশেষণ আর উপমা দেখা দিতে থাকে।' আর ইংরেজি ও ফরাসি অনুবাদের মাধ্যমে হিকমতের কবিতার সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় এলো নতুন ধরন, নতুন গড়ন এতেও কোনো সন্দেহ নেই। অভিনব চিত্রের কথাই প্রথম ধরা যাক—

১ সিগারেটটা হাতে নিয়ে সে চলে গেল।
হয় তো এখন সে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে ঘুমোচ্ছে
ঠোটে তার না-ধরানো সিগারেট
বক্ষঃস্থলে ক্ষত। (হিকমত, না-ধরানো সিগারেট)
যে লোকটা একটু আগে গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিল
এতক্ষণে সে বউয়ের গলা জড়িয়ে শুয়েছে।
উঠোন এখন খালি ; …(সুভাষ, অগ্নিগর্ভ)

২ পাড়ার বেড়ালগুলো ভিড় করেছে মাংসের দোকানের দরজায়
চুলে সযত্নে পাতা কেটে কশাইয়ের বউ ওপরতলায় দাঁড়িয়ে
জানলার ঝন্‌কাঠে তার স্তনযুগ
ঘনায়মান সন্ধ্যাকে দেখছে। (হিকমত, বিকেলের হাওয়ায়)
লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মতো
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে

এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধরে
এই সব সাত-পাচ ভাবছিল—(সুভাষ, ফুল ফুটুক না ফুটুক)

উপমা আর বিশেষণেও আছে সাদৃশ্য। হিকমতের তর্জমায় পাচ্ছি 'দা-কাটা তামাকের মতো পুড়িয়ে দিই প্রমিথিয়ুসের ডাক', 'মিশকালো রাত্রি উজানী নৌকার মতো', 'টুঁটি-টিপে-ধরা শিশুর রক্তের মতো সময়'. 'সেপাইয়ের উর্দিপরা চাষীদের', 'না-ধরানো সিগারেট', আর পাশাপাশি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ফুল ফুটুক' কবিতাবলীতে পাচ্ছি 'পাগল বাবরালির চোখের মতো আকাশ', 'দুপাশে পাখির ডানার মতো দুটো হাত', 'লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মতো আকাশটাকে', 'চন্‌চনে ক্ষিধের দুরন্ত রাত্রিকে', 'অষ্টপ্রহর হরিনাম করা পাখির খাঁচাটা', 'জোয়ানমদ্দ অন্ধকার।'

চিরজীবিত নবজাতক মৃত্যুপরম্পরাকে অতিক্রম করে জন্মপরম্পরায় বারবার দেখা দেয়। কাব্যে, শিল্পে, মীথে এই নবজন্মের প্রতীক শিশু, উর্বরা ধরিত্রী বা জননী। গোঁড়া রাজনীতিতে বিশ্বাস যখন শিথিল হয়ে এলো তখন ভস্মস্তূপের ভিতর থেকে পুরাণ-পাখির মতো জন্মালো মানবতাবাদে গভীর প্রত্যয়। 'ফুল ফুটুক' কবিতাপর্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিজীবনের ইতিহাসে মানবতাবাদের উজ্জীবনের কাব্য। এই উজ্জীবনের অভিজ্ঞতা বারবার শিশু আর সন্তানসম্ভবা রমণীর ছবির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। শিশু আর সন্তানসম্ভবা নারীর এই প্রতীকী ব্যবহারের ব্যাপারেও হিকমতের অনুবাদগুচ্ছ পথনির্দেশ করেছে মনে হয়। হিকমতের অনুবাদে পাচ্ছি—

১ কারণ, নবজাত শিশুর মতো/নীল আকাশ আমি দেখেছি।
(শয়তানদের জন্যে যেন না মরি)

২ দেবশিশুর মতো গভীর ঘুমে অচেতন
একাকিত্ব নয়,
তোমার স্ত্রী।
—সন্তানসম্ভবা নারী। (সকাল)

৩ সব চেয়ে সুন্দর শিশু
আজও ডাগর হয়ে ওঠেনি।
আমাদের সব চেয়ে সুন্দর দিনগুলো
আজও আমরা পাইনি। (জেলখানার চিঠি)

আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ফুল ফুটুকে' পাচ্ছি—

১ কোন রকমে কোমর বেঁকিয়ে
খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছাগলটাকে খাওয়ায়
এ-বাড়ির আসন্নসম্ভবা বউ। (একটি লড়াকু সংসার)

২ মার হাতে ছেঁড়া শাড়িটা এগিয়ে দেয়
লজ্জাকে মাথার মণি করা ছোট্ট একটি জীবন
কদিন আগেও
শানের ওপর যে হামা দিত! (ড্যাং ড্যাং করে)

৩ হামাগুড়ি দেয়,
ব্যথা পেলে কাঁদে,
পড়ে গেলে ঠেলে ওঠে ফের,
ছোট ছোট দুটো মুঠো দিয়ে বাঁধে
সাধ আহ্লাদ আমাদের। (শুধু ভাঙা নয়)

ইমেজের পর ইমেজ সাজিয়ে পুরো কবিতার সংগঠনের ব্যাপারে হিকমতের কবিতার তর্জমার সঙ্গে 'ফুল ফুটক' কবিতাগুচ্ছের বেশ মিল পাওয়া যায়। দুটো কবিতার বাচনভঙ্গির মিল কতোটা হতে পারে তার প্রমাণ মিলবে—'তুমি আমি' (হিকমত) এবং 'পারাপার' (ফুল ফুটুক) কবিতা দুটো পরপর পড়লে। এই সব থেকে তাই মনে হয়, নিজের স্বরে নিজের গান গাইবার আগে পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নাজিম হিকমতের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে স্বরচর্চা করে নিয়েছিলেন। কিন্তু হিকমতের তর্জমার যে তাৎপর্য সুভাষের বিবর্তনে, সেই তাৎপর্য উত্তরকালে প্রকাশিত বুলগার কবি নিকোলা ভাপ্‌ৎসারভের তর্জমা 'দিন আসবে' বইয়ে নেই। হিকমতের তর্জমা সুভাষের পরবর্তী মৌলিক রচনাকে প্রভাবিত

করেছে, সেই রকম কোনো প্রভাব 'দিন আসবে' কবিতাগুচ্ছের নেই। 'আমার বুকের বর্মে ঢাকা / বিশ্বাস আমার। / সেই বিশ্বাস ভাঙবে / তেমন বুলেট / ত্রিভুবনে নেই' (দিন আসবে)। এই সব অংশ যখন পড়ি তখন এটাই স্পষ্ট হয় যে এই তর্জমা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব রীতির দ্বারাই বরং প্রভাবিত।

'ফুল ফুটুক' কবিতাগুচ্ছের মধ্যে 'শুধু ভাঙা নয়' কবিতাটার দাম বোধহয় সব চেয়ে বেশি। এই কবিতা থেকে জানি দুই-দশক কবিতা লেখার পর কবি কোন পরিণামে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। একটি গানের কোমল ধুয়োর মতো তিনি বারবার এই উচ্চারণ জরুরি বলে মনে করেছেন 'ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়'। অনেক কর্কশ কাঁকর পার হয়ে, 'করাতের দাঁতে ঘিষ ঘিষ শব্দ' পেরিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই উপলব্ধিতে পৌঁছিয়েছেন। রাজনৈতিক দলমন্ত্রের কষ্টিপাথরে বিশ্বসংসারকে বিচারের প্রবণতা অতিক্রম করে তিনি নিটোল পরিপূর্ণ মানবতাবাদে আত্মস্থ হয়েছেন। যিনি এক সময় ফুল-খেলা নিয়ে ঠাট্টা করেছেন, তিনি আজ বলেন—'ক্রমাগত চোখ রাঙিয়ে রাঙিয়ে/ যারা হয়ে গেছে অন্ধ/তাদের নাকের কাছে ধরে দিও / ফুলের একটু গন্ধ' (শুধু ভাঙা নয়)। শত্রুপক্ষ যখন আচমকা কামান ছোঁড়ে তখন কোকিলের দিকে কান ফেরানো পরিহাসের বিষয়, এই কথা যে তিনি অতীতে লিখেছিলেন, সে কথা ভেবে পরে তিনি নিজেকে যেন তিরস্কার করেছেন—'ততক্ষণ/আমিই বা বসে থাকি কেন? / উঠোনে সন্ধ্যামণি ফুল ফুটিয়ে তুলবার/এই তো সময়' (সন্ধ্যামণি)। এখন রাজনৈতিক অভিযানের সংকল্পকেও ফুলের প্রতীকে পরিণত করতে কোনো দ্বিধা নেই—'মাঠের কাদা-লাগা ফাটা পায়ে/শান-বাঁধানো পাথরে / আগুনের ফুল তুলে / আমরা আসছি' (আগুনের ফুল)। স্তালিনের রাজনৈতিক জীবনের কৃতিত্বকে অনায়াসে মরুতে ফুল ফোটানোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। শিশু ও ফুলের মতো, শীতের

পর বসন্তের আবির্ভাবও নবজন্মের প্রতীক ; তাই মন্ত্রের মতো সংহত বিশ্বাসে কবি উচ্চারণ করেছেন 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'। তবে ফুল নিয়ে কবির সংশয় একেবারে ঘোচে নি। মাঝে মাঝে আবার তাঁর সন্দেহ হয় 'বাঃ কী সুন্দর বলে একটা দারুণ নিষ্ঠুরতাকে চাপার চেষ্টা চলেছে', তাই আবার তিনি জীবনযৌবনের সৌন্দর্যসুষমার, সৃজনশীলতার প্রতীক ফুলের দিকে আড় চোখে তাকান—

ফুলকে দিয়ে
মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলায় বলেই
ফুলের ওপর কোনোদিনই আমার টান নেই।
তার চেয়ে আমার পছন্দ
আগুনের ফুলকি—
যা দিয়ে কোনোদিন কারো মুখোশ হয় না। (পাথরের ফুল)

কবির এই পরিবর্তন তাদেরও পছন্দ নয়, যারা মানবিক উদারতাকে মনে করে প্রতিক্রিয়াশীলতার অন্য নাম। ফুল নিয়ে কবির যে সংশয়, সেই সংশয় তাদের আরো তীব্র। তাই কবির কবিতায় কবির বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ—'ফুলকি ছেড়ে ফুল ধরেছেন / মিছিল ছেড়ে মেলা / দিন থাকতে মানে মানে / কাটুন এই বেলা' (ল্যাং)।

ভাঙা নয়, দিন এখন সৃজনমুখী। তাই প্রেম—'এ সংসারে / দিনে রাত্রে / দেহ বলো, মন বলো / যখন যা চাই— / প্রেমের নিকষে ফেলে, প্রিয়তমা, / করো সব কিছুর যাচাই' (যা চাই)। এখনো পর্যন্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সব চেয়ে সার্থক প্রেমের কবিতা বোধহয় 'সুন্দর'। একথা ঠিক যে সৌন্দর্য অবয়বকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করে, তাই নন্দনতত্ত্বের পক্ষ থেকে সংশয় জাগতে পারে, 'যখন তোমাকে আর দেখা গেল না / তখনই / আশ্চর্য সুন্দর দেখালো তোমাকে'—এ কখনো বাস্তবিক হয় কিনা। তত্ত্বকথা যাই হোক, মানতেই হবে 'সুন্দর' কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রেমিকাকে অবয়বত্ব দিতে অভাবনীয় ভাবে সার্থকহয়েছেন। কোথায় এই সার্থকতার

উৎস? আমার মনে হয়, প্রথম স্তবকটিতে 'তখনও নয়' বাক্যাংশটি তিনবার ব্যবহার করে, প্রেমিকাকে ঐ ঐ সময়ে পরম সৌন্দর্যদানে কবি রাজী না হয়ে, তারই মধ্য দিয়ে সুকৌশলে, আমাদের মনে সেই অঙ্গের রেখা, সেই প্রত্যক্ষতা ফুটিয়ে তুলেছেন যা 'উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গের' মধ্যে বাইরে থেকে হারিয়ে গেলেও স্মৃতিতে ও অন্তরে আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই 'মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র' 'উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে' তাকে ঢেকে দিলেও মনে হয় ইস্তাহার বিতরণকারিণী এক সুবলয়িত হাতকে অন্য অসংখ্য হাতের থেকে আলাদা করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নেতির দ্বারা ইতিকে, পরোক্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষকে ইন্দ্রিয়গোচর করে তুলতে পারায় এক আশ্চর্য উদাহরণ এই কবিতাটা। আসলে কবিতা পরোক্ষতাজীবিত শিল্প।* আবেগ যতোই সোজাসুজি খোলাখুলি বলা হয় ততই তার আবেদন কমে যায়; কেন না পাঠকের অনুভূতি এবং রচনাশক্তিকে জাগ্রত করে তুলবার সুযোগ তাতে মেলে না।- রাজনৈতিক বিষয়ে কবিতার পক্ষে কবিতা হওয়ার এই আর এক অসুবিধা—ভাষণের অতিরিক্ততায়, পরোক্ষ ব্যঞ্জনার অভাবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনেক কবিতাই সেই সময় পদ্য হয়ে যায়, অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ গদ্য হয়ে যায়। যেমন—'আমি এই মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকলাম / যতক্ষণ রবারের মতো / মানুষের কাজ স্বাস্থ্য খাদ্য শিক্ষা নিরাপত্তার / একটা ভালো ব্যবস্থা না হচ্ছে / ততক্ষণ / মৃত্যুর গলায় পা দিয়ে হলেও আমি বাঁচবো' (এখন যাব না)। এই সব কথা মনে হয় যেন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে তুলে আনা। মার্কিনি গম নিয়ে যখন দক্ষিণপন্থীরা স্বাধীনতা বেচে গেছে তখন 'স্বাধীনতার পতাকা, দেখ -/ এখন / আমাদের হাতে' (আমাদের হাতে)। —এই সব কবিতাও কবিতার ছদ্মবেশে গদ্য। গদ্যের স্তর অতিক্রম করতে পারেনি, এমন মামুলি পদ্য, ব্যঞ্জনাহীন হালকা ছড়ার ধরনে লেখা তাঁর পরবর্তী বইগুলোয় বেশ বেশি জায়গা নিচ্ছে। 'ফুল ফুটুক'-এর 'আমি আসছি', 'বাঁয়ে

চলো, বাঁয়ে', 'যেতেই হবে'; 'এই ভাই' বইয়ের অন্তর্গত 'বলিহারি', 'এ ও তা', 'ছুটির গান' এবং 'ছেলে গেছে বনে' নামক সাম্প্রতিকতম সংকলনের 'রসুই', 'ধরাবাঁধা', 'খাঁচা ছাড়া', 'দেখেশুনে' ইত্যাদি তার প্রমাণ। এই সব পদ্যকে নির্মমভাবে সংকলন থেকে ছাঁটাই না করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজের প্রতি অবিচার করেছেন।

এখন আর ভাঙা নয়। ঠিকই, কিন্তু গড়ার জন্যেও তো ভাঙতে হয়। তাই এখনো বিদ্রূপ উদ্যত হয়ে ওঠে—আর যখনই সেই খরধার বিদ্রূপে শাণিত করেন রচনা তখনই পুরনো সুভাষের কণ্ঠস্বর নির্ভুল শোনা যায়। তবে এই বিদ্রূপ এখন আর পক্ষপাতী নয়। প্রতিপক্ষকে যেমন আক্রমণ করেন, তেমনি বিদ্রূপের আলো স্বপক্ষের বিকারগ্রস্ত মুখের উপর ফেলতেও তিনি যে বিমুখ নন, তার প্রমাণ 'সহজিয়া' কবিতাটি। ফুটে উঠেছে সাম্যবাদী দলেও পারস্পরিক সন্দেহ আর অর্থ-অভিজাত্যের মর্যাদা। 'সহজিয়া'-র সঙ্গে 'জী-হাঁ'-র মিল যেমন আশ্চর্য 'কী আশ্চর্য, মানুষও বদলায়? / সমাজ-টমাজ হলে কথা ছিল' বা 'তাছাড়া বসে তো ঘাস কাটে না ডলার' এই সব তির্যক সংহত সংলাপ-বাক্যের ব্যবহারও তেমনি চমৎকার। আঙ্গিকের পরীক্ষা এবং তাতে সার্থকতার দিক থেকে এই কবিতাকে 'পদাতিকে'-র চিঠির ধরনে লেখা 'অতঃপর' কবিতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। দুটোতেই আছে, মোহিতলালের ভাষায়, প্রতিভার পালোয়ানি। সমকালীন সাহিত্যজগতের চেহারা নিয়ে অরাজনৈতিক বিদ্রূপের দুটো উদাহরণ দিচ্ছি।

১ এই যে দাদা, এতদিনে বেরিয়েছে—
নতুন ফরমুলায় তৈরি
খলিফাচাঁদের আশ্চর্য কলম : 'খাই-খাই'।
চোর, জোচ্চোর, লোচ্চা, লম্পট, খাজা, খোজা
পণ্ডিত, মূর্খ যে কেউ চোখ বুজে
রাতারাতি লেখক হতে পারে।...

দাম উত্তম মধ্যম হিসেবে।
সঙ্গে বিনামূল্যে চুন এবং কালি।
এ লাইনে
যদি কোনো ভদ্রলোকের আবশ্যক হয়
বলবেন। (আশ্চর্য কলম)

২ উঠে আসছে শক হূন, কুষাণ, পহ্লবী
স্বপ্নাদ্য কলমে ; হচ্ছে ছাপাই বাঁধাই ;
বই যা ভারি, বইতে পারে একমাত্র গাধাই—
কী মজা, লিখলেই সব হয়ে যাচ্ছে ছবি!
মগজে ডবল শিফ্‌টে তৈরি করে প্লট··· (যা হট্)

আর একটা উদাহরণ দিলে আর সন্দেহ থাকবে না সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পুরনো দক্ষতা এখনো অক্ষুণ্ণ। 'জামার নিচে পৈতে / আর আস্তিনের তলায় / তাবিজ ঢেকে / এক নৈকষ্য কুলীনের ছা / আমাকে পরিষ্কার বোঝাল / দুনিয়াটাকে কি ভাবে বদলাতে হবে' (ছুয়ো)।

'সহজিয়া' কবিতার মিলের চমৎকারিত্বের কথা বলেছি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় পূর্বাপর বিচিত্র মিলের প্রদর্শনী আছে। যেমন—'পদাতিক'-এ—নিকটে / বিদ্যুৎ-এ, সময়ে / ক্ষমো হে, গায়েন / মোতায়েন, সিঁড়ি / অশরীরী, অভিনেতা / কঠিনচেতা। ইদানিং চটকদার মিলের দিকে তাঁর ঝোঁক আরো যেন বেড়েছে। 'কাল মধুমাসে' তেল-ঘি / ভেলকি, বলে / শ্রীখোলে, পারদ / নারদ, ঠুলির / কুমারটুলির, পুলিশ / ইস্, ব্রেভো / দেব, ডায়নামো / বোকামো। 'এই ভাই' বইয়ে—পদচিহ্ন / হো চি মিন্ হো / সিংহ, বিশ্বরূপ / তুরুপ, বলব কী আর / প্রতিক্রিয়ার, ভেংচি / বেঞ্চি, পালানোর জো / সৌন্দর্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর 'ছেলে গেছে বনে'-তে পাচ্ছি, একদা / খোদা, মাসি হে / ফাঁসিয়ে, নথ হে / রক্ষে, মিঞাজী / নিয়াজি, খান্ কে / ট্যাঙ্কে। মিলের চটকের নেশা

একবার পেয়ে বসলে তার থেকে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। আর একটা সতর্কবাণীও মনে রাখা দরকার—চমকপ্রদ মিল দেবার প্রবণতা মাইনর কবির বৈশিষ্ট্য। তবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সপক্ষে বলা যায়, এই জাতীয় চটকদার মিল তিনি ব্যবহার করেছেন সচরাচর অনুচ্চাশী অপ্রধান কবিতাতেই। কিন্তু উল্টো প্রশ্ন, এই রকম মিলের পরিমাণ এতো বাড়ছে কেন? তবে কি তিনি অপ্রধান কবিতাই বেশি লিখছেন?

তাঁর শেষ বইতে ইমেজের সংখ্যাও যেন কমেছে। অথচ—'ফুল ফুটুক' কবিতা পর্যায়ের পর থেকে অন্তত আমার কাছে তাঁর কবিতার সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ এই বিশিষ্ট ইমেজগুলির জন্যে। এই ইমেজ-গুলোকে অবলম্বন করেই তাঁর কবিতায় মমতাস্নিগ্ধ মানবতাবাদের ছোঁয়া লেগেছে। আর এই ধরনের ছবি বাংলা কাব্যে অভিনবও বটে। কাব্যপাঠক হিসেবে তাঁর কর্মে চিন্তায় সহোদর রাজনৈতিক প্রত্যয়ের কাছে একদিক থেকে আমরা কৃতজ্ঞ হতে পারি—কারণ রাজনৈতিক কর্মীর জীবন থেকেই এই ছবিগুলো প্রথমে তাঁর কবিতায় এসেছিল। এই ইমেজগুলির আদি উৎস কলকাতার সহরতলী অঞ্চলে চটকল-কেন্দ্রিক জীবনযাত্রার মধ্যে।

১ এখুনি
বাসন-ধোয়া জলে
নিজের মুখ দেখবে
ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার আরো একটি সকাল। (আমরা যাবো)

২ একবার এ আলোর নিচে, একবার ও-আলোর নিচে
গাছের পাতায়
বারবার নড়ে চড়ে বসছে
ধৈর্যচ্যুত অন্ধকার। (এক অসহ্য রাত্রি)

৩ জলায় এবার ভালো ধান হবে—
বলতে বলতে পুকুরে গা ধুয়ে

এ বাড়ির বউ এলো আলো হাতে
সারাটা উঠোন জুড়ে
অন্ধকার নাচাতে নাচাতে। (আরও একটা দিন)

এই রকম ইমেজের নাম দিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় জলছাপা বা জলছবি। 'জীবনের হ্রদে স্মৃতি / চোখ বুজে দিল ঝাঁপ / ভিজিয়ে সে জলছবি / তুলে নিল এই ছাপ' (ছাপ)। যা দেখেছেন তারই সঞ্চয় থেকে তিনি এনেছেন কবিতায় ছবির পর ছবির মালা। 'এক টুকরো রোদ / মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে/ হাঁটু মুড়ে/ যেন মগরেবের নমাজ পড়ছে' (বারুদের মতো)। অথবা 'কাল মধুমাস' কবিতায় নওগাঁ শহরের ব্রিজের ছবিটি—'ওপরে টমটম যায় গুড়-গুড় গুড়-গুড়, / নিচে চাও যদি— / হিজিবিজি হিজিবিজি / নদী-নৌকো নদী-নৌকো নদী।' এবং এমন আরো কত কত। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রেখাচিত্র আঁকার এই দক্ষতা প্রমাণের জন্য উদাহরণ পুঞ্জীভূত করে লাভ নেই। শুধু উদ্ধৃত করছি ট্রাম চলার কিছু ছবি—একই ট্রাম, অথচ ছবিগুলো কী স্পষ্টভাবে আলাদা।

১ যখন সিনেমা-ভাঙার যাত্রীদের ট্যাঁকে গুঁজে
রাত্রের শেষ ট্রাম
ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে গুমটিতে ফেরে—(বাঘবন্দী)

২ দাঁড়ানো মানুষগুলোকে বগলদাবা করে
তুলে নিয়ে
বেলা দশটার ট্রাম
ঝুলতে ঝুলতে গেল। (পোড়া শহরে)

৩ মাথার ওপর একটানা দীর্ঘ তারে
ছড় টেনে
ঝড়ের সুর বাজাতে বাজাতে গেল
একটা মন্থর ট্রাম। (এই পথ)

৪ একটা ট্রাম
তার পেছনে পেছনে

তেড়ে গেলে
তারের গায়ে অনেকক্ষণ ধরে ঝুলে থাকল
একটা একটানা
ছি
ছি
শব্দ…(খোলা দরজার ফ্রেমে)

৫ ঘেঁষটে ঘেঁষটে যাচ্ছে ট্রাম।
আমাদের গলি দিয়ে যাওয়া এক
বিকলাঙ্গ ভিখারির মতো
দুর্বিষহ মর্মন্তুদ কর্কশ আওয়াজ। (কাল মধুমাস)

ট্রামের প্রতিটি ছবি অন্য ছবি থেকে আলাদা শুধু নয়, ট্রামচলার প্রত্যেকটি শব্দ পর্যন্ত আলাদা।

যে সময় থেকে তাঁর কবিতায় এসেছে এমন প্রচুর ইমেজ, সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছে অল্প কথায় গল্প বলার ঝোঁক। ইমেজ প্রাচুর্য এবং গল্প বলার ঝোঁক দুই-ই এলো হিকমতের কবিতার তর্জমার পর থেকে। 'ফুল ফুটুক' কবিতাবলীর 'একটি লড়াকু সংসার', 'বাসি মুখে', 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' এই সব রচনার মধ্যে ছোট গল্পের ইশারা ছিল। পরে এই রকম গল্প বারে বারেই পাই। যেমন 'যত দূরেই যাই' বইয়ের 'কেন এল না'। বাবা টাকা আনলে পুজোর জামা কেনা হবে, অধীর ছেলের তাই পড়ায় মন নেই—'বাপের-আদরে-মাথা-খাওয়া ছেলের মতো / হিজিবিজি অক্ষরগুলো একগুঁয়ে / অবাধ্য / যতক্ষণ পুজোর জামা কেনা না হচ্ছে / নড়বে না।' স্বামীর ফেরার দেরিতে উৎকণ্ঠিত বউয়ের হাতে খুন্তি বেশি জোরে আওয়াজ করছে। গলির মোড়ে গুলির আওয়াজকে বাজির আওয়াজ মনে করে ছেলে দেখতে গেল। অনেক রাত্রে—

অনেক অলিগলি ঘুরে
মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে

বাবা এল।

ছেলে এল না।

ভূষণ্ডি কালো বউকে পছন্দ নয় শাশুড়ির—সেই বউয়ের গল্প 'মেজাজ'। বউয়ের সাম্প্রতিক দেমাকের কারণ তদন্ত করতে গিয়ে কান-পেতে শাশুড়ি শোনে সন্তানসম্ভবা বউ স্বামীকে বলছে, 'দেখো, ঠিক আমারই মতো কালো হবে।'…'কী নাম দেবো, জানো? / আফ্রিকা —/ কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে।' বৃষ্টির ভয়ে ভীতু অল্পবয়সী ছেলে বাসের জানলা বন্ধ করার চেষ্টা করে, তার গল্প 'ছাই'। 'কে বা কারা নিয়েছিল মাথার উপর তার কেটে কাজেই ছ-ঘণ্টা' ট্রেন-লেট, তজ্জনিত পরিস্থিতি ও দৃশ্য নিয়ে 'কে বা কার' গল্প। কবির সঙ্গে কৃষককর্মীর দেখা, একই আন্দোলনে একসঙ্গে জেল খেটেছিলেন। স্মৃতি রোমন্থন, একথা সেকথার পরে জানাজানি হয়ে গেল দুইজন আজ ভাঙাপার্টির দুই তরফে—'অমনি প্রকাণ্ড একটা ঢেউ / ছুটে এসে / দুহাতে দুজনকে তুলে / দিল এক প্রচণ্ড আছাড়।'

চেয়ে দেখি আমরা আবার সেই পাশাপাশি সেলে।
নিজেদের জালে বন্দী ; নিজেদেরই তৈরি-করা জেলে।

(জেলখানার গল্প)

অল্প রেখায় আঁকা এ সব গল্প বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আকর্ষণীয় হয়েছে, শুধু যেগুলো স্পষ্টই ঔপদেশিক বা নীতিমূলক সেগুলো ছাড়া। এ ব্যাপারে সুভাষ মুখোপাধ্যায় খানিকটা স্বতন্ত্র, কারণ ইদানীং কবিরা কবিতায় গল্প বলা ছেড়েছেন। আর এই সব অল্প কথার গল্পে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাফল্যের কারণ, তিনি চলতি কথার স্পন্দনকে, মুখের ভাষার ধরনকে চমৎকার ধরতে পারেন।

সমর সেনের কবিতাসংগ্রহের শেষ কবিতা 'জন্মদিনে'-র সঙ্গে 'ফুল ফুটুক'-এর শেষ কবিতা 'এখন ভাবনা'-র কিছু মিল আছে, আবার খানিকটা অমিল। দুটো কবিতাতেই গৃহকাতর বেদনা রয়েছে,

অবসিত যৌবনের জন্য মৃদু ক্ষোভ আর আসন্ন প্রৌঢ়তার ছায়া রয়েছে। যেন অন্তিমে পৌঁছে গেছেন এমন একটা বিষণ্ণ অনুভূতিও রয়েছে। একজন বলেন—'শুনি না আর সমুদ্রের গান / থেমেছে রক্তে ট্রাম-বাসের বেতাল স্পন্দন' (জন্মদিনে)। অন্যজন—'এখন সেই বয়েস / যখন / দূরেরটা বিলক্ষণ স্পষ্ট / শুধু কাছেরটাই ঝাপসা দেখায়' (এখন ভাবনা)। সমর সেনের মনে পড়ে যায় 'সাঁওতাল পরগণার লাল মাটি / একদা দিগন্তে দেখা উদ্ধত পাহাড়, / বাইজীর আসরে শোনা বসন্তবাহার।' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে—

পিছনে তাকালে আজও দেখতে পাই—
সিংহের কালো কেশর ফুলিয়ে
গর্জমান সমুদ্র ;
দেয়ালে গুলির দাগ,
ভাঙা শ্লেট, ছেঁড়া জুতোয়
    ছত্রাকার রাস্তা,
পায়ে পায়ে ছিটিয়ে যাওয়া রক্ত।

পরিণামে আলাদা দুজন। পিছনে ফিরে তাকানোর ইচ্ছেকে সমর সেন ব্যঙ্গবিদ্রূপে ছারখার করেন 'যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে। / বছর দশেক পরে যাবো কাশীধামে॥' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অভিপ্রায় বিপরীত—'আমার ভালোবাসাগুলোকে / নিরাপদে তার হাতে / পৌঁছে দিতে চাই।'

আসলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সময় চলে যাচ্ছে, ইদানীং এই অনুভূতি তীব্রতর রূপ নিয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়। বারবার শেষের দিকের কবিতায় সময়ের কথা এসেছে, আর সময় রূপ নিয়েছে তার চিরায়ত উপমা নদীর মধ্যে।

সে নদীর দুদিকে দুটো মুখ।
এক মুখে সে আমাকে আসছি বলে
দাঁড় করিয়ে রেখে

অন্য মুখে
ছুটতে ছুটতে চলে গেল।…
আমার কাঁধের উপর হাত রাখল
সময়। (যেতে যেতে)

সময়ের পলায়মানতার বোধ এত তীব্র বলেই বারবার ঘরকাতুরে গৃহমুখী নস্টালজিয়ার কোমল ছায়াসম্পাত হয় ইদানীং। শেষবারের মতো একবার পুরনো ছবিগুলো মিলিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। সেই ইচ্ছেরই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রকাশ 'কাল মধুমাস' নামে দীর্ঘ আত্মজৈবনিক কবিতাটি। যে সময় পুরনো দৃশ্যের দিকে চোখ ফেরায় আমাদের, সেই সময়ের কথাই প্রথমে—'মনে রেখো,/এনদীওএকবার/ শুধুই একবার/একটিমাত্র খেপ।' দ্বিতীয় অংশে প্রৌঢ় বর্তমানের কথা, অথচ এই প্রৌঢ় বয়সেও মুখ ভবিষ্যতের দিকে ফেরানো। ('যাই/গিয়ে দেখে আসি / কী বীজ বুনেছে মাঠে চাষি')। তৃতীয় ভাগে শৈশবে সাড়া-ব্রিজের ওপর দিয়ে রাত্রে রেলগাড়ি চড়ে যাবার কথা। চতুর্থ অংশে ছোটবেলায় নওগাঁ শহরের কথা—ঘণ্টা বাঁধা হাতি, ছোট্ট উঠোন, সার্কাস, দুপুরে মেয়েদের আসরে সরস গল্প, পাট্টা নিতে আসা খেতালচাষিদের মধ্যে জলবিতরণের স্মৃতি। এখানেও লাগে স্বাধীনতার আন্দোলনের ঢেউ। লবণ সত্যাগ্রহী আহত হয়ে ফিরে এলে—

সমস্ত শহর ক্ষুব্ধ ; ফেটে পড়ছি রাগে
আমরা সবাই।…
এমন সময়
হে ধরণী দ্বিধা হও, আমি যাই পাতালে তলিয়ে—
ভিড়ের ভেতর থেকে ও কে বলল : ছি ছি,
তোর বাপ সরকারী চাকুরে।

এছাড়া এস.ডি.ও-র জামাইয়ের রেডিয়ো শোনানোর হাস্যকর বিভ্রাটের কথা, শ্বশুরবাড়িতে দিদির উপর অত্যাচার, দেনাগ্রস্ত বাবার কথা—'এদ্দিকে চালের মন উঠেছে আট টাকা। / লোকে বলছে/লাগল বলে

আবার লড়াই।' পঞ্চম ভাগে মায়ের কথা—'যখনই বৃষ্টিতে ঝড়ে/চমকাত বিদ্যুৎ/পাশে এসে মা বলতেন হেঁকে :/জয়মণি! স্থির হও।/যে-মন্ত্রে ঘেঁষে না কাছে ভূত/সে-মন্ত্র তো মার কাছেই শেখা।' শেষ অংশে কবির কুষ্ঠি চাই, কারণ 'ভবিষ্যৎটা একটু ভালো করে/জেনে নিতে চাই।' কোষ্ঠিপত্র রচনার জন্যে দরকারি তথ্যগুলো—জন্ম 'প্রথম যুদ্ধের ঠিক পরে', 'বার বুধ', রাশি সম্ভবত মীন 'হতেও বা পারে/যে রকম মাছ ভালোবাসি'। সময় সম্বন্ধে 'মনের মধ্যে জন্মগত একটা ছবি আছে', কে যেন বলেছিল, কাল মধুমাস। 'বলেছিল আর কেউ, আমার মা নন।/বললাম তো কারণ—/মা তখন আমাকে নিয়ে যন্ত্রণায় নীল।' আপাতত এলোমেলো, কিন্তু সম্পূর্ণ সচেতনভাবে সংগঠিত এইকবিতা। আর এমন সন্তপ্ত আবেগনম্র কবিতা সুভাষ মুখোপাধ্যায় কমই লিখেছেন।

প্রগাঢ় ভালোবাসাই বারে বারে পিছনে টানে, নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন করে। আর এই ভালোবাসার কথাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার প্রধান কথা। 'জননী জন্মভূমি' কবিতায় কবি সংকল্প নিয়েছেন—

আমার ভালোবাসার কথা
মা-কে কখনও আমি মুখ ফুটে বলতে পারি নি।
মুখ বন্ধ করে
অক্লান্ত হাতে—
হে জননী,

আমার ভালোবাসার কথা বলে যাব।

কিন্তু 'মুখ বন্ধ করে' ভালোবাসার কথা বলে যাবার এই প্রতিশ্রুতি তিনি সব সময় বজায় রাখতে পারেন না। ভালোবাসার কথা বড় বেশি 'মুখ ফুটে' বলেন অনেক সময়। যতোটা বলা হয় ততোটা হয়ে ওঠে না সেই কথা—উক্তি থেকে উঠে আসে না উপলব্ধির স্তরে। কখনো সাদামাটা গদ্যভঙ্গিতে বলেন, 'ধ্বংসের চেয়ে সৃষ্টির,/অন্ধকারের চেয়ে আলোর দিকেই/পাল্লা ভারি হচ্ছে। ঘৃণার হাত মুচড়ে দিচ্ছে ভালোবাসা' (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ)। কখনো 'আসমুদ্রহিমাচল/

শোকস্তব্ধ আমাদের ভালোবাসা, নতমুখে/উদ্বিগ্ন মাটির দিকে তাকিয়ে' (লাল গোলাপের জন্য)। আবার অন্য জায়গায় 'তোমার ঘৃণার দিকে/ আমি ফিরিয়ে রেখেছি/আমার ভালোবাসার মুখ' (হাত বাড়িয়ে রেখেছি)। এই ভালোবাসার কথায় কোথাও কোথাও লেগে যায় ভাবালুতার ছোঁয়াচ, এসে যায় একটা গদগদ ভাব।

অথচ ভাবালুতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতে চান নি, 'মুখ ফুটে' তিনি যে বলতে চান নি তার প্রমাণ তাঁর ইদানীংকার কবিতার আঙ্গিকে। এই ভাবালুতার স্পর্শ এড়ানোর জন্যেই তিনি হয়তো কবিতা থেকে বাগ্‌বহুলতা একেবারে ঝরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বাড়তি শব্দ পরিহার করে কবিতাকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় করতে চেয়েছেন মেদহীন, লঘু, নগ্ন এবং সুঠাম। যতিচিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করেছেন। ছাপানো পৃষ্ঠায় ফাঁক দিয়ে দিয়ে যতির কাজ সেরেছেন প্রায়ই, আর তারই মধ্য দিয়ে যেন শূন্যতাকে-নৈঃশব্দ্যকে অর্থময়ভাবে কবিতার সঙ্গী করে নিতে চেয়েছেন। বেঁধে দিতে চেয়েছেন বলা এবং না-বলাকে। এ-সবই হয়তো মুখ ফুটে ভালোবাসার কথা বলার ঝোঁককে ঠেকানোর জন্যে, মুখ বন্ধ করে ভালোবাসার কথা বলতে চাওয়ার অভিপ্রায়ে।

আমি তখন ঘাড় হেঁট করে
কুয়োর স্থির জলে
নিপুণ হয়ে দেখছিলাম
নিজেকে।···
দেখতে গিয়ে
কখন
নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম
বুঝিনি।···
চোখের সামনে থেকে নিজেকে সরাতেই
আমার গোচরে
এখন
সমস্ত চরাচর ;
সারা পৃথিবী
এখন আমার নজর বন্দী! (এই ও)

কিন্তু এই ঠোঁট-চাপা নির্ভার কবিতার বিপদ অন্য দিক থেকে। নৈঃশব্দ্যকে ব্যঞ্জনাময় করতে গিয়ে অনেক সময় যাকে করতে চেয়েছিলেন তাৎপর্যময়, তা হয়ে ওঠে তাৎপর্যহীন পুনরুক্তিমাত্র। এই রকম ব্যর্থতার উদাহরণ অনেক। 'ফিরে ফিরে' কবিতায় 'সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি নামছি/নামছি/নামছি'—এই ধুয়োর তিনবার উচ্চারণে কিছু এগোয় নি, শব্দরহিত এই কবিতায় কোনো শব্দাতীত ইশারা মেলে নি। এই রকম ফাঁপা রচনার আরো প্রমাণ 'কাল মধুমাস' বইয়ের 'নিশান', 'কাছের লোক' ইত্যাদি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ইদানীংকার কবিতায় সময়চিন্তার কথা বলেছি, এখন তাঁর কবিতায় সময়চিহ্নের কথা বলতে হচ্ছে। তিনি চিরদিনই সাম্প্রতিক। অথচ সাম্প্রতিকালকে তার বাইরে বড় কিছুর সঙ্গে গেঁথে নেওয়া দরকার; ইদানীংকার প্রসঙ্গের মধ্যে সকল-সময়ের তাৎপর্য রণিত করে তোলার মধ্যেই সত্যিকারের আধুনিকতা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রতিদিনকার ঘটনা-ভাবনার চাঞ্চল্য হুবহু ধরা পড়ে যায়। বয়স্কেরা বলে—'কী গেল? পাথরের সেই পুরনো মূর্তিটা?/ইস্, ভেঙে ভেঙে ওরা আর কিছু রাখল না।/এখনকার যে কী হাওয়া' (পূর্বপক্ষ)। রাগীকিশোরযুবকেরা বলে—'বাবারা যা বলেন তা কি ঠিক?/এও ভারি আশ্চর্য/গা বাঁচাবার নাম দিয়েছেন সহ্য' (উত্তরপক্ষ)। অন্যদিকে সন্ত্রস্ত পুলিশ পাল্টা-সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে—'বুকে বাঁধছে ঢাল যতোই ছেড়ে যাচ্ছে নাড়ী/ভয় পেয়ে দেখাচ্ছে ভয়/পথে বসছে ফাঁড়ি' (সামনেওয়ালা ভাগো)। সময়ের চরিত্র প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি যে মন্তব্য করেন সেগুলো খবরের কাগজের জনপ্রিয় বিশ্লেষণের চেয়ে বেশি গভীরে যায় না। যেমন তিনি বলেন অভিসন্ধিপরায়ণ নেতাদের গোপন কলকাঠি নাড়াতেই 'অপাপবিদ্ধের দল' খুন হচ্ছে—কারণ 'একদল বাইরে থেকে ওস্‌কাচ্ছে/একদল ভেতর থেকে ভাঙছে'।

পথ
এখন এক অন্ধ গলিতে এসে ঠেকে গেছে
শহীদের স্মৃতি রাখতে শহীদ হওয়া
খুনের বদলে খুন
এই বৃত্তটাকে কিছুতেই ছাড়ানো যাচ্ছে না—(বন্ধুরা কোথায়)

'বৃত্ত' কথাটির ব্যবহার সাংবাদিকতা থেকে নেওয়া। পিছনে প্রচ্ছন্ন কোন্ সওদাগর এদের খেলাচ্ছে, যারা মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিয়েছিল তারাই ফেরবার পথে কাঁটা দিচ্ছে, ফলে 'সামনে গড়াগড়ি যাচ্ছে/ ভাইবন্ধুদের মাথা ;/পেছনে/আততায়ী আমার ভাই' (পাখির চোখ)। এসব কথার মধ্যেও সাংবাদিকতার স্তরকে বেশি দূর ছাড়ানো হল না। সাম্প্রতিকতা আর আধুনিকতার মধ্যে এই প্রভেদ আরো পরিষ্কার হয়ে যায় যদি জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতার সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অদ্ভুত সময়' কবিতার তুলনা করি।

এ এক ভারি অদ্ভুত সময়।
কে কার আস্তিনের তলায় কার জন্যে
কোন্ হিংস্রতা লুকিয়ে রেখেছে
আমরা জানি না।
কাঁধে হাত রাখতেও এখন আমাদের ভয়।

আসল কথা, সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে জাতের কবি তাঁরা মানুষের চেয়ে কবিতাকে বেশি দাম দিতে নারাজ। কবিতা তাঁদের জীবনোপলব্ধি ঘটানোর উপায় নয়, কবিতা তাঁদের হাতে জীবনপ্রতিষ্ঠার অস্ত্র। কবিতা দামি, কিন্তু জীবন তার চেয়েও দামি, এই জাতের কবিদের কাছে।

১ বড় কথা বড় ভাব আসে নাক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে।
অমর কাব্য তোমরা লিখিয়ো, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে। (নজরুল)

২ প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি··· । (সুকান্ত)

৩ ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি সমস্ত জীবন ধরে
একটি বীজ মাটিতে পুঁততাম
একটি গাছ জন্মাতে পারতাম ··। (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

কবিতার বিশুদ্ধ নান্দনিক সার্থকতা এঁদের কাউকে তৃপ্ত করতে পারে নি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেও না। 'চিরকুটে' লিখেছিলেন তিনি 'ছড়ানো দৃশ্যের মধ্যে কিছু নিয়ে কাব্যের জগৎ/রচনা করার ইচ্ছা ছিল বটে,/ভেঙেছি শপথ—, বৃত্তি আজ একান্ত বিবাদী···।' (কাব্যজিজ্ঞাসা৩) ইদানীং আবার লিখেছেন—'আমাকে কেউ কবি বলুক/আমি চাই না। /···আমি যেন আমার কলমটা/ট্রাক্টরের পাশে নামিয়ে রেখে বলতে পারি—/এই আমার ছুটি/ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও' (আমার কাজ)। আসলে চল্লিশের বেশির ভাগ কবির মতোই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিবিবেকের চেয়ে সামাজিক বিবেক প্রখর। সেখানেই তাঁর শক্তির উৎস এবং দুর্বলতার; আধুনিকতার চেয়ে বেশি সাম্প্রতিকতার আভাস, শেষ চরণে সার কথা বলে দেবার অভ্যাস, পথনির্ণয়ের ইচ্ছা, ভালোবাসার কথায় কখনো ভাবালুতার ছোঁয়া লেগে যাওয়া, এই সব দুর্বলতার। জীবনের অন্তিম জয় সম্বন্ধে তাঁর আশার শেষ নেই, তাই বিষাদকে ডাক দিয়ে তিনি হাতের কাছ থেকে সরে যেতে বলেন। বলেন—'জন্মেই মৃত্যুর চিন্তা, প্রেমে জাগে বিচ্ছেদের ভয়, পদে পদে ভুলভ্রান্তি/অথচ জীবন তার চেয়ে বড়ো, ঢের ঢের বড়ো···' (শূন্য নয়)। 'যত দূরেই যাই' গ্রন্থের 'যেতে যেতে' কবিতাটার দিকে নজর দিতে বলি। সময়ের প্রভাবে হাতের মুঠো খুলে দেখলেন কবি 'কাল রাত্রের বাসি ফুলগুলো/সত্যিই শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।' কবিতার প্রথম অংশে সময়ের অপ্রতিরোধ্য এই নিরাশার কথা জনপ্রিয় হলো না। তাই দ্বিতীয় অংশে 'বানানো' গল্প বলতে হলো এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যার। সেই রাজকন্যা আশা, জীবন—'তুমি আশা,/তুমি আমার জীবন।' শেষ পর্যন্ত কিন্তু 'সেই রাক্ষুসীই আমাকে খেলো।' এক-চক্ষু-আশাবাদ ও অতি-সরল জীবনপ্রেম—এই রাজকন্যা, কবিতার পক্ষে অনেক সময়, সত্যিই রাক্ষুসী।

সমাপ্ত